অন্ধকূপহত্যা সত্য হইলেও সিরাজদ্দৌলার অপরাধ কি? স্বয়ং হলওয়েল সাহেবই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সংস্রব থাকা তিনি বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহার ধারণা এইরূপ যে, নবাব সেনাদিগের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির জন্যই এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।* ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদিগের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা সর্ব্বজনসমক্ষে হলওয়েলের বন্ধনমোচন করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে *অভয়দান করিয়াছিলেন। অন্যায় উৎপীড়ন করাই যদি সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় হইত,* তিনি কখনও এরূপ ব্যবহার করিতেন না। সিরাজদ্দৌলার আশা ছিল যে, হলওয়েল তাঁহাকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে হলওয়েলের জীবনসংশয় হইয়া ধনলাভের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই তাহাতে সম্মতিদান করিতেন না।

হলওয়েল এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সমস্ত দিন বীরের ন্যায় দুর্গরক্ষা করিয়া দৈববিড়ম্বনায় পরাজিত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিবার অবসর প্রদান করা হইয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহারা যদি সিপাহীদিগের উপর লাফাইয়া পড়িবার আয়োজন না করিতেন, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পলায়নপথের সন্ধান লইবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ না করিতেন, তবে হয়ত তাঁহাদিগকে কক্ষমধ্যে আদৌ অবরুদ্ধ হইতে হইত না। যখন অবরোধের আয়োজন হইল, তখন ইংরাজেরাই কারাকক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন; নবাবসেনা তাহার আয়তন বিষয়ে কিছুমাত্র সন্ধান রাখিত না।† হলওয়েল সর্ব্বাগ্রে গৃহপ্রবেশ করিয়া কোনরূপ আপত্তি না করায় তাহারা সকলকেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে যদি কষ্ট হইয়াছিল, তবে সে কষ্টের কথা বুঝাইয়া না বলিয়া বা কোন সেনাপতিকে সংবাদ না পাঠাইয়া উদ্ধত ইংরাজসেনা বাহুবলে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া প্রহরীদিগকে যে অতিমাত্র ভীত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। হলওয়েলের কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ইহাও বোধ হয় সত্য যে, ইংরাজসেনার আস্ফালন দেখিয়াই প্রহরীগণ নবাবের বিনানুমতিতে দ্বার মোচন করিতে সম্মত হইয়াছিল না। ইহার জন্য তাহাদিগের অপরাধ হইতে পারে না। আর তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া জানালার ধারে যাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল, তাহারা ত বিশেষ যন্ত্রণাভোগের পরিচয় প্রদান করে নাই। অন্ধকার কারাকক্ষের অপরাংশে লোকচক্ষুর অগোচরে যাহারা মর্ম্মযাতনায় ছটফট করিতেছিল, বাহির হইতে প্রহরীসেনা তাহার বিষয় বোধ হয় কিছুই জানিতে পারে নাই। এ সকল কথার যথোপযুক্ত আলোচনা না করিয়াই কোন কোন ইতিহাস-লেখক অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা নিজেই বন্দীদিগকে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন! এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই; কিন্তু কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ইহারা সিরাজদ্দৌলাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন! একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, "প্রমাণ না থাকিলেও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার বিচার করিয়া সিরাজদ্দৌলাকেই অপরাধী করিতে হয়। নচেৎ তাঁহার আদেশ ব্যতীত দ্বার উন্মোচন করিতে কাহারও সাহস হইল না কেন,

* একথা সত্য হইলে দুর্গপ্রবেশের সময়েও সিপাহীরা সাহেবদিগকে হত্যা করিতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট বলেন যে,—"The English having surrendered their arms, the Nawab's troops refrained from bloodshed."

† Mill, vol. iii.

এবং এতগুলি নরনারীর জীবনরক্ষার জন্য ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে ইতস্ততঃ হইল কেন? ইহাই ত যথেষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজদ্দৌলার আদেশক্রমেই এরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল!"*

সিরাজদ্দৌলাই যে হতভাগ্য ইংরাজ বন্দীদিগকে অন্ধকূপ কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। বরং হলওয়েলের লিখিত কাহিনী অনুসরণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ বলিবার অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ম্যালিসন, স্বপ্রণীত ইতিহাসে † সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচন করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধকূপহত্যা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজেরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান সহকারী অপরাধী তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মহাত্মা হাওয়ার্ডের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশেই এইরূপ পূতিগন্ধময় আলোকসম্পাতশূন্য অন্ধকূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে আসিয়াও, স্বদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সেইরূপ অন্ধকূপ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল অন্ধকূপে কত হতভাগাই না অকালে অন্যায় উৎপীড়নে জীবনবিসর্জ্জন করিত! কত উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক, কত মদমত্ত নাবিক, কত অন্নহীন দাদনগ্রস্ত দরিদ্র বাঙ্গালী যমযাতনায় ছটফট করিয়া মরিত! ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মবেদনায় লিখিয়াছেন যে, "হায়! যদি অন্ধকূপ না থাকিত, তাহা হইলেত ইংরাজবন্দীদিগের এরূপ শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারিত না!"‡

গান।

আশাভৈরবী—একতালা।

একটু আলো ও একটু আঁধার একটু সুখ ও একটু ব্যথা;
—না কহিতে হায় ফুরাইয়ে যায়—একটু প্রাণের একটু কথা!
একটু আলাপ; কলহ, বিলাপ, বিশ্বাস, সংশয়, আশা, ভয়;
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা, ফুরাইয়ে যায় অভিনয়!
একটু হৃদির একটু স্পন্দন,
—চির নিস্পন্দতা পরে সব;
একটু হাসি ও একটু ক্রন্দন,
—থেমে যায় এই কলরব;
ধনের গৌরব, যশের সৌরভ, প্রেমের মত্ততা, সবই হায়
একই সঙ্গে শেষে, চখের নিমেষে ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায়!

---

* But the probability is, that the Subahdar had himself made or sanctioned the selection of the Black hole as the place of confinement, for when the miserable prisoners besought that they might be relieved by the removal of part of their number to some other place, their prayer was unavailing, because it could not be granted without the express orders of the Subahdar, whose sleep no one dared to disturb for so trivial a purpose as the preservation from death of nearly one hundred and fifty human beings.—Thornton's History of the Britith Empire, vol. i. 197.

† Malleson's Decisive Battles of India.

‡ What had they to do with a Black hole? Had no *blackhole* existed, (as none ought to exist anywhere, least of all in the sultry and unwholesome climate of Bengal) those who perished in the Black Hole of Calcutta would have experienced a different fate.—Mill's History of British India, vol. iii. 149 note.

যোগেশ।

১

আজ অনেক দিনের পর যোগেশের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি মনে পড়িতেছে। সেই মলিন মধুর মুখচ্ছবি, সেই ওষ্ঠে লুক্কায়িত ঈষৎ ম্লান হাস্য, সেই নয়নের করুণ মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি আজি যেন জীবন্ত ছবির ন্যায় মনে জাগিতেছে। হারাণো রতন কি আর ফিরিয়া পাইব ?

ছেলেবেলা হইতে যোগেশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। আমি যেখানে যাইতাম, যোগেশ ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিত। একত্র বিচরণ, একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন, সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস। যোগেশকে আমি বড়ই ভাল বাসিতাম, কিন্তু তাহাতে আমার গুণ কিছু ছিল না। আমি স্বেচ্ছায় তাহাকে ভালবাসি নাই। সে আমার ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছিল। কেই বা তাহাকে ভাল না বাসিত ?

গ্রামে আমার মত দুরন্ত বালক আর দুটী ছিল না। হায়, কোথায় সে সুখের বাল্যকাল! সমস্ত দিন ছুটাছুটী, আর অশান্তপণা! কখনো নগার পিঠে একটা চড় মারিয়া পলাইতেছি, কখনো ঘোষেদের কুলগাছে উঠিয়া কুল পাড়িতেছি, কখনো রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতেছি, মার সহস্র ডাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। স্নান করিতে যদি একবার নদীতে নামিলাম, তবে আমাকে কাহার সাধ্য উঠায়! একবার এপার একবার ওপার করিয়া ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে চঞ্চল করিয়া তুলিতাম। যাহা কিছু সহজপ্রাপ্য তাহাতে কখনো আমার মন উঠিত না। আমার এই দুরন্ত স্বভাবে আমার জননীকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তবু মা আমার কখনো আমাকে তিরস্কার করেন নাই। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই মা বলিতেন "পাঁচটি ছেলে ভগবান দিয়া আবার কাড়িয়া নিয়াছেন, ওই কি বাঁচিবে? দিদি, আমার আর শাসন করিতে মন সরে না।"

পিতামাতা আমাকে কখনো শাসন করেন নাই, কিন্তু আমার আর একজন শাসক ছিল, সে যোগেশের দুটী করুণ নয়ন। সে নয়নের দৃষ্টি আমি কখনও অবহেলা করিতে পারিতাম না। যখনই আমি কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনই সেই দুটী নয়ন আমাকে নিবৃত্ত করিত। এজন্য যতক্ষণ যোগেশের সহবাসে থাকিতাম, ততক্ষণ আমার প্রকৃতি কিছু শান্ত থাকিত।

মার উপর আমার দণ্ডে দণ্ডে রাগ হইত। রাগ করিয়া বসিয়া আছি, কিছু খাইব না, মা কিছুতেই আমার সহিত না পারিয়া যোগেশকে ডাকিয়া আনিতেন। যোগেশ আসিবা-মাত্র আমার সে রাগ সে আব্দার কোথায় যাইত! জানিনা যোগেশ কি যাদুমন্ত্র জানিত!

২

আমার বয়স তখন দশ বৎসর, যোগেশের নয় বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে যোগেশের শান্ত মধুর প্রকৃতি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতেন। তাহার মুখে কেহ কখনও মন্দ কথা শুনে নাই, গ্রামের কোন ছেলের সহিত তাহার কখন বিবাদ হয় নাই।

আমাদের দুই বন্ধুর যেমন বিভিন্ন প্রকৃতি, তেমনি আবার দুজনের অবস্থাতেও অত্যন্ত পার্থক্য ছিল। আমি আশৈশব সুখের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছি, দুঃখ যে কি তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। যোগেশও তেমনি জন্মাবধি দুঃখই পাইয়াছে, সুখের মুখ দেখা তাহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। "চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?" কবির এ উক্তি জীবন্ত সত্য। আমি আমার প্রাণের বন্ধুর দুঃখ অনুভব করিতে পারিতাম না। আহা কি কষ্টেই না তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে! অভাগিনী

জননী ছইমাসের পিতৃহীন শিশুসন্তান বক্ষে করিয়া লোকের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শিশুটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তথনো ত মার কোলটুকু যোগেশের জুড়াইবার স্থান ছিল, কিন্তু একবৎসর হইল যোগেশ তাহার সে আশ্রয়ও হারাইয়াছে।

৩

আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে রাধাকৃষ্ণ বসুর বাটী। বসুজ মহাশয় সদাশয়, ধার্ম্মিক ও সঙ্গতিপন্ন। পিতৃ মাতৃহীন বালকের ভার তিনি স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনাথ জননী-অঙ্কচ্যুত অষ্টমবর্ষীয় বালক বসুপরিবারের অন্নভুক্ত হইল।

রাধাকৃষ্ণ বাবুর একটি মাত্র পাঁচ বৎসরের বালিকা কন্যা। যোগেশের উপর সেই বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। কন্যাটীর নাম সুলোচনা; কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে শুধু যে তাহার লোচন ছটীই সুন্দর একথা বলা যায় না, তাহার শ্রী, গঠন, মুখমাধুর্য্য, গমনভঙ্গী, ঈষৎ হাস্য এ সকলই অতি সুন্দর—গ্রামের ভিতর সেই কেবল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা। রাধাকৃষ্ণ বাবুর সেই আদরিণী ভুবনমোহিনী কন্যার সহিত অতি শৈশবাবধি আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির ছিল। আমার জননীর সুলোচনাকে বধূ করিবেন বড়ই সাধ, আর রাধাকৃষ্ণ বাবু এবং অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীরও আমাকে জামাতা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল।

সুলোচনাদের বাড়ী আর আমাদের বাড়ী পাশাপাশি, আমি জানিতাম সে আমার কনে, কিন্তু অতটুকু ক্ষুদে মেয়েকে আমি গ্রাহের ভিতর আনিতাম না। বালক বালিকার প্রণয় কেমন তাহা উপন্যাসলেথকেরাই ভাল বুঝেন, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, বা নাই করুন, আমি স্বরূপ বলিতেছি সুলোচনার সহিত আমার কোনরূপ প্রণয়ের নামগন্ধ ছিল না। বরং কিছু বিদ্বেষই ছিল—কেন না সেও বড় আদরের। অন্যের আদর আমার সহ্য হইত না।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী যোগেশের উপর তাদৃশ প্রসন্ন ছিলেন না। যোগেশের অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতি তাঁহার নিকট "মিটমিটে ডাইনি" বলিয়া বোধ হইত, তাহা ব্যতীত যোগেশের আরও অনেক দোষ ছিল। রাধাকৃষ্ণ বাবু যোগেশকে অত্যন্ত ভাল বাসেন—এ একটী প্রধান দোষ। সকলে যোগেশের সুখ্যাতি করে—আর একটী দোষ, এইরূপ আরও অনেক দোষ। কিন্তু প্রসন্ন না থাকিলেও অগত্যা যোগেশকে বাটীতে স্থান দিতে হইত, তাড়াইয়া দিলে রাধাকৃষ্ণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন, আবার সুলোচনা যেগেশ দাদার সঙ্গ ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত থাকিবে না। যোগেশ দাদা বেড়াইতে নিয়া যাইবে, যোগেশ দাদা খাওয়ার সময় খাবার মুখে তুলিয়া দিবে, ঘুমাইবার সময় যোগেশ দাদা শিওরে বসিয়া গল্প করিবে। সুলোচনার সম্পূর্ণ ভারই যোগেশের উপর। ইহাতে যদি কোন দিন কিছু ত্রুটি পাইতেন, সেদিন অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ঘণ্টাখানেক বাক্যবর্ষণ করিয়া কিছু মন খোলসা করিতেন।

৪

সে দিন অক্ষয় তৃতীয়া। মা এবং পল্লীবাসিনী অপর জনকয়েক রমণী মহা উৎসাহের সহিত সরিষা কুটিতেছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মা শঙ্কিতভাবে বলিলেন "বাপ আমার, এ ঠাকুরের জিনিষ, হাত দিও না।" যদিও বা হাত না দিতাম একথা শুনিয়া কি আর থাকিতে পারি, তখনই এক মুঠা সরিষাগুঁড়া তুলিয়া মুখে দিলাম। নিষিদ্ধ কার্য্যে আমার পরম আমোদ ছিল, কখনও তাহা না করিয়া ছাড়িতাম না। এইরূপ অবাধ্যাচরণ করিয়াও কখনো আমাকে শাস্তি পাইতে হয় নাই। আজ কিন্তু অবাধ্যতার বিলক্ষণ শাস্তি পাইলাম। সরিষা মুখে দিবামাত্র আমার নাক, মুখ, গলা অত্যন্ত জ্বালা করিতে লাগিল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু এরূপ সর্ব্বসমক্ষে অপমানে আরও গুরুতর শাস্তি হইল। সকলে আমার এই অবস্থা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, মা ছুটিয়া জলের ঘটি আনিতে গেলেন, আমি অমনি দৌড়িয়া পলাইলাম।

পৃথিবীর এরূপ নিষ্ঠুরতায় মনে অত্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাগ হইতে লাগিল, কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমারই, কাজেই কাহার উপর রাগ করিব খুঁজিয়া না পাইয়া স্থির করিলাম "দূর হোক্, আর বাড়ীতে যাইব না।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নদীর ধারে বনের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলাম।

ক্রমে ক্রমে রৌদ্রটুকু পশ্চিম আকাশে মিলাইয়া গেল, অমনি পূবধারে আকাশের গায়ে রেখার মত একখানি চাঁদ উঠিল। পাখীরা সকলে চেঁচামেচি করিয়া সকলের উদ্দেশ লইতে লাগিল, কিন্তু আমার উদ্দেশ এখনও কেহ লইতে আসিল না। সন্ধ্যাকাল, বনের ধার, আবার ঐ বটগাছে নাকি কি আছে শুনিয়াছিলাম, একা কেমন করে থাকি, উদরও বৈরাগ্যের প্রতিকূল পক্ষ লইলেন! অবশেষে অগত্যা কি করি, বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম—এমন সময় দেখি যোগেশ সুলোচনার হাত ধরিয়া বেড়াইতে আসিতেছে।

আমার হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল আসিল। গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকি, হঠাৎ যোগেশের সম্মুখে গিয়া পড়িব, সে কেমন চমকিয়া উঠিবে, বড় আমোদ হইবে, স্থির করিয়া ঝোপের ওপাশে গিয়া লুকাইলাম।

সেদিনের সন্ধ্যার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অস্ফুট চন্দ্রালোকে বনশ্রেণী ছায়ার মত দেখা যাইতেছে, আর সম্মুখে স্বচ্ছসলিলা করতোয়া নদী। আকাশ নক্ষত্রপূর্ণ, যেন কে একটা কাল কাগড়ে রাশি রাশি হীরার ফুল ছড়াইয়া দিয়াছে। সুলোচনা এক দুই করিয়া তারা গণিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ক্ষান্ত হইয়া কোন তারাটি বড়, কোন তারাটি ভাল ইহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল।

যোগেশ বলিল "ঐ যে বড় তারাটা সুলু, ঐটী আমার মায়ের চোখ। আমার মা আকাশে গিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে যোগেশের গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া আসিল।

সুলোচনা বলিল "তোমার মা আকাশে গিয়াছেন?" হ্যা যোগেশ দাদা তোমার মা কেন ওখানে গেলেন?"

যোগেশ ভগ্ন স্বরে বলিল "সকলে বলে মা ঐ আকাশে গিয়াছেন। সুলোচনা, আমার মা ঐখানে আছেন। আর এখন কেহ আমাকে তেমন ক'রে ডাকে না, কেহ আর আদর করে না, আর কেউ কোলে নেয় না। হয় ত আমি মার কথা শুনি নাই, তাই মা রাগ করে চলে গ্যাছেন।

"যোগেশ দাদা, ওকি? তুমি অত কাঁদচ কেন যোগেশ দাদা? আর আমি কখনো মাকে তোমার নামে কোন কথা বল্‌ব না, আর তোমার উপর রাগ করব না, তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব। যোগেশ দাদা কেঁদনা বাড়ী চল।"

সুলোচনা আর যোগেশ যখন চলিয়া গেল, তখন আমার মোহভঙ্গ হইল। আজ আমি প্রথম যোগেশের দুঃখ বুঝিলাম। কি জানি কেন আমার চোখে জল আসিল। নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীতে চলিলাম।

৫

তার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই পাঁচ বৎসরে আমার স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কি আর কেহ আমাকে সেই দুরন্ত, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বালক বলিয়া অনুমান করিতে পারে? এখন আর কেহ আমার নিন্দা করে না, সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। আমার সুখ্যাতি শুনিয়া যোগেশের আনন্দের সীমা থাকিত না।

সুলোচনা আর এখন আমার সম্মুখে আসে না। আমাকে দেখিলে পলাইয়া যায়। আমারও যেন তাহাকে দেখিলে কেমন লজ্জা করে, কিন্তু দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল

হয়। হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িলে সে যখন ছুটিয়া পলাইয়া যায়, তখন আমার বিদ্যুতের সহিত তুলনা মনে পড়ে। দুই বৎসরের ভিতরই তাহার সহিত আমার শুভবিবাহ হইবে একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

বালককালে গ্রামস্থ সমুদায় বালকবালিকার ভিতর যোগেশই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল, বয়োবৃদ্ধিতেও আমার সেভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। যোগেশ সর্ব্বদাই আমার সঙ্গী, একত্র পাঠ, একত্র শয়ন, একত্র ভ্রমণ। আমার যখন যাহা মনে হইত, তৎক্ষণাৎ যোগেশকে বলিতাম, আর কাহাকেও বলিয়া তৃপ্তি হইত না।

কার্য্যে যোগেশের তিলমাত্রও আলস্য ছিল না। যখন যাহার যে কার্য্য উপস্থিত হইত, যোগেশ উপযাচক হইয়া সাহায্য করিত। বিপদে আপদে যোগেশ গ্রামবাসীর দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু ভ্রমেও সে স্বকৃত কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিত না। এজন্য সকলেরই তাহার উপর যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তথাপি তাহার সেই মলিন মুখ কখনো আমি প্রফুল্ল দেখি নাই।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইল, অতএব পিতা আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন স্থির করিলেন। তখন সহসা মন বড় বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিব, বিদ্বান হইব, গ্রামের ভিতর যশস্বী হইব, রাজধানীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, নূতন নূতন দ্রব্য দেখিব, মাদকের ন্যায় এই সকল চিন্তা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। এই চিন্তাস্তেই দিন কাটিত—আর প্রত্যহ দিন গণিতাম। তবে যোগেশকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এটী একটী গুরুতর কষ্ট বটে, কিন্তু সে বিষয়টা ভাবিবার আমার বড় একটা অবসর রহিল না।

৬

সাধ পূর্ণ হইল, কলিকাতায় আসিলাম। আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে যেরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে কল্পনা সত্য হইল না বটে, কিন্তু তথাপি কলিকাতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি জন্মিল। যতই কলিকাতার শ্রী সমৃদ্ধি দেখিতে লাগিলাম, ততই আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির উপর অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিতে থাকিল। দিনের অধিকাংশ সময়ই পাঠে অতিবাহিত হইত, যেটুকু বিশ্রামের সময়, সেইটুকু ভ্রমণে ব্যয় করিতাম। ভ্রমণ সময়ে সঙ্গীর অভাব অনুভব হইত। আমি স্বভাবতঃই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে ভালবাসি না। সমপাঠীগণের সহিত আলাপ হইল বটে, কিন্তু মিত্রলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। যখন যে কিছু নূতন সুন্দর দ্রব্য দেখিতাম, অমনই যোগেশকে মনে পড়িত, ভাবিতাম, যোগেশ আমার সঙ্গে আসিলে বড়ই ভাল হইত। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া পড়িতে বসিতাম আর কিছু ভাবিবার অবসর থাকিত না।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কলিকাতায় কাটিল। নানা কারণে ইহার ভিতর একবারও বাটী যাওয়া হইল না। এ দুই বৎসরে আমার সাধের কলিকাতা আমার নিকট পুরাতন হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল ততই কলিকাতা আমার নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে আমার দীনা জন্মভূমির ভূষণহীন সৌন্দর্য্য মনে উদয় হইত। আর বিশেষ কতদিন মাকে দেখি নাই, কতদিন যোগেশকে দেখি নাই। বাড়ী যাইবার জন্য মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চৈত্র মাসের শেষে বাবা লিখিলেন "বৈশাখ মাসে তোমার শুভবিবাহ স্থির করিয়াছি, অতএব তুমি পত্রপাঠ সত্বর আসিবে।" চিঠি পড়িয়া আমার একটি দৃশ্য মনে পড়িল। আমাকে দেখিলে সুলোচনা কেমন ছুটিয়া পলাইত—যেন একখানি বিদ্যুত চমকিয়া যাইত। সেই সুলোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী, যুগপৎ কতকটা আনন্দ লজ্জা ও গাম্ভীর্য্যে হৃদয় ভরিল।

৭

বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি বাটী আসিলাম। কতদিন পরে কুহকিনী রাজধানীর ক্রোড় হইতে স্নেহময়ী জন্মভূমির ক্রোড়ে আসিলাম। মেঠো পথ, পথের দুইধারে ফলভারনত আম্র কানন, কানন-শিরে প্রদোষের ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঐ মল্লিকদের শিবালয়, ঐ দত্তদের পেয়ারা বাগান, এই যে ঘোষেদের পুকুর দেখা যাইতেছে। কামিনী ঘাটে বাসন মাজিতেছে, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। পথের মাঝে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম, "বিষ্ণু-দাদা কখন এলে"? আঁক চিবাইতে চিবাইতে রসসিক্ত উদরে তাহার ছোট ভাইটী দিগম্বর বেশে ছুটিয়া আসিল, গোলমাল শুনিয়া রাই পিসি বাহিরে আসিলেন, এইরূপে বাটী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে আমার আগমন-বার্ত্তা গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। যে যেখানে ছিল সকলেই আমাকে দেখিতে আসিল।

আশীর্ব্বাদ প্রণামকাণ্ড শেষ হইলে মা আমার চিবুক তুলিয়া অভিনিবেশ সহকারে মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন "বাছা আমার একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। সে রঙ নাই, সে মুখ নাই, সে চেহারাই নাই। আহা সেখানে যত্ন করবার কে আছে, বাছার কত কষ্ট হইয়াছে।" গ্রামস্থ বৃদ্ধাগণ একবাক্যে মার কথা সমর্থন করিলেন। কেহ বলিলেন "আহা বাছার যত্নের শরীর, অযত্ন সইবে কেন? তা কষ্ট না হলে কি বিদ্যা-লাভ হয়? কথায় বলে "কষ্ট পেলে কৃষ্ণ মেলে।" কেহ বলিলেন "আহা বেঁচে থাক। সোনার চাঁদ ঘরে এল, এখন বিয়ে দিয়ে বউ বেটা কোলে নিয়ে জন্ম সার্থক কর।" এইরূপে বহুক্ষণ আলাপের পর সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

এতক্ষণ আমি যোগেশের সহিত আলাপ করিবার অবকাশও পাই নাই। এখন তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলিলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহাকে আর চেনা যায় না। শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, তজ্জন্য যোগেশকে কিছু অধিক দীর্ঘ বোধ হইতেছে। বদনমণ্ডল একেবারে রক্তশূন্য, চক্ষু নির্জীব। দেখিলে বোধহয় যেন যোগেশ সম্প্রতি কোন গুরুতর পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম; বলিলাম "যোগেশ! তুমি এমন হইয়াছ কেন? তোমার কিছু অসুখ হইয়াছিল"? যোগেশ হাসিয়া বলিল "কিছুই না।"

৮

১৭ই বৈশাখ। আজ আমার জীবনের একটী প্রধান স্মরণীয় দিন। আজ আমার সুলোচনার সহিত বিবাহ। এই বিবাহোৎসবে গ্রাম আজ আনন্দময় হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ সকলেই আমোদে মাতিয়াছে। আর আজ একবার যোগেশের দিকে চাহিয়া দেখ! শরীর ঘর্ম্মসিক্ত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, তবু তাহার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই। সে একাই আজ বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা। যেদিকে যাও যোগেশকে দেখিতে পাইবে, সর্ব্বত্রই সে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী কৌতুক দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে দর্শন দিলেন। আমাদের বাটী আলোকাকীর্ণ হইল, চারিদিকে তুমুল বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। যোগেশ তখন সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া আমার বেশভূষা করিতে আসিল। যোগেশের অনুরোধ আমি ছাড়াইতে পারি না। মস্ত এক ঢিলাপোষাক পরিয়া, মাথায় তাজ দিয়া সং সাজিলাম। অলঙ্কারেরও অভাব হইল না, তাহার উপর একরাশ ফুলের মালা গলায় দেওয়া হইল। এইরূপে যোগেশের মনোনীত বেশ হইলে নিষ্কৃতি পাইলাম। সেই বাদ্যকোলাহল, আলোকমালা ও সাজ-সজ্জাসহ গ্রামপ্রদক্ষিণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবুর বাটী পৌঁছিলাম।

৯

আমার বাল্যসহচরীটি বস্ত্রালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া আমার পার্শ্বে আনীত হইল। অন্তঃপুরে ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। আমার হাতের উপর একখানি কোমল ঘর্ম্মাক্ত হস্ত স্থাপিত হইল, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, আত্মীয়গণ সকলেই উপস্থিত, কিন্তু যোগেশ কোথায়, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

৯

বিবাহোৎসব সাঙ্গ হইল। জনকজননীর চিরবাঞ্ছিত সাধ পূর্ণ হইল। এ কয়েক দিন যোগেশের সহিত একবারও দেখা হয় নাই। বধূ আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে যখন আত্মীয়গণ সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যোগেশ তখন আসে নাই। আমারও যোগেশের কথা বড় একটা মনে পড়ে নাই। আজ সহসা মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল, যোগেশের সন্ধানে বাহির হইলাম। পথে সুলোচনার পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিলাম, যোগেশ কাল বিদেশে যাইবে। সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়া সে আমার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাদিগের বাটী গিয়াছে। শুনিয়া আমিত অবাক্, আবার বাটীর দিকে ফিরিলাম, আসিয়া দেখি যোগেশ একা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে।

আমি আসিয়াই বলিলাম "যোগেশ তুমি নাকি কাল চলিয়া যাইতেছ" ?

যোগেশ নতমুখে বলিল "হাঁ ভাই, কালই যাইব স্থির করিয়াছি। এতদিন আমি চলিয়া যাইতাম, কেবল তোমার সহিত দেখা হইবার আশায় ছিলাম।"

আমি বলিলাম "সেকি ভাই, তুমি কি বলিতেছ, বিদেশে যাইবে কেন? আমিত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

যোগেশ ক্ষীণস্বরে বলিল "বিজয়, চিরদিনই কি রাধাকৃষ্ণ বাবুর অন্নে প্রতিপালিত হইব? আপনার উন্নতি-চেষ্টা করিব না? এখানে থাকিয়া আর কি করিব? ভাই তুমি অনুমতি কর, বিদেশে গিয়া কার্য্যের চেষ্টা করি।"

আমি কাতর হইয়া বলিলাম "তবে, আর কিছুদিন থাক, আমি যখন কলিকাতা যাইব আমার সহিত যাইও।"

যোগেশ মিনতি-স্বরে বলিল "ভাই বিজয়, আর আমাকে বাধা দিও না। কাল যাইব স্থির করিয়াছি, তুমি বারণ করিলে যাইতে পারিব না।"

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। বিষণ্ণ মনে নীরব হইয়া রহিলাম। তখন যোগেশ বলিল "কাল প্রত্যুষে যাত্রা করিব, হয়ত কাল আর দেখা হইবে না। চল দুইজনে একবার নদীর ধারে যাই।" বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে যোগেশের সহিত চলিলাম। পথে কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিলাম না। নীরবে দুজনে নদীতীরে একটী অশ্বথ-তলে বসিলাম।

সেই একদিন আর এই একদিন! এখানে কতদিন যোগেশের সহিত বসিয়াছি, দুজনে দুজনের কথায় বিভোর হইয়া সন্ধ্যা কাটাইয়াছি, আজ শেষ সুখের দিন। হৃদয় উদ্বেলিত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

যোগেশের হাতখানি ধরিয়া বলিলাম "যোগেশ, ভাই আবার কবে তোমার সহিত দেখা হইবে? তুমি কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ?"

যোগেশ বলিল "কোথায় যাইব এখনও স্থির নাই, ভগবান যেখানে লইয়া যান সেই স্থানেই যাইব। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা, হয়ত আর কখনও দেখা হইবে না।" যোগেশের স্বর অতি মৃদু ও কম্পিত। স্বরে বুঝিলাম যোগেশ কাঁদিতেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। নদীর জলরাশিতে গভীর কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে,

যেন অন্ধকার নদী-দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। নদীর অতি অস্ফুট কলধ্বনি শুনা যাইতেছে। সহসা এক একটা উচ্ছৃঙ্খল বাতাস আসিয়া হা হা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। পাখীদের কোলাহল নীরব হইয়া গিয়াছে। সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি ও যোগেশ নীরবে নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম।

একটু পরে আমি বলিলাম "তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিলাম না। ভাই, আমাকে সর্ব্বদা সংবাদ দিও, আমি তোমার জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিব "

যোগেশ কিছু উত্তর দিল না। কেবল আমার হাতের উপর তাহার এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল।

১০

আরো ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। এ ছয় বৎসরে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রামে একটী ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা হইয়াছে, পূর্ব্বতন স্কুলটী পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন "মডেল স্কুল" নাম ধারণ করিয়াছে, মেঠো পথের পরিবর্ত্তে পাকা রাস্তা হইয়াছে, আর গ্রামবাসীগণেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঘোষেরা দুইভাই সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, চক্রবর্ত্তীদিগের খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রে বিবাদ চলিতেছে, এবং অন্য সকল ব্যক্তি সেই দলাদলিতে পরম আরামে আছেন।

আমি একজন গ্রামবাসী, অতএব আমারও অবশ্য পরি ন হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে সংসার-ভার আমার স্কন্ধে সহসা অবতরণ করিলে সেই সঙ্গে আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যও বর্দ্ধিত হইল। এখন আর সে আমোদপ্রিয়তা, সে চাপল্য নাই। এখন সর্ব্বদাই আমি কর্ম্মে ব্যস্ত, যেটুকু অবকাশ তা আমার একটী ক্ষুদ্র কন্যার মনস্তুষ্টিতেই ব্যয়িত হয়।

শোভার স ে আমার মায়ের বড় বিবাদ, কেননা শোভা আমার উপর আর মার কোন দখল রাখিতে দেয় না। খাওয়ার সময় মার অনুকরণে আমার সম্মুখে বসিয়া "আর ভাত নিবি, এটা একটু খা, ওটা একটু খা, এই সকল বলিয়া তিনিই আমার জননী—একথা সপ্রমাণ করেন। মা দাঁড়াইয়া দেখেন আর হাসেন। এইরূপ আমার দিনগুলা পরমসুখে কাটিতেছে।

মানুষ এমন স্বার্থপর! যে যোগেশ কেবল আমার সুখেই সুখী ছিল, আজ তার কথা দিনের ভিতর কয়বার স্মরণ করি? সেকি আর এ পৃথিবীতে আছে? জীবিত থাকিলে কি আর এতদিন আমার সংবাদ না লইয়া থাকিতে পারিত? আজ ছয় বৎসর হইল যোগেশ বিদেশে গিয়াছে, এ ছয় বৎসর তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক অনুসন্ধানেও কেহ কোন সংবাদ দিতে পারে নাই।

যোগেশ যখ নিকটে ছিল, আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন তাহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু এখন য়ই তাহার জন্য আক্ষেপ করেন "বাছা সেই যে কি ক্ষণে গেল আর এলোনা। আ মুখে কথাটী ছিল না, এমন গুণের ছেলে কি আর হয়।" গ্রামের সকলেই যোগেশে ন্য দুঃখিত, তাহার গুণে কেই বা বশ না ছিল! সকলেই বুঝিয়াছিল যে সে আর এ পৃ তে নাই। কেবল সুলোচনা বলিত "আমার মনে হয় যোগেশ দাদা ভাল আছে। যদি কদিন হঠাৎ একখানা তাঁর চিঠি আসে! ঠাকুর করেন যেন শীঘ্র আসে!" তাহার বিশ্বাস দেখিয়া আমার চোখে জল আসিত।

সুলোচনার কথা যথার্থ হইল। একদিন প্রাতে একখানি পত্রের উপরে দেখি যোগেশের হস্তাক্ষর! আনন্দে বাহজ্ঞানশূন্য হইলাম। পত্র আর খুলিতে পারি না, হাত কাঁপিতে লাগিল। এতদিন কেন যোগেশ সংবাদ দেয় নাই? না জানি পত্রের ভিতর কি আছে?

পত্র পড়িয়া আমার সে ক্ষণিক আনন্দ ফুরাইয়া গেল। যোগেশ লিখিয়াছে "ভাই বিজয়,

আমি বড় পীড়িত হইয়াছি, তোমাকে একবার দেখিবার জন্ম মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, যদি তুমি একবার এস, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই।" পড়িয়া বুঝিলাম যে পীড়া সামান্য নহে। আমি আর একদিনও বিলম্ব করিতে পারিলাম না। সেইদিনই বাটীর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যোগেশকে দেখিতে যাত্রা করিলাম।

১১

ছয় বৎসরের পর যোগেশের সহিত আমার দেখা হইল। দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। একটী নিম্নতলের অন্ধকার ঘরে যোগেশ রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। শরীর এত শীর্ণ যে শয্যায় কেহ আছে কি না সহসা বুঝা যায় না। কেবল কয়েকখানি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। চক্ষু এরূপ দীপ্তিহীন যে, দেখিলে জীবিতের চক্ষু বলিয়া বোধ হয় না। নিকটে একটু জল দিবে এরূপ কেহ নাই। আমি হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া বলিলাম "যোগেশ, ভাই একি? এইজন্যই কি আমাকে ডাকিয়াছিলে?" যোগেশ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল, ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা স্ফুরিত হইল। আর অমনিই চক্ষু-কোণে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল (স্বর শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।) "ভাই আমি তোমার আসিবার আশায় ছিলাম, বড় সাধ ছিল আর একবার তোমাকে দেখিব, ভগবান কৃপা করিয়া সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম "ভাই, আমি কি অপরাধ করেছিলাম? কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? কেন আমাকে এতদিন পত্র লিখিলে না?" আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া যোগেশ তদ্রূপ ক্ষীণস্বরে বলিল "আমাকে ক্ষমা কর ভাই, দুঃখিত হয়ো না। যদি পরলোক থাকে আবার আমাদের দেখা হবে।" এই কয়টী কথা বলিয়াই যোগেশ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম, যোগেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া আসিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইয়া থাকিল। একবার তাহার পাংশু ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বড় কারুণ্যের সহিত একটী অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হইল—"সুলোচনা"—শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কিছুই আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। অন্তরে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সেই দেবদুর্লভ মুমূর্ষু মুখের দিকে চাহিয়া আমার উচ্ছ্বসিত অশ্রুপ্রবাহ আর বাধা মানিল না। ললাটে উষ্ণজল স্পর্শে যোগেশ নয়ন মেলিল, আর একবার আমার দিকে চাহিল। সেই শেষ দৃষ্টি! এ জীবনে আর সে করুণ নয়নের দৃষ্টি দেখিতে পাইব না।

স্থানাভাবপ্রযুক্ত এবার "কাহাকে" ও অন্যান্য প্রবন্ধ গেল না।

মনসার ভাসান।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ন্যায় মনসার ভাসান একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কেতকা ক্ষেমানন্দ নামক কবিযুগল ইহার রচয়িতা। কথিত আছে এই গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গলাদেশে মনসাপূজার প্রচলন হইয়াছে। এই গ্রন্থে বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র প্রভৃতি সকল রসেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; সাবিত্রীর উপাখ্যান, শ্রীমন্তের মসান, প্রভৃতি বিষয় বঙ্গীয় নরনারীর নিকট যেরূপ প্রীতিকর, মনসার ভাসান অথবা বেহুলার কীর্ত্তিকাহিনীও পল্লীবাসী পুরুষ ও রমণীবর্গের নিকট সেইরূপ আদরণীয়; প্রকৃত পক্ষে বেহুলা, আদর্শসতী পৌরাণিক সাবিত্রীর অভিনব সংস্করণ। সাবিত্রীর উপাখ্যান কথকদিগের কথকথায় মধুরভাবে কীর্ত্তিত হয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয়ও দেখা যাইতেছে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া যাত্রাওয়ালারা শ্রীমন্তের মসান গাহিয়া থাকে, শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন, সিংহলে শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, তত্রত্য মসানে কালীকর্ত্তৃক শ্রীমন্তের উদ্ধার সাধন,—এ সমস্ত ঘটনা চণ্ডী ছাড়িয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মনসার ভাসান রঙ্গমঞ্চে বা যাত্রায় অভিনীত হইতে দেখা যায় না; না যাউক তথাপি তাহা বঙ্গীয় নরনারীর নিকট অভিনব নহে। অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্গের, অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই চাষার দলের মধ্যে মনসার ভাসানের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, মধ্যে এই ভাব লোপ পাইয়াছিল, এখন আবার পল্লীগ্রামের চাষাভুষার মধ্যে মনসার পালা গাহিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। দিনের বেলা চাষারা কেহ মাঠে চাষ করে, কেহ গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়বাতাড় বাঁধে, মজুর খাটে, ঘর ছায়, রাখালেরা গরু চরায়, যাহার যাহা দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করে, রাত্রে দশপনের জন একত্র হইয়া এক একটা আড্ডায় জোটে, এবং মনসার ভাসান বা বেহুলার পালার তালিম দেয়। এইরূপে প্রতি গ্রামে পাঁচ সাতটা দল হইয়াছে। কিছু পোষাক জুটাইতে পারিলেই ইহারা গৃহস্থের বাড়ীতে গান গাহিবার বায়না লইয়া থাকে। পোষাক ও বায়না উভয়ই অতি সামান্য। খানকয়েক পুরাতন শাড়ী, রঙ্গীন কাপড়, গোটাকত পরচুলা, দাড়ী গোঁফ, কয়েক খান পিতলের গহনা, নাচিবার জন্য ঘুঙুর, এই হইলেই পোষাকের কাজ শেষ হইল,—বায়না পাঁচশিকা। পাঁচ শিকা পাইলেই ইহারা সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন বেলা আট নয়টা পর্য্যন্ত গান করে। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত, নৃত্য গীত, বাদ্য চলিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের মধ্যে প্রায় প্রতি রাত্রেই কোন না কোন পাড়ায় বেহুলার পালা গীত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ কোন উৎসব উপলক্ষে কোন পাড়াই প্রায় ফাঁক যায় না।

পনের বিশ জন লোক সমস্ত রাত্রি গান করে, কিন্তু পাঁচ শিকা বায়নাতে তাহারা কেন এতটা কষ্ট স্বীকার করে, তাহা ভাবিলে প্রথমে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয় কিন্তু যাঁহারা একবার বেহুলার গান শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন এই সকল চাষা গান উপলক্ষে বায়নার অতি-

রিক্তও অনেক পয়সা উপায় করে। একে এই পালাটি অতি দীর্ঘ, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসরের মধ্যে নূতন নূতন সঙ্ খাড়া করিয়া ইহারা আরো অনেক সময় অনর্থক ব্যয় করে। পালার মধ্যে এত বেশী সঙ দিবার ইহাদের একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য পয়সা উপায় করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোটাদুই সতরঞ্চ টাঙ্গাইয়া নীচে মাদুর বিছাইয়া ইহারা আসর জমকাইয়া বসে। একটা কি দুইটা ডাবা হুকা, কয়েক সিলিম তামাক এবং গোটা কত কেরোসিনের টিমি জ্বালাইয়া দিয়াই গৃহস্থ নিষ্কৃতি পাইলেন। মাদুরের উপর বসিয়া একজন লোক ঢোলক বাজাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা চলিল, তিন চারটি ছোট ছোট চাষার ছেলে শাড়ী পরিয়া পায়ে নূপুর আঁটিয়া, গায়ে পিতলের বিবর্ণ গহনা দিয়া নর্ত্তকীবেশে আসরের মধ্যে নাচিতে আরম্ভ করিল, কখন গ্রীবা বক্র করিয়া, কোমরে হাত দিয়া, রুক্ষপরচুলা কিম্বা তাহার উপর বিন্যস্ত সোলার ফুল স্পর্শ করিয়া, কখন দুই হস্তে নানাভঙ্গীতে অঞ্চল ঘুরাইয়া, একবার ধীর, একবার চঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে, হয় ত বা একটা বহু পুরাতন, ভদ্রতা-বর্জ্জিত খেমটার গান ধরিতেছে—আর পাড়ার মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাতায়ন-বিলম্বিত চিকের আড়ালে আসিয়া বসিয়া কৌতুকপূর্ণনেত্রে তাহাদিগের সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছে—তাহাদের সেই সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে; দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা যুবকেরা, এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত নিদ্রা ছাড়িয়া আসরের চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া যায়; মেঠোসুরে তাহাদের সেই গ্রাম্যসঙ্গীত নিস্তব্ধ নৈশআকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

নাচিতে নাচিতে ও গান করিতে করিতে এই সকল কৃত্রিম নর্ত্তকী প্রত্যেক দর্শকের, সম্মুখে গিয়া হাত পাতে, অনেকেই তাহাদের হস্তে এক এক পয়সা ফেরি দেয়। রমণীগণও চিকের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া ইহাদের হাতে পয়সা ফেলিয়া দেন; এইরূপে একবারে যতগুলি পয়সা সংগ্রহ হয়, তাহা আসরের মধ্যস্থলে দলপতির সম্মুখে রক্ষিত রেকাবীর উপর জমা করা হয়।

নৃত্য শেষ হইলে দুইটি সঙ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল দলেই ঠিক এক রকম সঙ্ আসে না, কিন্তু সঙ আসিবেই। হয়ত কাপড়ের মোট ঘাড়ে করিয়া দুই ধোপা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতে লাঠি, একজন হয়ত তামাক খাইতে খাইতেই আসিয়া উপস্থিত, তাহাদের একগালে চুণ আর একগালে কালী। গালে চুণকালী লেপিবার কি অভিপ্রায় তাহা তাহারাই বলিতে পারে, বোধ করি তাহারা যে প্রকৃত ধোপা নয়, সঙ মাত্র, তাহাই বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। বিস্তর রহস্যালাপের পর একজন ধোপা তাহার সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা যাইতেছে কেন?—সে উত্তর দিল তাহার শ্বশুর কন্যা (অর্থাৎ স্ত্রী) তাহাকে 'মাওড়া' (মাতৃহীন) করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। (এই স্থূল রসিকতায় পুরুষ ও নারীগণের মধ্যে ভারি হাস্যধ্বনি উঠিল) তাহার তত্ত্বাবধান করিবার আর কেহ নাই বলিয়াই এক গান ধরিল। তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী রজকবন্ধু তাহাকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের

ব্যবস্থা দিল, এবং সে স্বয়ং সেই বন্ধুবরের জন্য ঘটকালী করিতে সম্মত হইল; ঘটকবিদায়ের জন্য পয়সা চাই, কিন্তু ঘরে পয়সা নাই, তখন বিরহপীড়িত, বিপত্নীক রজকবন্ধুর পরামর্শে শ্রোতাদিকের নিকট পয়সা ভিক্ষা চাইতে আরম্ভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের করুণা উদ্রেকের অভিপ্রায়ে হাস্যরসের এক গান ধরিল, অনেকে তাহাকে দুই একটি করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিল। পয়সা উপায়ের জন্য এইরূপে মধ্যে মধ্যে সঙ দিয়া এবং একটা গান পুনঃ পুনঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া আবৃত্তি করিয়া পালা এত দীর্ঘ করিয়া ফেলে যে, দুই রাত্রির কম তাহা শেষ হয় না। অনেক গৃহস্থ একরাত্রে পালা শেষ না হইলে বাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুরাত্রি গান দিয়া পালা সাঙ্গ করান, কারণ পল্লীগৃহিণীদিগের বিশ্বাস, যদি পালার শেষ পর্য্যন্ত গাহানো না হয়, তবে মনসাদেবী রাগ করেন, এবং বাড়ীতে সাপের অত্যন্ত উৎপাত ঘটিয়া থাকে। শাখাপল্লব এবং সঙ বাদ দিলে মনসার ভাসানের উপাখ্যান ভাগ যেরূপ দাঁড়ায়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"মহাদেবের মানসকন্যা পদ্মাবতী কৈলাসে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পার্ব্বতী পদ্মাবতীর রূপযৌবনদর্শনে কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিতা হইলেন, কারণ সাধারণ রমণীবর্গের ন্যায় পুরুষ জাতীর প্রতি তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না, বিশেষতঃ এই রূপ-যৌবন-সম্পন্না যুবতী যে তাঁহার সংসারবিরাগী স্বামীর মানসকন্যা, তদ্বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। অতএব কৈলাসে তাঁহার স্থান হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া মহাদেব মর্ত্ত্যলোকে গিয়া বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। পদ্মাবতী অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহেশ্বরকে বলিলেন "হে পিতঃ আমি কিরূপে মর্ত্ত্যবাসীর নিকট দেবপূজা লাভ করিব তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।" কন্যার বিনয়ে মহাদেব প্রীত হইয়া বলিলেন "বাঙ্গলামুলুকে চাম্পাই নগরের চাঁদ সদাগর একজন শ্রেষ্ঠ বণিক, সে তোমার পূজা করিলেই পৃথিবীতে তোমার পূজা প্রচলিত হইবে।"

পদ্মাবতী চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া চাঁদ সদাগরকে বলিল "সদাগর, তুমি ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর—তুমি আমার পূজা কর, তোমার ছয় ছেলে আছে, বারো ছেলে হইবে, তোমার ধন অক্ষয় হইবে।"—বোধকরি চাঁদ সদাগর পদ্মাবতীকে জানিত, তাই তাহার ভ্রূকুটি কুটিল চক্ষু বিঘুর্ণিত করিয়া কহিল ঃ—

"যে হস্তে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি,
সেই হস্তে পুজিব আমি তু' মনসা কাণী ?"

মনসা কিন্তু নড়ে না, চাঁদ সদাগর যদি তাহার পূজা না করে, তাহা হইলে ত তাহার পৃথিবীতে আসাই মিথ্যা। সে সদাগরকে নানারকমে অনুরোধ, উপরোধ করিল, কিন্তু একালের মত সেকালেও ক্ষমতা বা বল প্রকাশ না করিলে মানুষের কাছে পূজা আদায় হইত না। সুতরাং মনসার স্তবস্তুতি সমস্ত বিফল হইয়া গেল, সদাগর গলা উচু করিয়া বলিল "তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা, নতুবা এই হিন্তালের লাঠি দিয়া তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" মনসা দেবতাটি একেই ক্রূর প্রকৃতির, তাহার উপর সদাগর এই রকম অপ-

মান করিল ; অত্যন্ত গরম হইয়া মনসা বলিল "ধর্ম্ম তুই সাক্ষী থাক, আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইব"। সদাগর বলিল "হিন্তাল তুই সাক্ষী থাক, আমি কখনই ও কাণীর পূজা করিব না।"

মনসা চলিয়া গেল।

সদাগরের ছয় পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। বাণিজ্য শেষ করিয়া বিস্তর ধন-দৌলতে নৌকা বোঝাই করিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় মনসার মায়ায় 'কুমরা' নদীর মধ্যে ভয়ানক তুফান উঠিল। সদাগর-পুত্রদের ছয়খানি নৌকাই ডুবিয়া গেল, সদাগরের সকল পুত্রই নৌকার মধ্যে ছিল, তাহারাও সেই সঙ্গে ডুবিয়া মরিল।

ছয় পুত্রের মৃত্যুতে এবং ধনসম্পত্তি নাশে শোকাতুর সদাগর ইষ্টদেব মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিল। অতি উৎকট তপস্যা; মহাদেবের আসন টলিল, তিনি সশরীরে চাঁদ সদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া তুষ্টভাবে বলিলেন "তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখিত হইও না, আমার বরে তুমি একটি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, বংশের গৌরবস্বরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিবে।"

মহাদেবের অব্যর্থ বরে নিয়মিত সময়ে সদাগরের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। সদাগর তাহার নাম রাখিল "লখিন্দর।"

ক্রমে লখিন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তখন চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সেকালেও কন্যার বিবাহের জন্য পিতামাতার পরম দুশ্চিন্তা ছিল ; কিন্তু সদাগর এবং সদাগরপত্নী কোন খানেই পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী হইল না, বলিল, "আমার ঘরে ছয় ছয়টি বিধবা পুত্রবধূ আছে তাহাদের মুখ দেখিলে আর ঘরে বধূ আনিতে ইচ্ছা হয় না।"

অবশেষে স্থির হইল যদি কখনও সতী কন্যা পাওয়া যায়, তবে তাহারই সহিত লখিন্দরের বিবাহ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কিরূপে সতীর পরীক্ষা হইবে ?—স্থির হইল যে ছয়টি লোহার কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবে, সেই কন্যাই সতী বলিয়া গণ্য হইবে।

নানাস্থলে ঘটক পাঠান হইল, কিন্তু এই প্রকার দুর্লভ কন্যারত্ন লাভের কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। চাঁদ সদাগরের এই "ধনুকভাঙ্গা পণ" দেখিয়া ঘটকেরা তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, নানাস্থানে ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল ; তখন সদাগর তাহার পত্নীকে বলিল, "কাঞ্চন নগরে আমার এক বেয়াই আছে, তাহার কাছে গিয়া একবার ক'নের সন্ধান করিয়া আসি।"

চাঁদ সদাগর কাঞ্চন নগরে উপস্থিত হইলে, তাহার বৈবাহিক সবাহন সদাগর বিশেষ সমাদরে পা ধুইতে বলিল। চাঁদ ঘোড়ার পীঠে হইতেই বৈবাহিকের হস্তে পাঁচটা লোহার কলাই দিয়া বলিল "যদি আমাকে এই পাঁচটি লোহার কলাই সিদ্ধ করিয়া আনিয়া দিতে পার, তবেই তোমার ঘরে পা ধুইব।"

সবাহন সদাগর কলাই কয়টি হাতে লইয়া "বলিলেন এ আর আশ্চর্য্য কি, আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিদ্ধ করাইয়া আনিতেছি।"

সবাহন কলাই লইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্ত্রী বলিল "আমি কলাই সিদ্ধ করিয়া দিব, কিন্তু ইহা সিদ্ধ করিতে লাগিবে ঃ—

"বার গাড়ী কাঠ যে গো আর বার ঘড়া জল।"

কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা সবাহন সদাগরের পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। কাঠ ও জল সংগ্রহ হইলে সবাহনের স্ত্রী কলাই সিদ্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার অবিবাহিতা কন্যা বেহুলা সুন্দরী আসিয়া বলিল "মা তুমি কলাই সিদ্ধ করিয়ো না, যে সতীর কন্যা সতী হইবে কেবল সেই কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবে—আমাকে দাও আমি সিদ্ধ করিয়া দিতেছি।"

শুদ্ধ শরীরে কলাই সিদ্ধ করিতে হইবে, বেহুলা জলে নামিয়া ডুব দিল; ইতি মধ্যে মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে নদীতে নামিল, এবং বেহুলার হস্তভাড়নে বিক্ষিপ্ত জল তাহার গাত্রে পতিত হইল। মনসা অভিশাপ দিল 'তুই যে কাজ করিবার জন্য স্নান করিতে আসিয়াছিস, তাহা সিদ্ধ হইবে, কলাই সিদ্ধ করিতে পারিবি বটে কিন্তু বাসর ঘরে বিধবা হইবি। বাসর ঘরে সর্পাঘাতে তোর স্বামীর মৃত্যু হইবে।"

যাহা হউক স্নান করিয়া আসিলে বেহুলা কলাই সিদ্ধ করিয়া দিলে, চাঁদ সদাগরকে তাহা প্রদান করা হইল; সবাহন বলিল "বেয়াই, যাহা চাহিলে তাহা পাইলে ত, এখন পা ধোও।"—চাঁদ সদাগর ঘোড়া হইতে না নামিয়াই বলিল—"বেয়াই আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, যদি তাহা পূর্ণ কর, তবে তোমার বাড়ীতে পা ধুইব।"

সবাহন জিজ্ঞাসা করিল "কি প্রতিজ্ঞা ?"

চাঁদ সদাগর উত্তর করিল "তোমার যে কন্যা লোহার কলাই সিদ্ধ করিয়াছে, আমার পুত্র লখিন্দরের সহিত যদি তাহার বিবাহ দেও, তাহা হইলে তোমার বাড়ীতে পা ধুইব।"

সেকালেও কোন গুরুতর কাজ স্ত্রীলোকের পরামর্শ ভিন্ন সম্পন্ন হইত না, সবাহন বলিল "আমি একবার তোমার বেয়ানকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

বেয়ান বলিল "বেয়ায়ের ঘরে আমার এক মেয়ে বিধবা হইয়া আছে, তাহারই শোকে আমি ভাজাভাজা হইতেছি, আবার সেই ঘরে বিয়ে, কখন না।"

সবাহন বলিল "তা বটে, কিন্তু বেয়াই ছাড়ে না যে, এখন পর্য্যন্ত পা ধোয় নি।"

বিবাহের সম্বন্ধটা ভণ্ডুল করিবার জন্য স্বামী স্ত্রীতে অনেক রকমের উপায় খুঁজিতে লাগিল। সুপাত্রে মেয়ের বিবাহ দিতে একালে এ প্রকার কাজ নিতান্ত অসম্ভব, কিন্তু সেকালের নিয়মে সেকালে কাজ হইত, তাই সবাহন সদাগর একালের বরকর্ত্তার ন্যায় সেকালের বরকর্ত্তা চাঁদ সদাগরকে বলিল "বেয়াই, মেয়ের বিবাহ অবশ্য দিতে হইবে, কিন্তু আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে, যদি আমার মেয়ের সমান ওজনের বিশুদ্ধ সোণা আমাকে দিতে পার তবেই এ বিবাহে সম্মত হইতে পারি।"

সেকালেই হোক আর এ কালেই হোক এতটা পারিয়া উঠা বড় সহজ নহে, তাহাতে ছয় পুত্রের মৃত্যুতে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থনাশ হওয়াতে চাঁদ সদাগরের আর্থিক অবস্থা

এদানী বড় মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল ; এতখানি স্বর্ণদানে সম্মত হইতে পারিল না। বিফল-মনোরথ হইয়া চাম্পাইনগরে ফিরিয়া যাইতেছে, পথে দাঁড়াইয়া খেলা করিতে করিতে বেহুলা তাহাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তাউই মশায়, পা না ধুয়েই যে ফিরে যাচ্ছেন ?"—চাঁদ সদাগর উত্তর করিল "মা, তোমার সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ দিতে চাই, কিন্তু তা হইল না, তোমার বাপ তোমার সমান ওজনের সোণা চাহেন, আমার কি আর অত সোণা দিবার শক্তি আছে ?

বেহুলা বলিল "তাউই মশায়, আপনি ফিরিয়া আসুন, বাবার কথায় সম্মত হইলে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না, আমি আপনার গলার ঐ হারের চেয়ে ভারি হইব না।"

চাঁদ সদাগর আশ্বস্ত হইয়া বৈবাহিক-গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বলিল "আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, আমি এই হার দিলাম, তোমার কন্যাকে ওজন কর, যদি ইহা অপেক্ষা বেশী সোণা লাগে পরে দিব।"

বেহুলাকে ওজন করা হইল, কিন্তু তাহার ভার হারের ভার অপেক্ষা কম হইল। বেহুলার মা দুঃখ করিয়া বলিলেন :—

হাতের পাতের খাইয়ে বেউলো মানুষ ক'ল্লাম তোকে
এক গাছও হারের ভার হলি নে তোর মাথা খেয়ে।"

মায়ের অর্থলোভটা বেহুলার চক্ষে বোধ করি বড় ভাল লাগে নাই, সে মায়ের কথার উত্তরে বলিল :—

"আগে যদি জান্‌তাম মাগো টাকা নিবা তুমি
হারের অধিক ভার হইয়া থাকিতাম আমি।"

একটা আপত্তি কাটিয়া গেল, কিন্তু সবাহন সদাগর আবার নূতন নূতন আপত্তি তুলিতে লাগিল, শেষে তাহার একটাও টিকিল না। লখিন্দরের সহিত বেহুলার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

চাঁদ সদাগরের উপর মনসার কোপ এখন পর্য্যন্ত প্রশমিত হয় নাই, যেমন করিয়াই হোক চাঁদ সদাগরের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবে ইহাই মনসার চেষ্টা। মনসা ষোড়শী রূপসীর বেশে লখিন্দরের কাছে উপস্থিত হইয়া বেহুলার অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, বলিল বেহুলা 'চোক পুট পুটে, পেট ডাগরা কালো কুৎসিৎ মেয়ে' তাহাকে বিবাহ করা লখিন্দরের ন্যায় সুপুরুষের কখনই কর্ত্তব্য নহে ; তাহার পর নিজের সহিত বিবাহ করিবার জন্য লখিন্দরকে অনুরোধ করিল, বলিল,

"আমায় বিয়ে কররে নখা আমায় বিয়ে কর,
আমি যেমন যুব কন্যা তেমনি তুমি বর।"

লখিন্দর কিন্তু পিতার অনভিপ্রায়ে সেই অজ্ঞাত কুলশীলা যুবতীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল যে, বেহুলাকে না দেখিয়া কখন বিবাহ করা

হইবে না। কিন্তু বেহুলা বড় ঘরের মেয়ে, তাহাকে কিরূপে দেখা যায় ? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চাঁদ সদাগর সবাহন সদাগরের বাসস্থান কাঞ্চননগরে মহাসমারোহে এক হাট বসাইল এবং লখিন্দরকে সেই হাটের মালিক করিয়া দিল। লখিন্দর যথারীতি ব্যবসায় করিতে লাগিল, কিন্তু হায়, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, অনেকদিন কাটিয়া গেল, বেহুলার দর্শন মিলিল না।

কাঞ্চনী হেড়েনীর বাড়ী কাঞ্চননগরে। সে রসিকা, চঞ্চলা, সুন্দরী ; কাঞ্চনী দুবেলা লখিন্দরের হাট পরিস্কার করিত; এবং লখিন্দরের যৌবন, ঐশ্বর্য্য এবং কৌমার্য্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাট ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে লখিন্দরের প্রতি দুই একটা রঙ্গোক্তি বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করিত না। অনেক বিবেচনার পর লখিন্দর কাঞ্চনীকেই উপযুক্ত দূতী বলিয়া মনে করিল, কিন্তু বেহুলাকে একবার হাটে আনাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কাঞ্চনী এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, বলিল "বেহুলা বড়ঘরাণা, তাহাকে হাটে আনিলে আমার মাথা থাকিবে না।" লখিন্দর তাহাকে বিশেষ সাহস দিল এবং বেহুলাকে প্রলোভিত করিবার জন্য তাহার হস্তে একটি অতি সুন্দর স্বর্ণ পুত্তলিকা অর্পণ করিল।

যথাকালে কাঞ্চনী সেই সুবর্ণ পুত্তলিকা লইয়া বেহুলার নিকট উপস্থিত হইল। বেহুলা সেই পুত্তলিকাটি লইবার জন্য আবদার করিল ; কাঞ্চনী বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে, সে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে তাহার সঙ্গে হাটে গেলে এরকম পুতুল অনেক পাওয়া যায়। বেহুলা হাটে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া মায়ের অনুমতি আনিতে গেল, মা বলিলেন্ ঃ—

"ও হাটে যেয়োনা বেউলো, বেউলো আমার মা,
চাঁদের বেটা দুর্ল্লভ নথা দেখ্‌লে ছাড়্‌বে না।"

বেহুলার মায়ের এই ভয়ের কারণ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পল্লীবাসী গৃহস্থের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি হইলে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বর-ক'নের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অকল্যাণসূচক, হয়ত এই কারণেই বেহুলার মা, বেহুলাকে হাটে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেহুলা সে নিষেধ মানিল না, সে কাঞ্চনীর সঙ্গে লুকাইয়া হাটে গেল ; লখিন্দর দেখিল বেহুলা দেখিতে রাজকন্যার মত দিব্য রূপসী মেয়ে, তাহার আর বিবাহে কোন আপত্তি থাকিল না।

বিবাহ হইয়া গেল। পদ্মাবতী বেহুলাকে যে অভিশাপ দিয়াছিল, সে কথা সকলের মনে ছিল ; বেহুলার পিতামাতা লখিন্দরকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা সাতালি পর্ব্বতের উপর এক লৌহময় "নির্ম্মল বাসর ঘর" নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু মনসার প্ররোচনায় বিশ্বকর্ম্মা সেই বাসর গৃহে একটি সূত্রবৎ ছিদ্র রাখিয়া দিলেন।

নববিবাহিত দম্পতি সেই গৃহে শয়ন করিল। অনেকরাত্রে উভয়ে নিদ্রাগত হইলে কালনাগিনী অতি সূক্ষ্ম দেহধারণ করিয়া সেই ছিদ্রপথে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে রত্নদীপ জ্বলিতেছিল, সুসজ্জিত পালঙ্কে, প্রস্ফুটিত কুসুমদাম বিস্তৃত শয্যায় নবদম্পতি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

কালনাগিনী লখিন্দরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল, তাহাকে দংশন করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া বলিল "এমন রূপবান পুরুষ, আমি বিনা-দোষে ইহাকে কিরূপে দংশন করিব।" পদ্মাবতী বলিল "যদি সে তোমাকে আঘাত করে তাহা হইলে তাহাকে দংশন করিও।" কালনাগিনী ইহাতে সম্মত হইল।

পদ্মাবতী মায়াজাল বিস্তার করিয়া মশক সৃষ্টি করিল। লখিন্দরের হাতের উপর গিয়া একটি মশা বসিল ; লখিন্দর ঘুমের ঘোরে হাত ঝাড়িল, কালনাগিনীর গায়ের উপর গিয়া হাত পড়িল, নাগিনী ধর্ম্মকে ডাকিয়া বলিল "ধর্ম্ম তুই সাক্ষী, আমাকে মারিল।" দ্বিতীয় বার নখিন্দরের হাত নাগিনীর গাত্রস্পর্শ হইবামাত্র কালনাগিনী তাহাকে দংশন করিয়া চলিয়া গেল।

দংশনজ্বালায় অস্থির হইয়া লখিন্দর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তীব্রবিষে তাহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইয়া গেল, সর্পাহত যুবক বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল, বেহুলা আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময়ে কাঞ্চননগরে খোঁড়া বিনোদ রোজার বিশেষ প্রতি-পত্তি ছিল, তাঁহার ঝাড়া, ফোঁকা, জলপড়া অব্যর্থ। বিনোদ রোজার কাছে লোক ছুটিল। দূর হইতে বেহুলার ক্রন্দনধ্বনি বিনোদ রোজার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে বলিল :—

"আর কেঁদনা আর কেঁদনা বেহুলা সুন্দরী
আমি খোঁড়া বিনোদ রোজা আস্‌চি তোমার বাড়ী।"

পদ্মাবতী দেখিল বড় বিপদ, বিনোদ রোজা ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেই লখিন্দর বাঁচিয়া উঠিবে। তাহা হইলে তাহার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। পদ্মাবতী পথিমধ্যে বিনোদ রোজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অর্থদ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল। বিনোদ রোজা আসিয়া উল্টা মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িতে লাগিল, সুতরাং কোন ফল হইল না, রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই লখিন্দরের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল।

সেকালে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহের সংকার করা হইত না, পল্লীগ্রামের অনেক স্থলে এখনো হয় না ; লখিন্দরের মৃতদেহ মাড়ে করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বেহুলা বলিল "আমার স্বামী যখন পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন, তখন আমি কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব, স্বামীর দেহরক্ষা করিয়া আমিও মাড়ের উপর ভাসিয়া যাইব।" পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া বেহুলা মাড়ের উপর উঠিল, উৎসবপূর্ণ বিবাহভবন নিরানন্দময় শ্মশানে পরিণত হইল।

মাড় ভাসিতে ভাসিতে চলিল, কত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল, কত নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাড় তমোলুকের ঘাটে আসিয়া লাগিল।

রাত্রে শিবদুর্গা দুর আকাশপথে স্বেচ্ছাবিহারে যাইতেছিলেন, ভগবতী দেখিলেন নদী-কূলে মাড়ের উপর বসিয়া একজন রমণী পতিশোকে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। শিবের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু রমণীর করুণ রোদনে ভগবতীর হৃদয় বিগলিত হইল ; কাজেই পার্ব্বতী সহ মহাদেবকে সেই নদীতীরে আসিতে হইল। বেহুলার পতিভক্তি দেখিয়া

তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, বলিলেন, মনসার পূজা করিলেই অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে, লখিন্দর নবজীবন লাভ করিবে। বেহুলা ভক্তিভরে মনসার পূজা করিল। মনসা প্রীত হইয়া লখিন্দরকে পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। চাঁদ সদাগরের আবার সোণার সংসার হইল। মনসার ক্ষমতা দেখিয়া চাঁদ সদাগর আর "মনসাকাণী'র পূজার উপেক্ষা করিতে পারিল না।"—দেখাদেখি সকলেই মনসা পূজা ধরিল; সকলে বুঝিল মনসা বড় জাগ্রত দেবতা।

ইহাই বেহুলার পালা বা মনসার ভাসানের উপাখ্যান ভাগ। বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই উপাখ্যানের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। গায়কের মুখে মুখে চলিয়া আসাতে বোধহয় এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। চাষার দল এই পালার অভিনয় করিবার সময় ইহাতে এত সঙ্ ভাঁড়, আনিয়া ফেলে যে, পালা অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পালা গাহিবার বায়না পাঁচশিকা হইলেও ইহারা যে এক আসরে চারি পাঁচ টাকা উপায় করে, তাহার কারণ এই যে, একটা না একটা উপলক্ষ করিয়া ইহারা শ্রোতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া পয়সা ভিক্ষা করে। লখিন্দরের জন্ম হইল, তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে ভিক্ষা দেও, চাঁদ সদাগর অশ্বারোহণে কাঞ্চননগরে বৈবাহিক সম্ভাষণে আসিয়াছেন, ঘোড়ার সহিসকে বকসিস্ দেও, লখিন্দরের বিবাহ হইবে ঢুলি বাদ্যকর আসিয়াছে, তাহাদিগকে শিরোপা দিতে হইবে ইত্যাদি। পল্লীরমণীদিগের বিশ্বাস দুই এক পয়সা করিয়া না দিলে গান জমিতে পায় না, তাঁহারা যথাশক্তি পয়সা, পুরাতন বস্ত্র, চাউল প্রভৃতি দান করেন।

বেহুলার পালা পল্লীগ্রামের পুরুষ ও রমণীগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী। সংসারের সকল কাজ শেষ হইলে, নিদ্রা এবং বিরাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রাত্রির পর রাত্রি বেহুলার পালা শুনিয়া ক্লান্তিবোধ করেন না। পল্লীগ্রামে রমণীগণের নৃত্যগীতাস্বাদনের কোন সুবিধা নাই, যথেষ্ট অর্থব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলে যাত্রা দিয়াও উঠিতে পারে না, বেহুলার গানে তাহাদের সেই অভাব মোচন হয়; বিশেষতঃ ইহাতে এমন একটি করুণ রস আছে, একটি অনায়াস-লব্ধ সহজ সরলভাব আছে, যাহা পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীগণের নিত্য অভ্যস্ত। তাঁহারা ইহাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ বাহুল্যবর্জ্জিত গার্হস্থজীবনের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে পান; লখিন্দরের মত বালক, বেহুলার মত বালিকা, মনসার মত দেবতা তাঁহাদের অপরিচিত নহে। তাঁহারা এই গানের ভিতর দিয়া তাঁহাদেরই ন্যায় পল্লীসমাজের একটি বহুদূরবর্ত্তী মধুর চিত্র সন্দর্শন করেন, এবং ইহা তাঁহাদের নিকট পরমসুন্দর, অনিন্দনীয় বলিয়া বোধহয়।

নারী মঙ্গল।

১

জানি আমি নারী তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
হেরি সখি মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা ;
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা !
কিন্তু যবে হেরি সখি ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিকন রঙ্গিমা ;
ভাবের সে সমাবেশ ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা !)
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরে না গো বাণী !
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি ?

২

সুকেশিনি, সুহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী
পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী)
যাও অর্দ্ধ যামিনীতে—আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ; বধূ বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে ! নূপুর গুর্জ্জরী
নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী !
কি উৎসব ! হাসে দীপ; হাসে নেত্র-তারা ;
হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলি ; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে !
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !

৩

নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী,—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী !
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আমরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি !—ত্যাজি শাটী,
পরি এক আটপৌরে শাড়ি, হে সুন্দরি,
কোথা যাও ? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে !
পশিয়া রন্ধন-গৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
(সুস্বাদু !) রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে !
শব্দ ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা,
তুমি সখি অর্থময়ী ভাবময়ী গীতা !*

৪

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে রচে "মাধবিকা"—
চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ডোর !
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা।
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে, বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী !
হৃদি-কদম্বের শাখে দোলাইয়া "দোলা"
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি !
তাই সখি বঙ্গ-কবি "চিত্রা"র উদ্যানে
বসিয়া "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি ;
নাহি কাল, দেশ !") চাহি, তব মুখ-পানে,
"অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !"
"অন্তর মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী !

৫

তুমি মোর স্পর্শমণি। তোমার দুহাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দরিদ্র কঙ্কণদুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে !
গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে !
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে !
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
আমারো ছিল গো সখি মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !

৬

সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে

* গীতা = সঙ্গীত। দোহাই পাঠকের ; আমার এ শাদাসিধে কবিতায় কোন প্রকার আধ্যাত্মিকতার ভাণ্ নাই।

শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষমোহিনী ! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল !—চাহি তব পানে,
হর্ষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে
লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
ছিলে কি গো কল্পলতা ইন্দ্রের উদ্যানে
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু ! চাহি তব পানে
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নর্ত্তন শিখিত !
আকুলি সে দেব-ভূমি, স্বর্গের শেফালি !
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ ফুটিতে কি আলি ?

৭

তার পরে, বুঝি কোন দুর্ব্বাসার শাপে,
নারী হয়ে জনমিলে অবনি-মাঝার ?
তবু পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে !
তবু সখি, তোমার ও বদন-মণ্ডলে
উছলে, স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ !
কি বলিব ? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব !
কি বলিব ? হেরি কেহ কুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে "হের দেখ দরিদ্রের ঠাট !"
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে রত্নময়ি ! করেছ সম্রাট !*
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
কে পায় মরতে বল হেন উপহার ?

৮

তাই সখি তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে "একি !
"নির্জ্জনে কেমনে থাকে !"—হে কবি-প্রেয়সি
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান !
তুমি একা কথা কও ? দু চক্ষু চঞ্চল
কথা কয়, কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল,
কথা কয় শতমুখে কেশের কুন্তল,
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল !
কি উৎসব ! রূপ-রাজ্যে একি সুমঙ্গল ?
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল !

৯

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা !
"নির্জ্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে"
এই ভাবি হয় তারা বিস্ময়েতে সারা !
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য নয়ন রঞ্জন !
বসি তব রূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ
হেরি সখি ; সীমাশূন্য সে নীল-বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ,
দেব-বৃন্দ, দেব-বধূ, আলোক-বিমানে !
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
জীব রাজ্য তরু রাজ্য নর নারীময় !

১০

বিস্ময়-বিস্ফার নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহঃ,
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?
তার এত মাতৃভক্তি ! বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি ! দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত ?"—ওরূপ-অনলে
(হোমানলে) পুড়ায়েছি "আমিত্বের" দেহ !
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে !
স্বজনি লো তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী ;
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য কুম্ভ-মেলা-দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার ও আত্মাবধূ !—গড়েছে মন্দির
ভিতরে, বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির !

১১

লোকে বলে "সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার !
দু সন্ধ্যা জোটেনা অন্ন, দশা যার এই,
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার !"
"সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ,
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে !
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন,
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে ;"
অয়ি যাদুকরি ! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র—কবিতায় কল্পনায় দীক্ষা,
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা !
অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি পথের ভিখারী,
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি !

১২

লোকে বলে "এর হায় এমনি সুরীতি,

* সম্রাট=সম্রাটের ন্যায় অতুল ধনশালী।

পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা!) ছুইটি বৎসর!
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা-স্থল, বন্ধুতার ভীতি!)
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ অপ্রীতি
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে।
অদ্ভুত আলাপী!—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে!"
আমি হই হেসে সারা শুনে এ ভারতী!
স্বজনি, জানে না এরা—নির্ব্বাক নীরবে
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে!
মুগ্ধ হয়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তঃপ্রাণী;
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা,
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা!

১৩

লোকে হাসে হেরি মম বিধবার রীতি,
আতপ-তণ্ডুল-দুগ্ধ-উদ্ভিদের রসে
এ দেহ পালন! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম! একি রঙ্গ হায় এ বয়সে!
"পশু পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয়"
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা;
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ি,
অয়ি গৃহস্থের বধু, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
বাকল-বসনা "শোভা"—তাপসী সরলা,
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

১৪

কেহ বলে "আছে এর শিররোগ ব্যাধি;"
কেহ বলে "এ কবিটি নিশ্চয় পাগল;"
"ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল;"
এই রূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী!
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
তারা বলে "এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা!"—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে!
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে; আমি হয়ে ভোর,
পিই তাহা—মুখামুখি! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে!—অপরাধ ঘোর
এই মাত্র মোর—ওগো নিন্দা, দৈত্যবালা!
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর!

১৫

আলু থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতি স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা ভিতরে!
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে!

১৬

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্য এ যতন!
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা;
তিমির পুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা!
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে;
ঘোরা তমস্বিনী নিশি বহিছে ঝটিকা!
কবি-চিত্ত-বেলা-ভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল? হে নারি, মোহিনী-মূর্ত্তি ধরে'
শান্তি শান্তি উচ্চারিলে,---আইল অমনি
সাগর-সঙ্গমে মরি অর্থ-সুরধুনী!

১৭

নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী;
ছিল না উৎসব; যত ঐশ্বর্য্য বিভব
ছিল গুপ্ত; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী!
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায়;—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী!
সে দিন কি ভুলিয়াছি? ভোলা কি গো যায়?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি।
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী;
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট!
বিচিত্র-ফুল্ল-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি; গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি!

পিসি মা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠমাস। বেলা দুই প্রহর। চারিদিকে রো'দ চম্ চম্ করিতেছে। পবনদেব থাকিয়া থাকিয়া আগুনভরা হল্‌কা চালাইতেছেন—গা যেন ঝলসিয়া যাইতেছে। আমপাকানে রৌদ্রে রাশিকৃত আম্র পাকিতেছে, আর বেশীর ভাগ পাকিতেছে মানুষের গা। নদীখালে জল শুকাইয়া গিয়াছে—পূর্ণ জুয়ার ছুটিয়াছে লোকের শরীরে। পশুপক্ষী সব নীরব—কেবল ঘুঘুর করুণবেদনাপ্লুত স্বর, চাতকের উদাস প্রাণের বিষাদমাখা 'জল জল' রব মাঝে মাঝে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে।

নন্দীগ্রামের বোসেদের বাড়ীতে লোকজন বড় কেউ নাই। লোকের মধ্যে সরোজকুমার আর তাহার বুড়ী পিসি মা। প্রকৃতপক্ষে বুড়ী সরোজের পিসি মা নয়—তাহার মায়ের পিসি মা। মায়ের কথার প্রতিধ্বনির মত সরোজ শিশুকাল হইতেই তাহাকে পিসি মা বলিয়া আসিতেছে। উপরন্তু বুড়ী শুধু সরোজের পিসি মা নয়, গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোকেরই অযাচিত 'প'ড়ে পাওয়া' পিসি।

গ্রামের এ হেন 'যোগরূঢ়া' পিসি মা এই 'রৌদ্রময় নিশীথের' সময় খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া দুয়ারে পা মেলিয়া বসিয়া আছেন। পাশে তাঁহার প্রিয় বিড়াল গৌরমণি বহুযত্নের সহিত মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন—একটু আগেই একটী ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীকে তিনি ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার দুহিতাকে দান করিয়াছেন। দুহিতাটী লেজ ফুলাইয়া, থাবা মারিয়া মায়ের দানের দোষগুণ বিচার করিতেছেন। উঠানে একটী কেলে কুকুর আমূল জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে; টোস্ টোস্ করিয়া লাল ভূমিপৃষ্ঠে গড়াইয়া আসিয়া পড়িতেছে—পৃথিবীর এমনই জলের টান্!

ঘরের মধ্যে বিছানার উপর সরোজের সমবয়স্ক গ্রামের সাত আটটী বালক, একজন আর একজনের উপর পা তুলিয়া দিয়া সুপ্তিমগ্ন। গ্রীষ্ম ও নিদ্রার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। যাহাহউক নিদ্রারই জয়—তাই এত গ্রীষ্মে এত ঘুম। সকলেই নিদ্রিত, জাগিয়া আছে শুধু সরোজকুমার এবং সরোজের পাখাখানি।

সরোজের পিসি মা অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া সরোজকে বলিয়াছে বাবা আজকালকার রো'দে কোথাও বেরুস নি; ঘরের মধ্যে সাথী সঙ্গীদের নিয়ে যা ইচ্ছে করিস্। চারিদিকে যে 'ইন্‌খেলাপী' জ্বরের প্রাদুর্ভাব! (সরোজের পিসি influenza জ্বরকে 'ইন্‌খেলাপী' জ্বর বলিয়া থাকেন) বাবা! এ জ্বরে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু যে কাহিল হয় সে মরারই সামিল। কিছুদিন হইল তিনি নিজে সে রোগের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এত বয়স হইল কত রকম জ্বরে ভুগিয়াছেন, তার উপর সব কাজই করা চলিয়াছে কিন্তু এ জ্বরে এমন কাহিল

করে! এখন পর্য্যন্ত বুড়ী একটু হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই সে সরোজকে এত করিয়া অনুরোধ করিয়াছে। সরোজও তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করে নাই, যেহেতু খেলা ইত্যাদি যা কিছু সবই ঘরের মধ্যে চলে।

ঘরে সরোজ পড়িতেছে, বাহিরে বুড়ী ও নিদ্রার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে। ঘুম ঘাড় ধরিয়া খানিকটা ঝুঁকাইয়া দিতেছে, বুড়ী ঝাড়া দিয়া আবার উঠিয়া বসিতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ চলার পর নিদ্রা একবার এমন সজোরে ঘাড়ে চড়িলেন যে, বুড়ী একেবারে ভূমিতে ধুপুস্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল কেহ দেখিতে পাইল কি না। অমনি একখানি সরু গলার সুর বাজিয়া উঠিল 'আঁা গিন্নি ক'ল্লে কি? বরের সাম্‌নে লজ্জার মাথা খেয়ে প'ড়ে গেলে? আর কেহ না দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঠে পড়।' এদিকে সরোজ ভয়ানক হাসিল, সকল বন্ধুবান্ধবকে উঠাইয়া হাসিল। বুড়ী বলিল 'আমি ত আর তোদের মত যুবা নই; ঘুমের ঘোরে প'ড়ে গেলুম তা আর হাসলে কি হবে বাপু?'

এখন নবাগত সরু সুরখানির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনিও সরোজের বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী। বুড়ী, নামে পিসি মা হইলেও সম্পর্কে দিদিমাই আছেন; সুতরাং ছেলেরা ঠাট্টা তামাসা করিতে ছাড়ে না। সকলের মধ্য হইতে এই নবাগত বন্ধুটীই সম্প্রতি বুড়ির বর মনোনীত হইয়াছেন; কারণ ছেলের যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ! গলাখানি ত নয় যেন ঢোলের সঙ্গী শানাইটী! বরটী আসিয়াই নারিকেলদড়ি সংলগ্ন একটী বৃহৎ ভাঙ্গা তালা বুকে ঝুলাইলেন। বলাবাহুল্য, এটী চেন ঘড়ি। ভাঙ্গা 'ব্রশে' মাথা আঁচড়াইয়া চাঁচা গলায় বলিলেন 'কৈ হে কন্যাকর্ত্তা, দুয়ারে যে বর হাজির, কন্যা সম্প্রদান করবার দেরি কত?' সরোজ প্রভৃতি অন্যান্য ছেলেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'আসুন, আসুন; আপনারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি।' এই বলিয়া বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কেহ তাড়াতাড়ি উঠান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া কন্যার চুলে গুঁজিয়া দিলেন। কেহ শঙ্খ ঘণ্টা লইয়া পুরোহিত সাজিলেন। কেহ কন্যাকে কুলার বাতাস করিতে লাগিল। মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। বাজনার রোলে, ছেলেদের গোলে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময় বরকে একটা বাঁশে ঝুলাইয়া আনিয়া কন্যার সম্মুখে বসান হইল। শুভক্ষণে শুভলগ্নে মহাসমারোহের সহিত সরোজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বুড়ী বলিল 'দেখত বাপু, ছেলেগুলো যেন আমায় নিয়ে কি করে!'

বিবাহ সমাপনান্তে ভোজনের গোলমাল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল 'ও কন্যে, নিজে পরিবেশন ক'রে খাওয়াও না; কেমন কর্ম্মিষ্ঠি দেখা যাক্।' ভয়ানক জ্বালাতন আরম্ভ হইল। শেষে কন্যা উত্যক্ত হইয়া কাহারও হাতে একটি পাকা বেল দিলেন, কাহারও হাতে একটু কুলের আচার; কাহারও হাতে একটু আমের চাট্‌নি; কেহ বা মুড়ি লইয়া গালে পুরিল। এইরূপে ভোজনকাণ্ড শেষ হইল। বরকে পরিতোষ করিয়া খাওয়ান হইল। এমন সময় মরীচিমালী নিজের অসহ্য উত্তাপে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন।

মেঘমালা সিন্দূররাগে অনুরঞ্জিত হইয়া আকাশের উপর ভাসিয়া চলিল। সমীরণ সারাদিনের পর এখন একটু ঠাণ্ডা হইয়া মনের হরষে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে বৃক্ষশাখা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এমনই আমোদ আহ্লাদে সেদিনকার সেই দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল। বালকের দল স্বস্ব গৃহে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইল। যাইবার সময় সকলে বলিল 'পিসি, আজ তোমাকে অনেক জ্বালাতন করিলাম ; কিছু মনে ক'রো না।' পিসি বলিলেন 'বাবা, মনে ক'রব কি ? সরোজ আমার বেঁচে থাকুক, তোরা যেন চিরদিন এম্নি ক'রে জ্বালাতন করিস। সরোজের বিবাহের দিন যখন এমনি করবি, তখন আমার কত আনন্দ হবে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দশটা। আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে ; বাতাস মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিয়া হুহু করিয়া বহিতেছে। বৃষ্টির পতন-শব্দে ভেককুলের গ্যাঁ গোঁ রবে রজনী প্রতিধ্বনিত।

জল ঝড় দেখিয়া গৃহস্থেরা সকলে দুয়ারে খিল দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অসহ্য গ্রীষ্মে, দিবা নিদ্রায় রাত্রিতে নিদ্রাদেবীর সঙ্গে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আজ শীতল বাতাসে, বৃষ্টির ঝঙ্কারে, মেঘের গুরু গরজনে সকলেই অচিরে নিদ্রামগ্ন।

কেবল সরোজদের গৃহের মধ্যে সরোজ ও তাহার পিসি মা এখনও জাগ্রত। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। গৃহকোণে একটী মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সরোজ। আমি তোমাকে এত করিয়া বলি, তবু কেন যে তুমি শোন না বলিতে পারি না। আমিত আর কায়স্থের ঘরের অরক্ষণীয়া মেয়ে নই যে বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছ।

পিসি মা। কেন তোর কি আর বিবাহের সময় হয় নি ? বাপ মা থাক্‌লে এত দিন যে কোন কালে বিবাহ হ'য়ে যেত।

সরোজ। বিবাহের বয়স হয় নাই আমি তা বলছি না, এবং বাপ মা থাকলে বিবাহ যে এতদিন হ'য়ে যেত তাও জানি। কিন্তু এখন আমি কি ক'রে বিবাহ করি বল দেখি ? শুইবার একখানি ভাল ঘর নাই, দাঁড়াবার একটু জায়গা নাই, বাড়ী জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এমন অবস্থায় এত তাড়াতাড়ি বিবাহের দরকার কি ? পরীক্ষাটা দিই, পাশ হ'লে এক বৎসর একটা চাকরি নিয়ে বাড়ী ঘর মেরামত ক'রে বিবাহ ক'রবো। বলছি না ত বিবাহ ক'রব না।

পিসি মা। কেন তোকে ওসব কিছুই ভাবতে হবে না, শশুর হ'লে টাকা দিয়ে পড়াবে, বাড়ী ঘর সব মেরামত ক'রে দেবে ; তা হ'লে নির্ভাবনায় পড়া শুনোও ক'রতে পারবি।

সরোজ। ঐ ত তোমরা বোঝ না। কত আর ব'লব বল। বিয়ে হ'লে নানারকম দুর্ভাবনা এসে পড়ে। সেদিন এত ক'রে বুঝিয়ে দিলাম অন্ততঃ এ বৎসরটা নয়—তার পর যা হয় হবে। তখন তুমি বেশ বুঝলেও আবার সব উল্টে পাল্টে গেল।

পিসি মা। আমি বলি, আর কি বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রবি? সকাল সকাল বিয়ে হ'ক, দুটা ছেলে পিলে হ'ক, বাড়ীতে গোলমাল হ'ক, আর কি চিরকালই একলা থাক্‌তে পারি? আর দেখ্‌না ঘোষেদের সূর্য্যকুমার সকাল সকাল বিয়ে ক'রেছিল—সময়ে সোণার চাঁদ বেটাটী হ'ল, তাইত আজ মুঠোমুঠো টাকা রোজকার ক'রে বাবাকে দিচ্চে। আর গাঁয়ের সবাই ত আমাকে বলে 'ও মা আর বিয়ে না দিলে কি ভাল দেখায় গা? তুমি মন কর না ব'লেই ত হয় না। সরোজ কি আর নিজে লাফাবে বিয়ে ক'রব ব'লে! সরোজের ছোট, গাঁয়ের কোন্ ছেলের বিবাহ হ'তে বাকী আছে বলত?'

সরোজ। তা বেশ গাঁয়ের লোকের কথাতেই যদি বিয়ে হয় তবে তাই হ'ক। আমি ব'ললাম এখন হবে না, আর গাঁয়ের লোক তোমার কাণে যাদুমন্ত্র প'ড়ে দিলে তুমি নেচে উঠ্‌লে। গাছে উঠাতে সবাই আছে, নামাতে কেউ নাই। তুমি যেমন ক'রছ যেন বিয়ে আর কখনও হবে না। সে দিন শ্যামপুর হ'তে আমায় দেখ্‌তে আসবে সংবাদ এলো, আমি এত ক'রে ব'ললাম লিখে দাও আমি এখন বিয়ে ক'রব না। তুমি আমায় লুকিয়ে তাদের লিখ্‌লে 'তোমরা এসে পাত্র দেখে যাবে।' ভদ্রলোকেরা কষ্ট ক'রে এলো—বিয়ে দিতে কত জিদ্ ক'রলে—কৈ, পাব্‌লে কি? মাঝে থাক্‌তে একটা মনোবিবাদ হ'য়ে গেল। আবার আর এক জায়গায় লিখেছ পাত্র দেখে যেতে। তাদেরও সঙ্গে বিবাদ হ'ক! ভদ্রলোকদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কি বড় ভাল দেখায়? আমি বিবাহ না ক'রলে কৈ গ্রামের কেউ বিয়ে দিয়ে দিক্ দেখি?

পিসি মা। তাই তোর মনের ভাবটাই খুলে বল্‌না কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারি।

সরোজ। মনের ভাব আবার ক'বার ব'লতে হবে? বলেছিই ত এখন বিবাহ ক'রব না। আর এমন ক'রে যদি জ্বালাতন কর—একেবারেই বিয়ে ক'রব না। তোমার দশ জন মন্ত্রী, দেখি মন্ত্রীদের সাহায্যেই বা কি ক'র্‌তে পার।

বুড়ি মর্ম্মাহতা হইয়া বলিল—'তবে তুই বিয়ে ক'রবি না? আমি এত হাঁকুপাঁকু ক'রলে আর কি হবে? আর যদি তোকে কখনও বিয়ের সম্বন্ধে বলি তখন তার কথা। মর পোড়া মন বুঝেও বুঝে না কেন? আমার যদি কপালে সুখ থাকবে, তবে তেমন সোণার ভাইই বা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কেন? দুঃখ পাব ব'লেই ত সব হারিয়ে এ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে আছি! আমারই ত যাবার কথা! তা হ'লে এত যন্ত্রণা ভুগ্‌তে হ'ত না'—বৃদ্ধার চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বহুদিনের দমিত শোকাবেগ আজ নবীভূত হইয়া হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। বাহিরের বিষাদময়ী প্রকৃতির সহিত বুড়ীর হৃদয়ের অবস্থা মিলিয়া গেল। প্রাণে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল।

আর দুজনের মধ্যে কোন কথা হইল না। প্রদীপটী এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল এইবার তৈলাভাবে নিভিয়া গেল। গৃহের মধ্যে অন্ধকার গম্ গম্ করিতে লাগিল। একটা টিক্‌টিকি দেওয়ালের উপর হইতে শব্দ করিল—'ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্'।

কতক্ষণ পরে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা আসিয়া বৃদ্ধার গাত্রে স্বীয় মন্ত্রপূত অঙ্গুলি স্পর্শ করাইল—মোহনমন্ত্রে সব ভুলিয়া বুড়ী ঘুমাইয়া পড়িল।

সরোজের সে রাত্রে একটুও ঘুম হইল না। বৃদ্ধার দীর্ঘনিশ্বাস, দীনঅশ্রু, শত শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান দংশন করিতে লাগিল। সে আজ রাগের মাথায় এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধাকে সে জ্ঞাতসারে কখনও মনে কষ্ট দেয় নাই। আজ নূতন তাই বুঝি এত মনোভঙ্গ!

আহা বুড়ির আর কে আছে? নিজের পেটের কোন পুত্র কন্যা নাই। অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া ভ্রাতৃকন্যার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল; আশা ছিল—তবু নাতি নাতিনীদের লইয়া একটু মনের সুখে থাকিব। সরোজ প্রভৃতি বুড়ীর মানুষ করা ছেলে; জনয়িত্রী কেবল প্রসব করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু হা অদৃষ্ট! কি তোমার দুর্জ্জেয় শাসননীতি। সরোজের মা, বাপ, ভাই, ভগিনী সকলেই একে একে অকালে কাল-কবলিত হইল! রহিল কেবল সরোজকুমার—আর রহিল যাহার আগে যাওয়া উচিত ছিল, যে গেলে পৃথিবীর দুঃখের ভার কথঞ্চিৎ লঘু হইত। প্রকৃতি! মা একি তোমার রহস্য যে তুমি সর্ব্বোত্তম কুসুমকে কীটদষ্ট করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভূমে নিপাতিত কর? কে জানে—কে বলিবে?

বুড়ী প্রভাতে যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিল এই ধূসর অপরাহ্নে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! প্রকৃতির যে মোহন-মূরতি দেখিয়া প্রাণে বল পাইয়াছিল, তাহা এখন ঘন তমসায় আবৃত হইয়া গেল। তবু কুহকিনী আশা মরিল না—সে এই ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সরোজকে লতার মত জড়াইয়া রহিল। কিন্তু হায়, সে আশা-লতাটীও বুঝি এইবার ছিঁড়িয়া যায়!!

সরোজ পাটনায় পড়ে। অনেক দিন হইতে সরোজের বিবাহের কথা হইতেছে। সরোজ নানা কৌশলে বরাবর সে সব প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধবদের জীবন দেখিয়া সরোজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বাল্যকালে বিবাহ করিলে পড়াশুনা বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত হয়। পড়া শুনা শেষ করিয়া বিবাহ করিবে—ইহাই সরোজের একান্ত ইচ্ছা। এমন সময় হঠাৎ গ্রামে রাষ্ট্র হইল সরোজ খৃষ্টান্ হইবে।

সরোজের খৃষ্টানী লক্ষণের মধ্যে সে দিনক্ষণ দেখিয়া কোথাও যায় না, সকল ব্রাহ্মণবাড়ী খায় না, দুর্গাপূজার সময়ে বলিদানের পাঁটার মুণ্ডু ধরিতে চায় না ইত্যাদি। পাড়াগাঁয়ের Lady Parliament যে স্নানপুকুরের ঘাট, সেখানে এ বিষয়ের একটী ভারি 'গরম' আলোচনা চলিতে লাগিল। "ও মা, ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা গা! ছেলেটা বাপ পিতামহের কুলে কালি দিতে ব'সল!" সরোজের পিসি মা ঘাটে আসিলেই চারিদিক হইতে সমস্বরে বামাকণ্ঠ বাজিয়া উঠে—'দেখ পিসি এবার তুমি বিয়ে না দিয়ে ওকে কোথাও যেতে দিও না। এমনি কি ছেলের জিদ্! তুমি মানুষ মুনুষ ক'ল্লে তুমি বুঝি কেউ নও? ও গো কলিকালের ছেলে! খৃষ্টান হবে তাই বিয়ে করতে চায় না।' সরোজের পিসি মা ভাবিল 'তাইত'।

তাই সে এবার নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়াছে সরোজের বিবাহ দিবেই দিবে। সরোজ

এত করিয়া বুঝাইয়া বলে—'না পিসি আমি খৃষ্টান্ হ'তে যাব কেন?' আগে আগে বুড়ী সরোজের সব কথাতেই বিশ্বাস করিত আজ কাল তাহার এমন সরল কথাতেও মনের কোণে কেমন একটু সন্দেহের ছায়া থাকিয়া যায়।

বুড়ী মনে মনে আঁচিয়াছিল এবার সরোজের বিবাহ দিবে। সবই ত গেছে তবু যদি আঁধার মেঘের কোলে বিদ্যুতের ক্ষণিক উন্মেষের মত এই দুঃখের সংসারেও একটু সুখের আলো ফুটাইতে পারে! প্রাণের সাধ ছিল সরোজের বউটী আসিয়া বুড়ীর বৃদ্ধাবস্থার একটি কোমল সঙ্গিনী হইয়া বাড়ীতে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইবে, সরোজকে পানটী সাজিয়া দিবে, বিছানা করিয়া দিবে। তা দেখিলে বুড়ী তবু কতকটা মনের সুখে মরিতে পারে। কিন্তু আজ তার সব সাধে ছাই পড়িল!!

সরোজকুমার! বুড়ীর মনে কষ্ট দিয়া তুমি আজ ভাল করিলে না!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ ২০শে বৈশাখ—সরোজের পাটনায় ফিরিয়া যাইবার দিন। সরোজের বন্ধুরা সব সরোজকে বিদায় দিতে আসিয়াছে। গ্রীষ্মাবকাশে প্রায় আড়াই মাস সরোজ বাড়ীতে ছিল। বাড়ীতে কত ছেলে আসিত—কত গোলমাল ছিল। চলিয়া গেলে সরোজের পিসিমা কেমন করিয়া বাড়ীতে টিকিবে, তাই ভাবিয়া বুড়ী গত রাত্রে চক্ষে পাতায় করিতে পারে নাই। সরোজকে কত অনুনয় করিয়া বলিল "বাবা যখন যেমন থাক চিঠিপত্র দিতে ভুলো না। আমি এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে পড়িয়া থাকি কেউ জিজ্ঞাসা করবার লোক নাই। শরীরের কথা ত ব'লতে পারা যায় না—কখন কি হয়—মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিও। মাসে দুখানি ক'রে চিঠি দিও, বেশী চাই না। কেন বাবা আমায় চিঠি দিতে দেরি করিস্? আমার প্রাণটা তোর কাছে প'ড়ে থাকে। একটা টিকৃটিকি ডাকৃলে—একটা কাক মাথার উপর দিয়ে ডেকে গেলে, মনের মধ্যে কত ভাঙ্গি কত গড়ি! ওমা ছেলে আমার কেমন আছে! তোদের কি বাড়ী হ'তে বেরুলে কিছুই মনে থাকে না? সব ভুলে যাস্? ডাক হরকরা এলে মনে হয় তোর চিঠি আস্‌চে। তাড়াতাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেসা করি হাঁগা সরোজের চিঠি আছে কি? যখন সে বলে 'না গো নেই' তখন ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরে আসি। বাবা এবার আর এমন করিস্ না।"

সরোজের হৃদয়-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া আসিল—সে বেশী কথা বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'না ক'রব না।

সরোজের যাবার সময় হইল। বুড়ী বলিল "বাবা এইখানে মা বসুমতীকে প্রণাম কর, মা ভগবতীকে প্রণাম কর। হে মা মঙ্গলচণ্ডি, হে মা ভগবতি, ছেলের আমার একটী কুল কিনারা দাও মা। তোমায় আমি ষোল আনার ভোগ দেব।"

সরোজ বন্ধুদের নিকট বিদায় লইল তারপর পিসিকে একটী প্রণাম করিল। পিসি

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল 'দেখিস্ বাবা যা ব'লেছি ভুলিস্‌নে। তোর মুখ চেয়েই আমার থাকা—আবার কতদিনে চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে পাব!' এই বলিয়া সরোজের চিবুক ধরিয়া একটী চুমা খাইল।

সরোজ আর ফিরিয়া তাকাইতে পারিল না—দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বুড়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর গেল—যতক্ষণ সরোজকে দেখা গেল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। শেষে সরোজ অদৃশ্য হইয়া গেলে তাহার মুখের ছবিখানি বুকে ধরিয়া বাড়ী ফিরিল।

সরোজ রাস্তায় কত কি ভাবিল। চিন্তাস্রোত শতমুখী হইয়া কত দিকে ছুটিল—সে চিন্তা-স্রোতের থাই পাওয়া যায় না—সব গোলমেলে সব এলোমেলো। সুতরাং আমরা পাঠককে তাহার কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ দিতে পারিলাম না।

সরোজ রাস্তার মধ্যে নদী পার হইল, নদীর ক্ষুদ্রবীচি বক্ষে সোণালী রবি-কিরণের খেলা দেখিল, সবুজ মাঠে গো-বৎসের ছুটাছুটী দেখিল, রাখাল-বালকের মেঠো সুরের গান শুনিল, গাছে কোকিলের কুহুতান শুনিল—অবশেষে ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দে কুলিদের কোলাহলে, ক্ষণকালের জন্য সরোজের সব চিন্তা মন হইতে মুছিয়া গেল। সরোজ টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল—গাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরোজের পাটনায় আসিবার দিন হইতে আজ এক বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জগৎ কত অগ্রসর হইয়াছে প্রকৃতির উপর দিয়া কত পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সরোজ এবার যে পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাতে পাশ হইয়াছে। বাড়ী যাইবার গাড়ী ভাড়া ইত্যাদিতে কিছু টাকার দরকার, তাই সরোজ একটী Private tuition লইয়া দুই মাস কাজ করিতেছে তাই এতদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই। দু একদিনের মধ্যে বাড়ী যাইবে।

সরোজের প্রকৃতি, সে বড় কাহাকেও চিঠিপত্র দেয় না। বিশেষতঃ এবার পরীক্ষার গোলমালে প্রায় দুই মাস কোথাও চিঠি লিখিতে পারে নাই। দুই মাস পূর্ব্বে বাড়ী হইতে পিসিমার একখানি পত্র পাইয়াছিল—আজ দিব কাল দিব করিয়া এ পর্য্যন্ত উত্তর দেওয়া হয় নাই। সরোজ মনে করিল শীঘ্রই ত বাড়ী যাইতেছি আর পত্র দিয়ে লাভ কি? আসিবার দিন পিসিমার কাতর অনুনয়ের কথা স্মরণ করিয়া এবার ইহার আগে সে বাড়ীতে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়াছিল।

পিসিমার 'ইন্‌ফ্লেখেলাপী' জ্বরকে বড় ভয় তাই সরোজ বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে ইন্‌খেলাপির' একটা 'অব্যর্থ মহৌষধ' কিনিয়া লইল। পিসিমা আফিং খায় কিছু আফিং কিনিয়া লইল। আর প্রতিবার আসিবার সময় পিসিমা বলিয়া দেয় 'বাড়ীতে আসিস্, কি যে জলখাবার খেতে দিই ঠিক্ পাই না; তোদের ওখানে খুব ঘি ময়দা সুজি সস্তা, বাড়ী আসিবার সময়

কিছু কিছু সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিস্। তাই সরোজ সে সবও সঙ্গে লইল। প্রতিবারেই পিসিমা বলিয়া দেয়, কিন্তু কোনবারেই লইয়া যাওয়া হয় না। সরোজ মনে করিল এবার পিসি এ'সব লইয়া যাইতে দেখিয়া কত সুখী হইবে।

২৯শে আষাঢ় সরোজ বাড়ী রওনা হইল। এবার সরোজ 'পাশ পাইয়াছে' পিসিমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না। এইরূপ কত সুখের স্মৃতি লইয়া সরোজ ট্রেণে উঠিল। কত লোক উঠিল নামিল, সরোজ বেঞ্চির একটী পাশে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চারিদিকের প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। নীলাকাশে অজস্র নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে তাহাদের তরল কম্পিত কিরণকণা পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিয়া বাতাসের উপরেই মিলাইয়া গেছে। অদূরে পর্ব্বতমালা কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড দৈত্যের ন্যায় অলসভাবে শুইয়া আছে। প্রকৃতি নিস্পন্দ নীরব। কেবল ট্রেণের অবিরাম ঘটক ঘটক রব সেই নিস্তব্ধতার উপর শব্দের একটী তরঙ্গ উঠাইয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির এই গভীর সুপ্তি মাঝে সরোজের নিদ্রাকর্ষণ হইল। কতক্ষণ ঘুমাইল জানে না, হঠাৎ উঠিয়া দেখে—পাণ্ডুরবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদখানি আকাশের পথহীন পুষ্পিত প্রান্তরে ধীরে ধীরে আনমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর তাহার কোল হইতে খানিকটা জোছনাবসন বায়ুভরে উড়িয়া একটী ক্ষুদ্র তটিনীর লহরীবালার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া গেল। চির-পুরাতন নিত্য-নূতন তপনদেব উদয়সাগরে ভাসিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা হইল। সরোজ নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গাড়ি হইতে নামিল।

দোকানে আহারাদি সমাপন করিয়াই সরোজ বাড়ীর দিকে চলিল কারণ আজকাল প্রায়ই বৈকালে মেঘ ঝড় হইয়া থাকে। অনেকটা রাস্তা চলিতে হইবে, বেলাবেলি বাহির না হইলে বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে—সরোজ একলা।

যখন বাড়ী পৌঁছিতে আর একক্রোশ বাকী আছে তখন সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। ইতিপুর্ব্বে পশ্চিমদিকে একটু কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইতে না মিলাইতেই আকাশ ঘনঘটার তমোঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল—অন্ধকার দ্বিগুণতর গাঢ় হইয়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল। পথঘাট কিছুই দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখিতে দেখিতে ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সরোজ ভিজিতে ভিজিতে প্রাণপণে চলিতে লাগিল। বাড়ীতে গেলেই পিসিমা গরম জল করিয়া পা ধুয়াইয়া দিবে 'আহা কত কষ্ট হ'য়েছে বাছার আমার!' বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিবে।

যখন সরোজ গ্রামে ঢুকিল তখন কেবল টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে অশ্বত্থ গাছে পেচকেরা বিকট চীৎকার সহকারে পাখা ঝাড়িতেছে গ্রামের প্রান্তভাগে শৃগাল ডাকিতেছে। জলঝড়ে লোকজন কেহ রাস্তায় নাই সরোজ বরাবর বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সরোজ দেখিল ঘরে তালা লাগান। তবে বুঝি পিসি কোন গ্রামান্তরে গিয়াছে অথবা কাহারও বাড়ীতে গিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

জিনিষপত্র দুয়ারে ফেলিয়া সরোজ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী মিত্রদের বাড়ী গেল। সেই-খানেই সরোজের পিসি কাজকর্ম্ম সারিয়া গিয়া বসিত। দুয়ারে কপাট ছিল, সরোজ 'কাকিমা, কাকিমা' বলিয়া ডাকিল। শীঘ্র মিত্রগৃহিণী কপাট খুলিয়া দিলেন। সরোজ আগ্রহের সহিত বলিল 'কাকিমা তোমরা সব ভাল আছত? পিসি তোমাদের ঘরে ব'সে গল্প কর'ছে বুঝি? কিছু ব'লো না আমি হঠাৎ গিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়াব।' কাকিমার মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। সরোজ চমকিয়া উঠিল। কাকিমার দশ বৎসরের মেয়ে ননীর অসুখের কথা শুনিয়া-ছিল—সে ভাল আছে তো?

'আজ একমাস হ'ল তোর পিসি মারা গেছে সরোজ' বলিয়া কাকিমা কাঁদিয়া উঠিলেন। সরোজ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল।

কাকিমা বলিলেন 'সরোজ কি ক'রবি বল্ সংসারের ত বাবা কিছুই স্থায়ী নয়। তুই জ্ঞানবান ছেলে তোকে আর বেশী কি ব'লব।' এই বলিয়া হাত দিয়া সরোজের চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। তারপরে বলিলেন, 'সরোজ সমস্ত দিন তোর ভাল খাওয়া দাওয়া হয় নি এখন কিছু খা। ভিজে কাপড় ছাড় অসুখ ক'রবে।'

অনেকক্ষণ পরে সরোজ বলিল—'না কাকিমা আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।' কাকিমা বলিলেন 'তা কি হয় বাবা, আর কিছু না খাস্ একটু দুধ খা। আমার মাথা খাস্ একটু খা—খেয়ে আমার ঘরে শুয়ে থাক্। তোর ভাবনা কি—তুইত সরোজ আমাদেরই।'

কাকিমার বিশেষ পীড়াপীড়িতে সরোজ হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, একটু দুধ খাইল। পরে কাকিমার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গিয়া শুইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল—কাকিমা ঘুমাইয়া পড়িলেন। সরোজ তখনও বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছিল।

হায়! আজ সরোজের পিসি কোথায় গেল! সরোজের পাটনায় যাইবার দিন বুড়ী বলিয়াছিল বাবা আবার কতদিনে তোর চাঁদ মুখখানি দেখ্‌তে পাব। আজ সরোজ পাশ করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে কিন্তু বুড়ীকে আর সে মুখ দেখিতে হইল না—সেই চুম্বনই শেষ চুম্বন হইল!!

আজ কেবলই সরোজের মনে সেই রাত্রির কথা জাগিতেছিল—সেই রাত্রি যে রাত্রিতে সে তাহার পিসিকে বকিয়াছিল। সে আজ পিসির আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—পিসি, তুমি শুধু সরোজকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া জানিয়া গেলে! আমি তোমার বৃদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে পারিলাম না—তোমার ঋণ কিয়ৎ পরিমাণেও শুধিতে পারিলাম না!

হায়! মানুষ যদি আপনার হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে পারিত! যদি প্রেতাত্মার সহিত

কথাবার্ত্তা করা সম্ভব হইত! যদি আজ সরোজ কোন রকমে তাহার পিসিকে বুঝাইয়া দিতে পারিত যে সরোজ অকৃতজ্ঞ নয়!!

চন্দ্রিকাকিরণ গগনপ্রাঙ্গণে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, দোয়েলের মধুবর্ষী স্বরে তরুকানন প্রতিধ্বনিত হইবার পূর্ব্বেই, যখন আকাশ অযুত তারকাচ্ছন্ন—সরোজ ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। নিঃশব্দে সুপ্ত গ্রামখানি অতিক্রম করিয়া গেল। কোথায়?—সে জানে না।

হায়! সরোজ কিরূপ পূর্ণহৃদয়ে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল—যাইবার সময় কি ভয়ঙ্কর শূন্যহৃদয় বহন করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিল!

সংসারের অবলম্বন এমনই ক্ষণভঙ্গুর! পৃথিবীর আশ্রয়তরু এমনই কীট-জীর্ণ! আশার ছলনে ভুলিয়া মানুষ এমনই প্রতারিত হয়!!

পাঠক, পাঠিকা, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সরোজ আর যেন সংসারের কুহকে মুগ্ধ না হইয়া এমন স্থানে প্রাণের আশা নিবদ্ধ রাখিতে পারে যেখানে

নাহি মৃত্যু নাহি জরা, কেবলই প্রাণের ধারা,
ঝরিতেছে অবিরাম ঝর্ ঝর্ ঝর্
নাহি অন্ত অবসান, কেবলই অনন্ত প্রাণ,
খেলিতেছে চারিধারে তর্ তর্ তর্॥

পুরাবৃত্ত তত্ত্ব।

পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা যেমন সুখকর, নবীন ইতিবৃত্তের আলোচনা তেমন সুখকর নহে। পুরাবৃত্তের আলোচনায় আমরা সভ্যতম জনপদসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি ও উন্নতির কারণসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিজ্ঞাত হইতে পারি, নবীনইতিবৃত্তের আলোচনায় আমরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হই। বৃক্ষ, বৃক্ষের মূল, বৃক্ষের প্রকৃতি প্রভৃতি না বুঝিলে যেমন তাহার ফলের প্রকৃতি সহজে বুঝা যায় না, প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান না লইয়া নবীন ইতিবৃত্তের আলোচনা করিতে গেলে সমাজ ও দেশের মৌলিকতা তেমনি বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় না; এই জন্য পুরাবৃত্তের আলোচনা শিক্ষিত সমাজে বড়ই প্রীতিকর ও বিশেষ উপকারী। পুরাবৃত্তের আলোচনায় আমরা কেবল প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই এমত নহে, এই আলোচনায় আমরা আমাদের উর্দ্ধগমন বা অধঃপতনের মৌলিক কারণগুলির বিশ্লেষণ করিতে সম্যক প্রকারে সমর্থ হই। পীড়িত সমাজের পক্ষে প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা অব্যর্থ মহাভেষজ তুল্য; অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থানের পক্ষে ইহা মহামন্ত্র স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিহাস এজন্য বড়ই প্রয়োজনীয় পাঠ্য, দেশের

প্রাচীন ইতিহাস এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। য়িহুদীর সর্ব্ব প্রাচীন ইতিহাস এই জন্য বাইবেল বলিয়া খ্যাত; হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত ঠিক এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রের পঞ্চম অঙ্গ। শ্যামের শিক্ষিত "সাধু"গণ পুরাবৃত্তের পূজা করে; রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা প্রাচীন জেরুজেলমের ইতিবৃত্তকে বিবি মরিয়মের মূর্তির সম্মুখে রাখিয়া ইটালীদেশে প্রতি রবিবারে পুষ্প ও সুগন্ধি দ্বারা উৎসর্গীকৃত করে এবং সুইডেনের প্রাচীন ইতিহাস তথায় বাইবেলের তুল্য আদর পাইয়া থাকে। মুসলমানের অতি প্রাচীন ইতিহাসের প্রবাদবাক্য কোরাণের ন্যায় গৃহীত হয়, ইহা "হদিশ্ সরিফ্" নামে খ্যাত। এই হদিশ্ সরিফ্ কোরাণের ন্যায় পূজ্য। শিখের উৎপত্তির বিবরণী "গ্রন্থ সাহেব" নামে প্রসিদ্ধ, অমৃতসহরের সুবর্ণ মন্দিরে ইহার নিত্য আরতি হইয়া থাকে। পুরাবৃত্তের আলোচনায় শিবজির "শিবজিত্ব" এবং ম্যাট্‌শিনির "ম্যাটশিনিত্ব" জগতে এক অদ্ভূত নবীন শক্তির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, লাফায়েৎ, রণজিৎ সিংহ, হয়দর আলী, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির শক্তি, সামর্থ, দিগ্বিজয় ও পরাক্রমের একইমাত্র মূল—পুরাবৃত্তের সম্যক আলোচনা। এই জন্যই বুঝি বিশ্ববিখ্যাত গিবন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রমজাল এবং কাপুরুষতাকে বিনাশ করিতে ইতিহাস যেমন সমর্থ, কোনও স্বর্গস্থ দূত তেমন সমর্থ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ইতিহাস মহাজ্ঞানের আকর; চরিত্রকে উন্নত করিতে এতদপেক্ষা অধিকতর সহায় আর কিছুই নাই। ইতিহাস, আধ্যাত্মিক বলের অন্যতম প্রধান উত্তেজক; ধনশালী বিস্তৃত জনপদের বিনাশ, মহাপ্রতাপবান নরপতিদিগের দুর্গতি ও মৃত্যু এবং জগতের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন, এই সকল নিয়ত পাঠ করিয়া কাহার মনে জগতের নশ্বরতাব্যঞ্জক ভাবের উদয় না হয়? ইতিহাস, বৈরাগ্যের ভিত্তি।" হিউম বলিয়াছেন, "ক্ষুদ্রকে মহৎ করিতে ইতিহাসই মহামন্ত্র।" রাজা স্যার টি মাধব রাও সদতই বলিতেন, "ইতিহাস তরুতে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম এই চারি ফল ফলে, ইহা কল্পতরু, ইহার প্রসাদে অসম্ভব সম্ভবপর হইয়া থাকে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গভাষায় পুরাবৃত্তের আলোচনা দিনে দিনে কম হইয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইতেছি। দ্বাদশবর্ষকাল পূর্ব্বে পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্গসমাজ বেশ উৎসাহ ও সামর্থ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এখন ধর্ম্মধ্বজীদিগের প্রলাপপূর্ণ ধর্ম্মান্দোলনে এবং বহুসংখ্যক বাবু-ক্রেসীপরায়ণ রাজনৈতিকের চীৎকারে পুরাতত্ত্বের ক্ষীণ স্বর আর প্রায়ই শুনা যাইতেছে না। যে দেশে স্বদেশবৎসলতার প্রাচুর্য্য থাকে, যে সমাজে জাতীয় মহিমার প্রতি লোকের দৃঢ় আস্থা থাকে, সেই দেশেই পুরাবৃত্তের যথেষ্ট আলোচনা হয়। অধঃপতিত, বিদেশীয় পাদুকাতলে শায়িত, চিরপরাধীন কাঙ্গালী বাঙ্গালী আবার যদি কখন 'মানুষ' বলিয়া পরিচিত বা পরিগণিত হয়, তাহা হইলে পুরাবৃত্তের আলোচনা এবং পুরাবৃত্তের উপদেশানুসরণ করিয়াই হইবে, ইহাই সাধারণ মত। সারমেয় তাড়িত মেষ শিশুর ন্যায় আমরা দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; কর্ত্তিতকণ্ঠ রোহিত মীনের ন্যায় অপমান ও নির্যাতনে ছট্‌ফট্ করিতেছি; "জনকতক প্রহরীর ভয়ে আমাদের নয়নে ধাঁধা লাগিয়াছে," কিন্তু আমরা

যদি পুরাবৃত্ত-বিজ্ঞান বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এদশা ঘুচিয়া যায়, ইহাই আমাদের ধারণা। পুরাবৃত্তে যে শিক্ষা আছে তাহার অনুসরণ করিলে, কেবল ইহলোকে নহে, পরলোকেও আমাদের "সুন্দর গতি" হইতে পারে। পুরাবৃত্ত যিনি বুঝেন তিনি বিশ্বসংসারকে বুঝিতে পারেন এবং প্রকৃতির দুর্বুদ্ধ নিয়মগুলিও তাঁহার নিকটে আর অভেদনীয় প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয় না। পুরাবৃত্তের এত গৌরব বলিয়া, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তকার গৌরবে লিখিয়াছিলেন "আমি জগতের শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করি।" আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত সম্প্রতি প্রাচীন পুরাবৃত্তকারদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Our Conscript forefathers were not born of blood Royal, but they had kingdoms that knew no bounds: Their sway extended over the wide dominions of human thoughts." বাস্তবিক পুরাবৃত্তকার মানবসমাজের হৃদয়ের উপরে রাজত্ব করেন; যাঁহার পুরাবৃত্তে এ গুণ নাই, তাঁহার গ্রন্থ "পুরাবৃত্ত" নহে। যে লেখকের এ গুণ নাই, তাঁহার পক্ষে পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বাঙ্গালাদেশেও অনেকে অনেকবার লেখনী চালাইয়াছেন, অকারণে 'পেন্' চালাইয়া বহুশত হংসবংশধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গসমাজ যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা মিলে নাই; দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সে আশা-বুদ্বুদ নিরাশাবারিধিতে মিশিয়া গিয়াছে।

পারস্য সাহিত্যের অনুপম কবি, জগৎপ্রসিদ্ধ মোলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন—

হর্‌চে বুয়দ্ দর্ জাঁহা সনতে পর্‌বর্দ্দীগার।
জল্ বয়ে সানা দরো হস্‌ৎ বসে আস্‌কার॥
চশম্ কুজা বা সদৎ দিদায়ে মানী বেয়ার।
বর্গে দরখ্‌তান দর্ নজরে হুশীয়ার॥
হর্ বরখে দফ্‌তরেস্ত্ মার্ফত্তে কির্‌দ্‌গার॥
(গোলেস্তাঁ।)

এরূপ অনুপম কবিতা কেবল সেখ সাদির লেখনীতেই শোভা পায়। এমন মনোহর শ্লোক জগতে অতি বিরল, ইহার অক্ষরে অক্ষরে লেখকের হৃদয় ও মনের জীবন্ত পরিচয় দিতেছে। এমন উচ্চ ভাবের ও উচ্চ অঙ্গের কবিতা, পৃথিবীতে অধিক নাই। সেখ সাদীর "চশম্ কুজা বা সদৎ দিদায়ে মানী বেয়ার" এই পংক্তি এক্ষণে প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে, এই প্রবাদ-বাক্য প্রত্যেক পুরাবৃত্তকারের নীতি ও ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। আমিও সেখ সাদির ন্যায় বলিতে পারি, দিব্য চক্ষু যাঁহাদের লাভ হয় নাই, পুরাবৃত্তের খনি হইতে তাঁহারা রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করা কেবল আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান পুরুষদিগের পক্ষেই শোভা পায়। পুরাবৃত্তের প্রত্যেক পৃষ্ঠা বিজ্ঞানের হিরণ্ময় দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়; ত্রিবিধ দুঃখ—অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখ—বিনাশ করে, এবং পরিণামে ব্যক্তি বিশেষকে

বা মানবসমাজকে ইহজগত হইতে উন্নত জগতান্তরে লইয়া গিয়া ব্রহ্মানন্দে মিলাইয়া দেয়। কথাগুলি অনেকের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আমি ধীরে ধীরে পাঠককে তাহা বুঝাইয়া দিব। সাংসারিকবিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ইহলোক এবং পরলোক, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য 'যোগ' এবং' 'মায়া', পুরাবৃত্ততত্ত্বে কেমন অদ্ভুতরূপে লুক্কায়িত রহিয়াছে; প্রকৃতি সুন্দরী এই পুরাবৃত্ততত্ত্বে কেমন পূর্ণভাবে প্রকাশিতা হইয়া রহিয়াছেন; এই প্রস্তাবে আমি পাঠককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরাবৃত্ততত্ত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যা আমার নিজের নহে, ইহা ব্রহ্মবাদী সনাতন আর্য্য পিতামহদিগের অভিমতের সংক্ষিপ্ত সারাংশ মাত্র। গীতা, যোগবাশিষ্ঠ ও বেদান্তশাস্ত্র এই মতের স্রষ্টা, পুরাণ ইহার প্রচারক, ভাগবত ইহার ব্যাখ্যাকারী।*

কিন্তু "পুরাবৃত্ত" বলিলে আমরা কি বুঝি প্রথমে তাহার আলোচনা করা উচিত; পুরাবৃত্তের শব্দার্থটা প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া উচিত। পুরাবৃত্ত সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মানুসারে এবং ধাতুমালার মতে ইহার অর্থ, প্রাচীন ঘটনার দ্বিরাবৃত্তি। অথবা পুরাকালের বিবরণী। যাহাতে প্রাচীনকালের ঘটনাসমূহ লিখিত হইয়াছে অথবা আবৃত্ত করা গিয়াছে, তাহারই সাধারণ নাম পুরাবৃত্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মটিকে একটু ঘুরাইয়া লইলে, ইহার অন্য একটি অর্থ পাওয়া যায়; উদ্দেশ্য এক হইলেও এই অর্থ ঠিক মূল ব্যাকরণসঙ্গত হয় না। পুরাবৃত্ত বলিলে এই বুঝিতে হইবে, সংসারের শৈশব অবস্থা হইতে ইহার উন্নতিকাল পর্য্যন্ত, ইহার ভাগ্যচক্র যেরূপ ঘুরিয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত যাহাতে আবৃত্ত করা হইয়াছে তাহাই পুরাবৃত্ত; উভয়েরই এক অর্থ, কিন্তু ইহা নিয়মাতীত অর্থ। এই হিসাবে, জগতের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্তে ও ইতিহাসে বিভিন্নতা আছে, উভয়ে এক জাতীয় হইলেও লিঙ্গভেদ আছে। ইতিহাস কেবল মানবসমাজের চিত্র দেখায়, ইহার সীমা মানবসমাজের চিত্রের সীমায় যাইয়া মিশিলে আর অগ্রে যাইতে সমর্থ হয় না; পুরাবৃত্ত কেবল মানবসমাজের চিত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হয় না, ইহা চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ এই তিন জগতের প্রকৃতি ও চিত্র ঐতিহাসিক তুলিতে আঁকিয়া দেখাইয়া থাকে। পুরাবৃত্তের যে অংশ মানবসমাজ লইয়া বদ্ধ তাহারই নাম ইতিহাস; যে অংশ উদ্ভিদ জগত অধিকার করিয়াছে, তাহার নাম বটানি; যে অংশ জলস্থলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ তাহার নাম জিয়লজি; জীবতত্ত্বের অংশ বাইয়লজি নামে প্রসিদ্ধ এবং Ethnology ও Ethnography প্রভৃতিও ইহারই অন্যতম অংশ বিশেষ। পুরাবৃত্তের প্রথম ফর্মুলার নাম Evolution, ইহা Physical Geography নামক পুরাবৃত্তের অংশ বিশেষে ইংরাজী পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ফর্মুলা Indestructibility of

* এই প্রস্তাবে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, আমার অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কয়েকটি ইংরাজী বক্তৃতাতে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সময়ের ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র যাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উদ্ধৃত অংশে এই সকল কথার বোধ হয় ইতিপুর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছেন।—লেখক।

matter অর্থাৎ "পদার্থের পরিবর্ত্তন আছে, বিনাশ নাই।" তৃতীয় অথবা শেষ ফর্মুলা (Formula) এই যে Immateriality of soul অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি, উন্নতি ও অধঃপতন এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি অনাদি কালের আবর্ত্তনে কিরূপে ঘুরিতেছে ঘুরিয়াছে; ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মানব এবং মানবসমাজ কি প্রকার তালে তালে নাচিতেছে, ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে, কখনও উঠিতেছে; এই সকল কথা পুরাবৃত্ত দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতেছে। এই তিন ফর্মুলা হইতে আরও অনেক শাখা-ফর্মুলা ও উপশাখা-ফর্মুলা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা পরে বুঝাইব। পুরাবৃত্তের সর্ব্বশেষ উপদেশ এই যে, "যাহা আছে তাহার বিনাশ নাই, যাহা ছিল না তাহার জন্ম নাই, যাহা জন্মে নাই তাহা আর জন্মিতে পারে না এবং মৃত্যুই জীবের শেষ অবস্থা নহে।" ইহার সঙ্গে সঙ্গে, ইঙ্গিতে পুরাবৃত্ত আরও একটা শিক্ষা দিতেছেন, সেই মহাশিক্ষা এই—"যথায় ধর্ম্ম তথায় জয় ও সুখ।" এই উভয় শিক্ষার কথা গীতায় আছে।

এই সকল মহাবিজ্ঞানসিদ্ধ কথার বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা একদিনের কর্ম্ম নহে; ন্যায়শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদিগের ইহাতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া পড়িয়াছে; বেদান্তিকেরা এতজ্জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখনও ইহার কূল কিনারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্যসাধন জন্য পুরাবৃত্তের যে অংশ "ইতিহাস" নামে প্রসিদ্ধ, তাহারই আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইব। মূল ফর্ম্মূলাগুলির বিশ্লেষণ, ইতিহাসের সাহায্যেই করিব, এরূপ মনে করিয়াছি। প্রসঙ্গের বিষয় অতি প্রশস্ত, কিন্তু "ভারতীর" কলেবরে (বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায়) অনতি প্রশস্ত প্রবন্ধই শোভা পায়।

এক্ষণে পুরাবৃত্তের শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমরা সত্যের নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিব। পুরাবৃত্তের একটি প্রধান শিক্ষা এই যে, "ক্ষুদ্র হইতে মহৎ হয় অথবা তরল হইতে কঠিন হয়।" ইহাতে বোধ হয় "বীজাদঙ্কুর" ন্যায়ের তর্ক উঠিতে পারে; অনেকে বলিবেন, বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ? বাস্তবিক এই অন্ধকারময় নৈয়ায়িক প্রহেলিকা লইয়া বড়ই তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ না হইলে বীজ হয় না, আবার বীজ না হইলে বৃক্ষ কোথা হইতে হইবে? কিন্তু বীজ হইতেই বৃক্ষ ইহাই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। "বৃক্ষ না থাকিলে বীজ প্রথমে কোথা হইতে আসিল" এই তর্কের উত্তরে পুরাবৃত্ত বলিতেছে, বীজ অনাদি; যেমন পরমাণু, কাল, আত্মা ইত্যাদি অনাদি। তাহাতেই বলিতেছি, ক্ষুদ্র হইতেই মহৎ, যেমন বীজ হইতে মহীরুহ। নিদাঘের মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রে, তৃষিত কণ্ঠে ও অর্দ্ধদগ্ধ কলেবরে, পরিশ্রান্ত হইয়া পথিক যখন অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহরুহের জীবনানন্দদায়িনী ছায়ায় বসিয়া শান্তি লাভ করে, যখন তাহার আকাশ-আবরণী শাখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপুলবপু তরুবরের পরোপকার স্মরণকরতঃ মনে মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তখন কি সে ভাবিয়া দেখে, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজের ভিত্তি কোথায়? একবার বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বরোচ

নগরের জগৎবিখ্যাত কুবের বট দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই অনুপম বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক বসন্তসখার চঞ্চু হইতে একটি অভগ্ন অথচ সুপক্ক অশ্বত্থ ফল ধরাতলে পড়িয়া গেল। দ্বিখণ্ড করিয়া দেখিলাম, একটি ক্ষুদ্রফলে ৩৮৯টি বীজ রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্রফল ৩৮৯টি কুবের বটের জন্মদাতা! একথা ভাবিলে ও বুঝিলে জগতে "নিরাশা" নামে আর কোনও বস্তু থাকে না। এইরূপে সংসার, মানব এবং মানব সমাজ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; যে প্রকৃতিতে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তাহারই নাম Evolution; Evolution একটা Theory নহে, কেননা যাহা কিছু Theoretical তাহাই অনুমান ও খেয়ালসিদ্ধ; Evolution এখন practical জিনিষ, কেননা ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; পুরাবৃত্তের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এই দুই ভাগ ইহার practicalত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মানব সমাজের Evolution, ইতিহাস দেখাইয়া দেয়। এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে মহতের সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারউইন Evolution প্রকৃতির নীতিকে Biologyতে অর্থাৎ জীবতত্ত্বে লইয়া গিয়া বানরজাতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহারাই মানবজাতির আদিপুরুষ; কথাটা হাসির কথা হইলে হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বানর ও নরের প্রকৃতি যাঁহারা দেখিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিয়তই বলিয়া থাকেন বানরই বুঝি বা নর? অনেকে বলেন, Monkey, man কি? জীবতত্ত্বে, উদ্ভিদতত্ত্বে, অধিক কি প্রস্তর ও ধাতুতত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, ক্ষুদ্র হইতেই মহৎ; তিলে তিলে বাড়িয়া বাড়িয়া যেমন তিলোত্তমা, বিন্দু বিন্দু বাড়িয়া যেমন জ্যবণমুনির হংসকুণ্ডের জলরাশি, সেইরূপ ক্ষুদ্র বাড়িয়া বাড়িয়া মহৎ হয়; একেবারে বাড়িলে বালুকারাশির উপরিস্থিত সেতুর ন্যায় তাহা টিকেনা; ক্ষণমাত্র স্থায়ী ভূমিকম্পের ন্যায় তাহা কেবল অনিষ্টেরই কারণ হয়। কেহই একেবারে বড় হয় না; Rome was not built in a day, এই প্রবাদ বাক্য বড়ই সমীচিন। বৃদ্ধি ও পরিণতির বীজ ও শক্তি থাকিলে, ক্রমে ক্ষুদ্র মহত্ত্বে পরিণত হইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করে। নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া একবার মহত্ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার যদি পতনও হয়, তাহা হইলেও তাহার একেবারে বিনাশ হয় না, পরিবর্ত্তন হয়; সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার মহত্ত্বের বীজ থাকিয়া যায়; স্ফূরণ-শক্তির একটু উদ্ভব হইলেই আবার মহত্ত্বে আসিয়া পৌঁছে। বিনাশ হইলেও বীজ এবং শক্তি থাকিয়া যায়, এই নীতির উপরে নির্ভর করিয়া জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি, এই জন্যই অনেকে "সংস্কার" ও "পূর্ব্বজন্ম" মানেন। যাঁহারা ইহা মানেন না, তাঁহাদিগকেও ইহা প্রকারান্তরে মানিয়া চলিতে হয়। কালিদাস, সেক্‌স্‌পিয়র, টাসো, সাদি, বেদব্যাস, প্লেটো প্রভৃতি মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি এখনও পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অস্ফুটভাবে লুক্কায়িত আছে; স্ফূরিত হইলে দ্বিতীয় কালিদাস, দ্বিতীয় সাদি, ইত্যাদির উদ্ভব অসম্ভব নয়। কিন্তু এই স্ফূরণ অতি কমই হয়। যাঁহারা একবার মহত্ত্বে অথবা সর্ব্বোচ্চসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের (সাংসারিক ভাবে বলিতে হইলে) পতন হয়; ধর্ম্ম জগতে এই "পতনের" নাম "জীবন্মুক্তি"; যে মানব

সংসারে থাকিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসের বলে মানবীয় সর্ব্বোচ্চসীমায় পৌছিতে পারেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত কহা যায়, সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হয়, সুতরাং সংসারে তিনি "পতিত" কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে "উন্নত"। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিসমূহ উচ্চসীমায় আসিয়া পতিত হইয়াছে, এই পতন সাংসারিক ও স্বাভাবিক সুতরাং ধর্ম্মের সহিত ইহার সম্বন্ধ কম। যাহা কিছু অতি প্রাচীন, অতি বৃদ্ধ, অতি জীর্ণ বা শীর্ণ, তাহাই পতনোন্মুখ, ইহা নিত্য দেখিতেছি। প্রাচীন হইলেই তাহার পতন স্বাভাবিক, পরিবর্ত্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানবদেহের শৈশব, বাল্য, কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি যেমন পরিবর্ত্তন হয়, মানব সমাজেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। জীর্ণ, বৃদ্ধ বা প্রাচীন হইলে, যেখানে পরিবর্ত্তন বন্ধ হয়, সেখানে সমাজের শক্তি চলিয়া যায়, অধঃপতনের নিগৃহীত অবস্থায় পড়িয়া হায় হায় করিতে থাকে। নিতান্ত প্রাচীন সমাজের নিতান্ত পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক, এই পরিবর্ত্তনে নূতন শক্তি জন্মে; ধাতুজগতে দেখ, তাম্র বা লৌহ পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া লইলে তাহার রূপান্তর এবং প্রকৃত্যান্তর ঘটে। একশত আটবার তাম্র বা লৌহকে দগ্ধ করিলে, নূতন প্রকৃতির ধাতু প্রস্তুত হয়, যাহাতে তাম্র বা লৌহের শতগুণ শক্তি ও গুণ রাসায়নিকেরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উদ্ভিদ জগতের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত শুনুন। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এক প্রকার পুষ্প প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার বাঙ্গালা নাম গন্ধা বা গাঁদা অথবা গ্যাঁদা; ইংরাজীতে Marigold, পারস্যে হাজারা এবং আরবীতে অল্‌ফা কহে। এই ফুলের কোনও গন্ধই নাই, ইহার রঙ্গে কোনও নয়নানন্দদায়ক গুণ নাই, পত্র ছোট, ডাল ক্ষীণ এবং অতি সহজেই ইহা শুকাইয়া যায়। এই গাছের প্রকৃতি এই যে, ইহার শাখা কাটিয়া জমিতে প্রোথিত কর, নূতন বৃক্ষের উৎপাদন হইবে; নবোৎপাদিত বৃক্ষের শাখা লইয়া ভূমিতে আবার প্রোথিত কর, আবার নবীন বৃক্ষ দেখিবে। এইরূপে অন্ততঃ একশতবার করিলে, শেষে যে বৃক্ষ হইবে, তাহার কি অবস্থা হয় জানেন কি? সেই বৃক্ষের শাখা স্থূল ও দৃঢ়, পত্র প্রশস্ত ও ঘন, মূল শক্ত এবং ফুলগুলি বসোরার গোলাপের ন্যায় বড়, অতি মনোহর সৎগন্ধ যুক্ত এবং রঙ্গ নিতান্ত নয়নানন্দদায়ক হইয়া উঠে; ইহাকে তখন গোলাপ বলিয়া ভ্রম হয়। গাঁদা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, মানবসমাজ সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। এই জন্যই ভারতের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। এই পরিবর্ত্তন হইতে পাইতেছে না বলিয়া, ভারতের অধোগতি হইতেছে। জাপান বাড়িয়া উঠিয়াছে, পরিবর্ত্তনে; আমেরিকা দেশ এত উন্নত, পরিবর্ত্তনে; সেদিনকার অসভ্য ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ এখন জগতের শীর্ষ স্থানে, পরিবর্ত্তনে। যেখানে পরিবর্ত্তন, সেইখানেই উন্নতি, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যাহা কিছু প্রকৃতির নিয়মাধীন, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল; তুমি আমি কে যে এই নিয়মের গতিকে রোধ করিতে পারি? তুমি ধর্ম্মধ্বজী হইয়া যতই বৃথা চীৎকারে গোঁড়ামী বাড়াইতে চেষ্টা কর, ততই তোমার অজ্ঞানতার পরিচয় পাওয়া যায়; তোমার চীৎকারে প্রকৃতি আপনার নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভারতের সমাজের যিনি পরিবর্ত্তনের সহায়ক তিনি ভার-

তের প্রকৃত বন্ধু, যিনি পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধী তিনি দেশের মহাবৈরী। মহৎ হইয়া ক্ষুদ্র হইলেও পরিবর্ত্তনে আমরা আবার মহৎ হইব ; মহৎ হইয়া ক্ষুদ্র হইলেও প্রাচীন মহত্বের বীজ আমাদের মধ্যে আছে, তাহার স্ফূরণ হওয়া আবশ্যক। True greatness of a nation does not consist in its never falling but in falling and rising. পতিত হইয়া উর্দ্ধে উঠা ইহাই প্রকৃত মহত্ব। যে কখন পতিত হয় নাই, সে উচ্চপদের ও উচ্চস্থানের মহিমা বুঝে না। যে কখন দুঃখ পায় নাই সে যেমন সুখ কি তাহা জানে না, যে কখনও রাবণের কথা শুনে নাই সে যেমন রামচরিত্রের মহিমা বুঝিতে পারে না, যে জাতি কখনও মহৎ হইয়া ক্ষুদ্র হয় নাই, সে জাতি কখনও মহত্বের পরিচয় পায় নাই। আমাদের বীজ আছে, শক্তি আছে, স্ফূরণের আবশ্যক ; পরিবর্ত্তনে স্ফূরণ শক্তি জন্মে। পুরাবৃত্ত বলিয়া দিতেছে, আইস, আমরা আবার ক্ষুদ্রত্বকে মহত্বে লইয়া যাইতে চেষ্টা করি, কেননা ক্ষুদ্রত্ব মহত্বের প্রসূতি। আইস, আমরা পরিবর্ত্তনশীল হই। পরিবর্ত্তনের পরে যে নবীনত্ব হয় তাহা যৌবনের বল, উৎসাহ ও সৌন্দর্য্যকে ধারণ করে। মহাসিদ্ধযোগী পুরুষগণ জরায় যৌবনসঞ্চয় জন্য যেমন "কায়াকল্প" করেন, চ্যবণঋষি প্রবৃদ্ধাবস্থায় যুবা হইবার জন্য যেমন "চ্যবণপ্রাস" ভেষজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আইস, ভারতের যৌবন জন্য আমরা তেমনি কায়াকল্প বা চ্যবণপ্রাসের সৃষ্টি করি। "পরিবর্ত্তন" কি বর্ত্তমান সময়ে কায়াকল্প বা চ্যবণ-প্রাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে না? পুরুভূজকে কাটিলেও তাহা হইতে আবার পুরুভূজ জন্মে, রক্তবীজের দেহনিঃসৃত রক্তবিন্দু হইতে আবার রক্তবীজ জন্মে, গাঁদার কলমে আবার সুন্দর, নবীন, বলবান ও মনোহর গাঁদার সৃষ্টি হয় ; কর্ত্তিতকণ্ঠ হইয়াও ভারত আবার নবভাবে জাগিতে পারে ; ক্ষুদ্রত্বে আসিয়া আবার মহত্বে পৌঁছিতে পারে।

পুরাবৃত্তের আর একটি শিক্ষার নাম বৈরাগ্য। পুরাবৃত্তের প্রতি পত্রে তীব্র বৈরাগ্য। এই সংসার অতিথিশালা তুল্য ; আসা যাওয়া, জন্মমৃত্যু, ইত্যাদি অতিথিশালার পথিকের অবস্থান তুল্য যেন ক্ষণিক বলিয়া বোধহয়। যে আসিতেছে, সেই যাইতেছে, কেহই রহি-তেছে না। যে রাবণের রুদ্র প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্য্যন্ত ত্রাসিত ছিল, এখন সেই পৌলস্ত-কুলকঙ্কণ রাবণ এবং তাহার স্বর্ণ-কিরিটিনী লঙ্কা কোথায়? দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর, ইউরোপ ত্রাস নেপোলিয়ান, কুরুকুলমাতঙ্গ দুঃশাসন, ইহাদের আর চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে কি? যোগীকুল-গৌরব পাতঞ্জল, ভক্তকুলশোভণ রূপসনাতন, রাজকুল-অলঙ্কার যুধিষ্ঠির, ইহাঁদের আর কেহ কি বাঁচিয়া আছেন? রঘুকুলতিলক নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম এবং তাঁহার দেবদুর্লভ অযোধ্যা, ব্রজকুলভুষণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সর্ব্বসুখকরী মথুরাপুরী এখন কোথায় গেল? দেখিতেছ না, এই মায়াময় সংসারে সকলই অনিত্য, সকলই অসার। আমাদের সকলেরই জীবন "নলিনীদলগত জলবৎ তরলং।" প্রবলপ্রতাপী নাদির, ভারতগ্রাসী আওরঙ্গজেব, বিক্রমাবতার ভীম, কবিকুলরবি কালিদাস, ইহাদের কেহই নাই ; এই সকল পড়িয়া বুঝিতে পারিলে, মনে ঘোরতর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। এই অসার সংসারে, কে কাহার পিতা, কে

কাহার মাতা ? এক মায়াজালের কুহকে মুগ্ধ হইয়া, অসৎকে সৎ, অনিত্যকে নিত্য করিয়া তুলিতেছি। পুরাবৃত্ত হইতে এই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, পাঠককে মানবজীবনের উচ্চঅঙ্গে লইয়া যায়, এই উচ্চঅঙ্গে গিয়া রাজশ্রী জনক যোগী হইয়াও রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই উচ্চ অঙ্গে যাইলে মনুষ্য সংসারে "পদ্ম পত্রে বারি"র ন্যায় অমিলিত অবস্থায় অবস্থান করে; তৈল ও জল একত্র থাকিলেও যেমন মিশে না, পুরাবৃত্তপাঠক বিবেকী সংসারী হইয়াও, সংসারের মায়ায় মিশে না। এই সংসার একটি শূন্য ০ মাত্র; শূন্যের কোনও অর্থ নাই; কিন্তু শূন্যের প্রথমেই যদি ১ অঙ্ক বসাইয়া দাও তাহা হইলে ১০ হয়; এই সংসার শূন্য, এই শূন্যময় অসার সংসারের জীবনে যিনি ১ একমেবদ্বিতীয়ং ঐ একমাত্র মহাপুরুষকে (ভগবানকে) সারস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি শূন্যময় সংসারে থাকিলেও তাঁহার পক্ষে এই সংসার ১০ দশগুণ সহায় বলিয়া বোধ হয়। পুরাবৃত্তের ভূগোলের আলোচনায় দেখিতেছি, অসংখ্যাসংখ্য প্রাচীন জনপদের নাম নিশানা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, অসংখ্যাসংখ্য নূতন জনপদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমিকম্প, জলকম্প, উল্কাপাত, আগ্নেয় প্রস্রবণ, প্রবলবায়ু, সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতিতে নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জঙ্গল সহর হইতেছে, সহর জঙ্গল হইয়া গিয়াছে; জল স্থল হইয়া গিয়াছে; স্থল জল হইয়া গিয়াছে; উচ্চ নিম্ন হইতেছে, নিম্ন উচ্চ হইতেছে; সুতরাং পরিবর্ত্তনই সংসারের নিয়ম। এই অসত্য ও অনিত্য সংসারে পরিবর্ত্তনই কেবল সত্য ও নিত্যভাবে দেখা যায়। প্রকৃতির ইহাই বিধি, তবে তুমি কেমন করিয়া এই বিধির বৈপরীত্য করিতে চাহ? মানবসমাজের উন্নতি ও দৃঢ়তা পরিবর্ত্তনে, ভারতকে উন্নত করিতে হইলে ইহার সমাজের পরিবর্ত্তন আবশ্যক; যে ব্যক্তি এই পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধক সে ব্যক্তি দেশের শত্রু। পুরাবৃত্তের এই তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে আমরা পরিবর্ত্তনের আশ্চর্য্য শক্তি ও মহিমা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি।

পুরাবৃত্তের আর একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই যে, যেখানে অত্যাচার ও অনিয়ম সেই খানেই পতন। যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই নূতন শক্তির আবির্ভাব। আওরঙ্গজেব অত্যাচারী না হইলে শিখ ও মহারাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রয়োজন ছিল না; রোমাণ কাথলিকের ধর্ম্মধ্বজতা না বাড়িলে মার্টিন লুথারের আবশ্যকতা ছিল না; বঙ্গদেশ, শাক্ত কর্ত্তৃক পীড়িত না হইলে চৈতন্যের আবির্ভাব হইত না; ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মহম্মদ ও খৃষ্টের ধর্ম্ম তাহাই শিক্ষা দেয়; যেখানে ভক্ষক, সেখানে আশু রক্ষকের আবির্ভাব হয়। যেখানে অত্যাচার, সেইখানেই রাজার দুর্গতি ও পতন। যে প্রজা, রাজাকে অত্যাচারী হইতে দেয়, সে প্রজা রাজার শত্রুর কার্য্য করে। এই জন্য আমেরিকা স্পেনের

রাজার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়া স্পেনকে উচ্ছন্নাবস্থায় আনয়ন করিয়াছিল এবং এই জন্যই বহুশত প্রাচীন সাম্রাজ্য অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্রোড্ বলেন "অত্যাচারের ফল ফলে, কখন তাহা অদৃশ্য হয় না। একদিন না একদিন এজন্য অত্যাচারীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সে যদি তাহা না করে তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার বংশধরদিগকে অথবা সমাজ দেশ কিম্বা সমগ্রজাতিকে এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" সুবিখ্যাত পারস্য লেখক বুলবন লিখিয়াছেন "অত্যাচার করিয়া রাজত্বকে দৃঢ় রাখিয়াছে এমন সমাচার কোনও স্থানেই শুনি নাই। যেখানে অত্যাচার সেইখানেই রাজার দুর্গতি ও পতন।"

পুরাবৃত্তের আর একটি শিক্ষা এই যে, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই উন্নতি ও সুখ। গীতায় আছে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতি র্মম॥

অর্থাৎ, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ (ধর্ম্ম) এবং ধনুর্দ্ধর পার্থ (উৎসাহ) বর্ত্তমান, সেইখানেই শ্রীবিজয় নীতি সুমতি ইত্যাদি অবস্থান করে। ধর্ম্মহীনতায় শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে জয় বা শ্রী নাই। ধর্ম্মহীন হইলে বুদ্ধিহীন হয়, বুদ্ধিহীন হইলে—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে নামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ॥
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥"

এইরূপে দেখা যাইতেছে, পরিবর্ত্তন, ধর্ম্ম, উৎসাহ প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্য আপনার দেশ, সমাজ ও জাতিকে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। উন্নতির উপায় সমূহ পুরাবৃত্ত আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়।

এক্ষণে এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। স্বীকার করি, ইহাতে অনেক কথা বলিতে বাকী রহিল। "আসিয়ার ভাগ্যচক্র" নামক প্রবন্ধে পরে বাকী কথার মীমাংসা করিব। ভরসা করি, বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ পুরাবৃত্তের আলোচনায় অধিকতর মনোযোগী হইয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় সমাজের উন্নতি কল্পেও বদ্ধপরিকর হইবেন।

দেশ বিদেশ।

যাত্রা।

পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালী সহজে বিদেশে যাইতে চাহে না। যে যেথানে দূরে অদূরে থাকে, এই সুখের সময়ে বাড়ীতে আসিয়া জুটে। শরতের মধুর ছবির সহিত প্রকৃতির মধুর পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে মিশিয়া, যথন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আনন্দ কোলাহল জাগাইয়া দেয়—স্বামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী, পিতাপুত্র, যথন অনেকদিনের প্রবাসীদিগকে দীর্ঘ বিরহের পর গৃহে পাইয়া আনন্দের প্রস্রবণে ডুবিতে থাকেন—বহুকালের পর যথন, কত প্রাণের লুক্কায়িত নীরবে পুষ্ট, ছায়াময়ী আশাটী ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, কত স্নেহ, কত প্রেম, কত প্রীতি, অনেকদিন ধরিয়া অজ্ঞাত ভাবে কত হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া যে সময়ে সহসা শতমুখে সহস্র জ্যোতির্ম্ময় ধারায় প্রবাহিত হইয়া স্নেহাধারদিগকে চারিদিক হইতে প্লাবিত করিয়া দেয়, সেই সময়ে আমি দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমি যাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাঁহারা আমার পরমাত্মীয়। তাঁহাদের প্রীতি, যত্নে ও স্নেহে ও সদাপ্রফুল্ল হাসিমাখা মুখ দেখিয়া আমার প্রবাসের কষ্ট নবোদিত সূর্য্যের ধীর প্রসারিত কিরণমালার মুখে ঘনচ্ছাদিত, পর্ব্বত সানুদেশবেষ্টিত প্রভাতী কুয়াসার ন্যায় কে জানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এত দূরে সুদূরপ্রসারিত পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত—এই বহুজনপূর্ণ নগরীর মধ্যে এক নিভৃত কোণে, স্নেহ ভালবাসা সহৃদয়তার পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া এ অধমের জন্য এতগুলি লোক যে হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়াছিল তাহা ত আগে জানিতাম না।

দেশ ছাড়িয়া হৃদয়ের যে অংশ শূন্য করিয়া আসিয়াছি—এখানে সেই শূন্য অংশ অযাচিত-স্নেহে শতগুণে পরিপূরিত হইয়াছে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দূর প্রদেশে নূতন পরিজনবর্গের নবোচ্ছ্বাসিত বৈচিত্র্যপূর্ণ স্নেহ-তরঙ্গের ধীর নিমজ্জনের সুখের সহিত, দেশের সেই চির-অভ্যস্ত, চির-পরিচিত চির-প্রবীণ, আজীবন-পুষ্ট অতীত সুখের স্মৃতির সহিত মিশাইলে কি যে এক অপূর্ব্ব সুখ সংযোগ হয় তাহা ঠিক্ ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারিবে না।

বন্ধুগণকে অশ্রুপূর্ণ আলিঙ্গনের সহিত বিদায় দিয়া আমি ত হৃদয়ের ভার লইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। ক্রমশঃ দুরাপস্থত ষ্টেসনস্থ আলোকমালার সহিত তাঁহাদের মুখ আর দেখা গেল না, তথন নিরুপায় হইয়া কাজেই নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম।

উপরে শয্যা বিছাইয়া নিদ্রার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিলাম। ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া সেই ধাবমান কক্ষের ইতস্ততঃ বিকীর্ণ প্রদীপ্ত গ্যাসালোকে চক্ষু বুজিলাম। গাড়ি দেখিতে দেখিতে হুস্ হুস্ শব্দে হুগলী ছাড়াইল।

হুগলী হইতে আমার অধিকৃত কক্ষে একটী অপরিচিত মুখ প্রবেশ করিয়াছিল। লোকটী দক্ষিণপ্রদেশী মারহাট্টা, অনুমানেই বুঝিলাম। তিনি নিজের জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া আমার ন্যায় উপরের শয্যা দখল করিলেন।

সর্ব্ব প্রথমেই তিনি আমার গন্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া আলাপের পথ উন্মুক্ত করিলেন। আদব কায়দা—*Introduction* এর কেতা কিছুই নাই—কেবল সহজভাবে সরল কথায় দুই চারিবার বাক্যালাপের পরই তাঁহার সহিত আমার বেশ বনিয়া গেল। আমি তাঁহাকে মারহাট্টী বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—তাহাই ঠিক। তিনি জুনাগড়ে থাকেন, প্রায় সাত বৎসরের পর বাড়ী ফিরিতেছেন।

লোকটী বড় সুন্দর প্রকৃতির। সামান্য বাক্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গতা দেখা দিল। ইংরাজি ও সংস্কৃত জানেন, বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন—বলিতে পারেন না। বয়স ৩৫ বৎসরের উর্দ্ধ নয়। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতায় খুল্লতাতের নিকট ব্যবসা ব্যপদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "মহাশয়! আমি ৫০০ শত টাকা পৈত্রিক পুঁজি লইয়া একক ব্যবসা আরম্ভ করি। খুড়া মহাশয় আমাকে কেবল ব্যবসার উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়াছিলেন, কিন্তু মূলধন এক কপর্দ্দকও দেন নাই। আমি আজ ৮ বৎসর কারবার করিতেছি, সমস্ত খরচখরচা বাদে এই কয়বৎসরে, প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছি।" আমি এই চাকরীগত-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে আজন্ম পরিপুষ্ট হইয়াও মনে মনে এই নবীন যুবকের আত্ম-নির্ভরতা ও উদ্যমশীলতার শত শত প্রশংসা করিলাম।

গাড়ী আসানসোল ছাড়াইলে আমি মুড়ি দিয়া শুইলাম। অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে, কিন্তু সহসা কি এক, সুন্দর তানলয়পূর্ণ স্বরলহরীতে আমার সেই নবাগত তন্দ্রা শীঘ্রই চঞ্চল হইয়া উঠিল। দেখিলাম অতি মধুর স্বরে স্পষ্ট উচ্চারণের সহিত কে সেই গভীর রাত্রে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

জুনাগড়ী মহাশয়, সেই গভীর রাত্রে গীতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। শ্লোকের পর শ্লোক-গুলি স্পষ্ট, বিশ্রুত, ও প্রকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়া—মুণ্ডিত, শীর্ষ শোভিত, উষ্ণীষ-বিরহিত মস্তকটী নাড়িয়া নাড়িয়া চিরাভ্যস্তভাবে তিনি সেগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পঠনভঙ্গী, একাগ্রতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

মধ্যরাত্রে গীতাপাঠ শেষ হইলে জয়দেবের দশাবতারের স্তোত্রটী সুরের সহিত গান করিয়া ক্ষণকালের জন্য সুরের তরঙ্গে কোমল কলকণ্ঠ-নিনাদে সেই নির্জ্জনকক্ষে অমৃতউৎস সৃজন করিয়া জুনাগড়ী মহাশয় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এটি তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। এই কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে, তিনি নিয়মিতরূপে প্রতিদিন রাত্রেই একবার করিয়া গীতা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন।

রাত্রি গভীর ও নিস্তব্ধ। উপরে স্থিরজ্যোতিঃ নক্ষত্রপূর্ণ নীলাকাশ, তাহার নীচে দুস্তর প্রান্তর, ও সূচীভেদ্য অন্ধকার। কেবলমাত্র এঞ্জিনের দ্রুতগমনজাত দীর্ঘশ্বাস ও কর্ণবিদারী

সঙ্কেতধ্বনি সেই গম্ভীর মৃতবৎ নিস্তব্ধতা ক্ষণেকের জন্য বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে। বেশ শীতল হাওয়া বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি একটু চক্ষু বুজিলাম। নিদ্রাও তখনি কৃপা করিয়া সকল চিন্তা ডুবাইয়া দিল।

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ডাক মোকামায় পৌঁছিল। রাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়াতে ও অভ্যাসগুণে, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিলাম। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সুষুপ্ত-প্রকৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। নিদ্রিতা প্রকৃতি মধুর প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালায় স্নাত ও পরিসিক্ত হইয়া বালার্ককরোচ্ছ্বাসিত তৃণশষ্পময় শ্যামল আবরণ দ্বাদশ ঘণ্টার জন্য লোক-লোচনের প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিল।

জুনাগড়ী মহাশয় তখনও নাক ডাকাইয়া বেশ নিদ্রা দিতেছেন। একবার মনে হইল তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া প্রকৃতির এই সুন্দর শোভা দেখাই, এই বিমল আনন্দ-উপভোগের অযাচিত অংশ প্রদান করি, কিন্তু একটু ভাবিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

প্রাতরাশের আয়োজন ক্রমে শেষ করিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিল। সময় ও রেলগাড়ী কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, কত যাত্রী উঠাইয়া নাবাইয়া গাড়ী মোগলসরাই পৌঁছিল।

মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী এলাহাবাদের দিকে ছুটিল। মধ্যাহ্ন-আলোকে পরিস্ফুট, সেই দুইদিকে প্রসারিত প্রান্তরের মধ্যে ক্রমে একদিকে বিন্ধ্যগিরির শ্যাম কলেবর, ও অপরদিকে আরঙ্গীবের কীর্ত্তিকলঙ্ক বহুদূরদৃষ্ট স্মৃতিময়ী মিনারের উচ্চ স্তম্ভগুলি দেখিয়া বুঝিলাম বেনারস ছাড়াইয়া গেলাম। তার পর মাঠের সেই শূন্যবিস্তৃতির মধ্যে চুনারের প্রস্তর দুর্গ নয়নপথে পতিত হইল। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদের পথে, অমন সুন্দরস্থানে অমন একটী দুর্গ আর কোথাও নাই।

চুনার ইংরাজ-প্রদত্ত নাম। সেই নামই এখন চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দুনাম "চরনাদ্রি গড়" "চণ্ডালগড়"। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর একটী শাখা, গঙ্গার গর্ভে বরাবর নামিয়া গিয়াছে। এই মনোহর স্থানে চুনারের প্রস্তরময়ী দুর্গ আজও অতীত কীর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্গের পরিধি দেড় মাইলের উপর। বাড়ীঘরগুলির অধিকাংশই আধুনিক, কিন্তু, তত্রাচ ইহাতে ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ অনেক প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী বলে—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ সহোদর "বৈরাগ্যশতক" প্রণেতা রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরি এই স্থানে নির্জ্জন যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। আরও শোনা যায়—চৌহান কুলচূড়ামণি, হিন্দুর শেষ সূর্য্যস্বরূপ পৃথ্বীরাজও এই স্থান দখল করিয়া কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর ইহা পাঠান বাদশাহ সের খাঁর হস্তগত হয়।

সেরখাঁর হাত হইতে হুমায়ুন এই দুর্গ কাড়িয়া লন। ১৫৭৫ অব্দে আকবরসাহ পুনরায় এই দুর্গে নিজ পতাকা উড্ডীন করেন। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইহা অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদতআলির হাতে পড়ে। সাদতআলির বংশধরদিগের নিকট হইতে

কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ কিছুদিনের জন্য এই দুর্গ কাড়িয়া লন। তারপর চেৎসিংহের সর্ব্বনাশের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহাতে অধিকার স্থাপন করেন। এইখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। আজও দুর্গের উচ্চস্তরে তাঁহার ব্যবহৃত সুধাধবলিত বাটীটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চুনারের অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ "দুর্গাকুণ্ড"। তাহার পর "কামাক্ষী" দেবীর মন্দির। এই সকল স্থানে চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের কয়েকখানি প্রস্তরলিপি সংগৃহীত হইয়া লক্ষ্ণৌএর যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। দুর্গাকুণ্ডে পূজার সময়ে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। চুনারের বালুকাপ্রস্তরের অনেক শিল্পদ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি মির্জ্জাপুর ছাড়াইল। মির্জ্জাপুর গঙ্গার ধারে অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। সহরটী নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীঘর সবই পাথরের। কাণপুরের সহিত প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে এ প্রদেশে মির্জ্জাপুর তুলা, গম, চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান ছিল। এক্ষণ কাণপুর অনেকটা বাণিজ্যপ্রাধান্যতা মির্জ্জাপুরের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। অদূর হইতে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের লোহিত পতাকা বায়ুভরে শূন্যে উড়িতেছে দেখিতে পাইলাম। নৈনি ছাড়াইয়া প্রায় বেলা তিনটার সময় গাড়ী এলাহাবাদ পৌছিল। কিছুক্ষণ আগে ষ্টেশনটী প্রায় জনশূন্য ছিল, কিন্তু গাড়ী আসিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক রুদ্ধ নগরীর জনতার দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে ষ্টেশন একটী প্রশস্ত রাজপথের জনতায় পূর্ণ হইল। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত। কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহে না, চাকর খুঁজিতে, কুলি ডাকিতে, লগেজ নামাইতে বন্ধুবান্ধবকে অন্বেষণ করিতে, সকলেরই মুখে এক বিষম উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। ক্ষণকালের জন্য সেই ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর একটা বিরাট ব্যস্ততার ছায়া পড়িয়াছে।

এই সময়ে আমি মারহাট্টী বন্ধুটীর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি অতি দুঃখিত মনে আমায় বিদায় দিলেন। অত অল্পকালের আলাপ যে বিদায়কালে উভয়েরই মুখে একটা মলিনতা ও বিশুষ্ক ভাবের ছায়া আনিয়া দিতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। বন্ধুটী প্রয়াগসঙ্গম দেখিবেন এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে নামিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোম্বে প্লাটফরমের দিকে চলিলাম।

সুখের বিষয় বোম্বের গাড়ীতে ভিড় কম। আমার কামরায় কেহই উঠিল না। দেখিতে দেখিতে দিল্লীর গাড়ী বাঁশী দিয়া ধূমরাশিফুৎকারের সহিত গম্ভীরভাবে সদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে সেই বিরাট জনতার যবনিকাপাত হইল।

খানিক পরে জব্বলপুর মেল ছাড়িল। বোম্বে, পুনা ও মধ্য প্রদেশ যাত্রীরা এই গাড়ীতে। জব্বলপুর মেল সকল মাটী মাড়াইয়া চলে। গাড়ীগুলি একই কোম্পানীর হইলেও এগুলির বন্দোবস্ত তত ভাল বোধ হইল না। গাড়ী আসিয়া নৈনিতে পৌছিলে একটী হিন্দুস্থানী যুবক আমাদের গাড়ীতে ঢুকিলেন। ইনি মাণিকপুরে ওকালতী করেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন গ্রাডুয়েট। লোকটী গম্ভীর প্রকৃতির হইলেও বেশ সামাজিক। বাঙ্গলাদেশ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লোক-জন, পথঘাট, ঘরবাড়ী, লাটপ্রাসাদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বাঙ্গালীসমাজ সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে উত্তরগুলি শুনিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে তাঁহার একটা উৎকৃষ্ট ধারণা হইল, কিন্তু তিনি কলিকাতা না দেখিয়াই বোম্বেকে প্রাকৃতিক সমাবেশ অনুসারে প্রাধান্য প্রদান করিলেন। তাঁহার এ প্রকার সহজ সিদ্ধান্ত কতদূর ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না।

বারগড় হইতে বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী দেখা দিল। এই পর্ব্বতমালা এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্যপ্রদেশে ও মধ্যভারতবর্ষে সাতপুরা শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার রেলপথ বাঁকাচোরা, একদিকে পাহাড় অপরদিকে তরুলতা ও শস্যবিহীন বৃহৎ মাঠ, ইহাদের মধ্যে দিয়া অজাগরগতিতে বাঁকিয়া চুরিয়া গাড়ী চলিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যের অস্তগমন বড়ই মনোরমদৃশ্য। কাশ্মীরের পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমাদ্রি, হিমালয়ের উচ্চশিখরে কখন সূর্য্যাস্ত দর্শন করি নাই, তাহার সৌন্দর্য্যই বা কি কল্পনায় আনিতে পারি না, কিন্তু এখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে পথের সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। শ্যামল তরুলতাবেষ্টিত, গগনস্পর্শী দূরপ্রসারিত গিরিরাজির শিরদেশে রক্তিম কিরণছটা বিকীরণ করিয়া মরীচিমালী ধীরে ধীরে নীচে ডুবিতেছেন—সে দৃশ্য বড়ই প্রাণস্পর্শী। সমস্ত জগৎ যেন তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই মঙ্গলময়ের সান্ধ্য আরতির জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

গাড়ী মাণিকপুরে আসিল। হিন্দুস্থানী প্লীডারটী নামিয়া গেলেন। মাণিকপুর ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্যাণ্ড ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের সংযোগস্থলে। চিত্রকূটের যাত্রীরা এখান হইতে নামিয়া যান। এই পথেই ঝাঁসি যাওয়া যায়। বর্ত্তমান মাণিকপুর নগরটী প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত। অনেক প্রাচীন ভগ্নপ্রাসাদের কারুকার্য্যের চরমোৎকর্ষ-পরিচয়, ভারত-শিল্পীর শিল্প-কৌশলের পূর্ণ নিদর্শন, কালপরিবর্ত্তনে বনজঙ্গলে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার কতকগুলি বা বহুদূরে নীত হইয়া অনেক অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে। লক্ষ্ণৌএর ইমাম-বাড়ায়, আমি প্রাচীন মাণিকপুর হইতে আনীত গ্রথিত প্রস্তরের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত প্রশংসাই করিয়াছি।

মাণিকপুর অজয়গড়ের হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল। খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই রাজবংশ, মহা প্রতাপে এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আজ কালবশে, কোথায় বা তাঁহারা—আর তাঁহাদের গৌরবকীর্ত্তি! কোথায় বা জৈৎপুররাজ বীর গামন-সিংহ আর কোথায় তাঁহার ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ ও স্মরণস্তম্ভ! ক্ষীণপ্রবাহিনী কেইন নদী, বিশীর্ণা মূর্ত্তিতে কালের অতীত ইতিহাস কুক্ষিগত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর তাহার অপর পার্শ্বে ভূরাজগড়ের প্রস্তরদুর্গ আজও ইংরাজের গোলাগুলি খাইয়া অতীত স্মৃতিচিহ্ন লইয়া মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

মাণিকপুরের তিনটী ষ্টেশন পরে সট্‌না। যখন সট্‌নায় পৌছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা। বাহাদুরী করিয়া গরম কাপড়গুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে পূরিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া হার মানিয়া সেগুলি বাহির করিতে হইল। পাহাড়ে শীত এখানে হাড়ে হাড়ে বসিতেছে—একপাত্র চা'র বড়ই প্রয়োজন বোধ করিলাম। চা খাইয়া শরীরটা যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইল, গাড়ী অনেকক্ষণ থামিবে দেখিয়া ও ক্ষুধার উদ্রেক অনুভব করিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাও সারিয়া লইয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয্যাদখল করিলাম। শেষ ঘণ্টা দিল, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে—এমন সময়ে জনৈক মিলিটারী সস্ত্রীক গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে নেটিভ আছে জানিতে পারিলে সাহেব এ নিগ্রহ ভোগে রাজি হইতেন কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকিলেও বর্ত্তমানে গাড়ী ছাড়িবার মুখে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কক্ষ পাইয়া তিনি যে সুখী হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। একটী গ্লাডষ্টোন ব্যাগের উপর বড় বড় অক্ষরে "F. G. Lister Capt. Bo. Inf." এই দেখিয়া সাহেবের নামটী বিনা বাক্যালাপেই জানিয়া লইলাম।

সাহেব চুরুট ধরাইলেন, লেডি-পার্শ্বে গিয়া বেঞ্চের বিস্তীর্ণ শয্যায় কোমল দেহভার ন্যস্ত করিলেন। দুইজনের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথাবার্ত্তা ও মাঝে মাঝে হাস্যের তুফানও উঠিতে লাগিল। মেম সাহেব তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার কথা অনেক বলিলেন। তিনি সহায়তা না করিলে তাঁহার প্রিয়তম "ফ্রেড্" আজ নিশ্চয়ই গাড়ী ফেল হইতেন এ গর্ব্বটাই তাঁহার কথোপকথনের সর্ব্বত্রেই ব্যাপ্ত। রাত্রি বাড়িতেছে দেখিয়া সাহেব জিনিসপত্র সরাইয়া সেই বেঞ্চের উপর নিজের জন্য শয্যা বিছাইলেন; তাঁহার প্রিয়তমা Maryকে শয়নের জন্য অনুরোধ করিয়া নিজে আর একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া শিস্ দিতে দিতে "Auld Auld Scottie fawn" বলিয়া গান ধরিলেন। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিদ্রাদানই শেষ সিদ্ধান্ত করিলাম।

সট্‌না চলিয়া গেল। এখানে নামিবার ইচ্ছা ছিল। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ সট্‌নার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেবের উল্লিখিত বিখ্যাত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি "ভারতস্তূপ" সট্‌না হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে। আমাদের কলিকাতার বন্ধুগণ হয়ত স্থানীয় যাদুঘরের ডানদিকের প্রথম ঘরটিতেই এখানকার এক প্রাচীন বৌদ্ধমঠের বহুদূরপ্রসারিত লোহিতপ্রস্তরনির্ম্মিত তোরণদ্বার দেখিয়াছেন। প্রাচীনত্ব ছাড়া সট্‌নার গৌরবের আর কিছুই নাই। বিত্তমানকালে ইহা একটী স্বাস্থ্যকর মিলিটরি ষ্টেশন।

জব্বলপুরের আগের ষ্টেশন "দিউরী"। "দিউরী" পর্য্যন্ত বেশ ঘুমাইলাম। "দিউরী" ছাড়িল, জব্বলপুরে পৌছিবার বেশী বিলম্ব নাই। আমি মালপত্র গুছাইয়া প্রস্তুত হইলাম। উপর হইতে সমস্ত প্যাক করিয়া নীচে নামাইয়া সাহেবের এক পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। মেম্ সাহেব বেশ কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা দিতেছেন, সাহেব জাগিয়া আছেন। আমার প্রস্থানোদ্যোগ

সাহেব আগেই ঈষৎ, অপাঙ্গে দেখিতেছিলেন এখন সহৃদয়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "Babu ! is this your destination" আমি হাঁ বলিয়া একটী ধন্যবাদ ছাড়িয়া চুপ করিলাম। তাঁহার সেই শ্বেতবর্ণ মুখের রক্তপুষ্ট ওষ্ঠাধর দুইটি কেবল এই কয়েকটী কথা কহিয়াই আবার পূর্ব্বমৌন অবলম্বন করিল। প্রতিজিজ্ঞাসায় জানিলাম সাহেব বোম্বাইযাত্রী।

জব্বলপুরের ভূতপুর্ব্ব Extra Assistant. কমিশনার বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের জব্বলপুরের অবস্থান নির্দ্দেশ হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য বুদ্ধির দোষে সব বন্দোবস্ত ঠিক্ থাকিলেও বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। হাবড়া হইতে একখানি তার করিবার ইচ্ছা হইলেও ব্যস্ততার জন্য তখন তাহা করি নাই। তবু জব্বলপুরে পৌছিয়া ষ্টেশনের চারিদিকে একবার দেখিয়া লইলাম। কোন বাঙ্গালীর মুখই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমার আত্মীয়েরা জ্যোতিষজ্ঞ হইলে নিশ্চয়ই প্লাট্‌ফরমে পরিচিত মুখ দেখিতে পাইতাম।

যাই হ'ক তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তত রাত্রে সুষুপ্তিকাতর অপরিচিত নিদ্রিত নগরীর মধ্যে গিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী অন্বেষণ করার কষ্টভোগ অপেক্ষা, ষ্টেশনের বিশ্রামগৃহে রাত্রি কাটানই যুক্তিসঙ্গত ভাবিলাম। আর এক পাত্র চা উদরস্থ করিয়া সেই বিশ্রামকক্ষের বেত্রময় কাষ্ঠাসনের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া সুদূরস্থিত শস্যশ্যামল বাঙ্গলাদেশ ও দুরন্ত শীতপূর্ণ পাহাড়বেষ্টিত প্রবাস-পথ এই দুইএর চিন্তা একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলাম।

প্রভাত হইলে ভৃত্য আসিয়া জাগাইয়া দিল। দ্বারে গাড়ী প্রস্তুত। বেচারি কোম্পানীর নিমক্‌ভোজী হইয়াও পুরস্কারের আশায় আমার অর্দ্ধেক কার্য্য সারিয়া রাখিয়াছে। পার্শ্বস্থ কক্ষে গিয়া মুখ হাত ধুইলাম। তা'র পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া সহরের মধ্যে চলিলাম, তখনও পূর্ব্ব-গগণ বালার্কের মধুর ছটায় সম্পূর্ণ রক্তরঞ্জিত হয় নাই, তখনও পাখীরা গাছের ডালে বসিয়া প্রভাতীর গান বন্ধ করে নাই, তখন সবেমাত্র নিদ্রিত নগরী সমস্ত রাত্রের পর সজীবতায় ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। এত প্রভাতে—হৃদয়পোরা সুখস্মৃতি লইয়া, অপরিচিত রাজপথের উপর দিয়া কচিৎ দুই একটী প্রভাত-সমীরসেবী পান্থের বক্রদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, প্রবাস-আশ্রয়ে যাওয়ার যে কি একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, তাহা তখনই কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

জব্বলপুর।

তত প্রভাতে গিয়া সদর দরজায় ঘন ঘন আঘাত করাতে ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক অপরিচিত পুরুষকে এইরূপ অসময়ে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। এমন সময়ে শ্রীমান সুরেন্দ্রকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে সহসা, সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন! দীর্ঘ যাত্রা ও ক্লান্তির সহচর কাপড় পরিবর্ত্তন করিয়া আমি পরিজনমহলে সংক্রামকরূপে পরিব্যাপ্ত অস্ফুট আনন্দের অংশলাভ করিলাম।

প্রথমদিন বিশ্রামেই কাটিল। দ্বিতীয়দিনে সহরটী ঘুরিয়া আসিলাম। তৃতীয়দিনে "ভৃগুক্ষেত্র" গমনের আয়োজন স্থির হইল। ভৃগুক্ষেত্রে যাহা দেখিলাম তাহা জীবনে কখন দেখি নাই, সেগুলি বলিবার পূর্ব্বে তোমায় সহরের সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব।

জব্বলপুর আধুনিকতায় পরিপূর্ণ। প্রাচীনত্বের অতি অল্প নিদর্শনই ইহাতে আছে। চারিদিকে প্রকৃতি প্রস্তরময় প্রাচীর দিয়া এই ক্ষুদ্র নগরীটিকে বেষ্টন করিয়াছেন। নিজ সহরের যে দিকের বাহিরেই যাওয়া যায়, সেই দিকেই পাহাড়। সহরের বাহিরে ছাউনী—এদিকে আগাগোড়াই পাহাড়। সহরের পশ্চিমে একসময়ে প্রাচীন ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণ, বর্ত্তমানে সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত "গড়া" গ্রাম। এই গড়াই দুর্গাবতীর গড়মণ্ডলের এক অংশ। যখন গড়মণ্ডলের বৃত্তান্ত বলিব, তখন এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইব।

সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও এখানে মধ্যপ্রদেশের সিবিলবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটী উচ্চ আদালত আছে, অনেক মাজিষ্ট্রেট, তশীলদার ও আসিস্টাণ্ট কমিশনার এখানে কাছারি করেন। জব্বলপুর Non-Regulated Provinceএর সীমাভুক্ত, মধ্যপ্রদেশের চিফ্-কমিশনার সাহেবের অধীন। পশ্চিমের ছোটলাট ম্যাক্‌ডনেল সাহেব ও আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর ম্যাকেঞ্জি সাহেব জব্বলপুর সহরের অনেক উন্নতি করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। রাস্তাঘাট প্রশস্ত না হইলেও পরিষ্কার। অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুই অধিক। মুসলমানও যথেষ্ট। এ ছাড়া পাহাড়ী জাতির এক অংশ ক্রমশঃ সংঘর্ষণে সভ্য হইয়া সহরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব বেশী তা নয়। প্রায় ৬০।৭০ ঘর বাঙ্গালী এখানে কার্য্য ব্যপদেশে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুইচারিজন এখানে বাড়ীঘর করিয়া বসবাস করিতেছেন। বাবু নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি এই প্রদেশের কমিশনার ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার দবদবায় জব্বলপুর প্রদেশ থরহরি কাঁপিয়াছিল। বাঙ্গালী হইয়া অত স্বাধীন প্রকৃতির সহিত চাকরি করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

দেখিবার উপযুক্ত বড় বড় বাড়ীঘর জব্বলপুরে কিছুই নাই। হাইকোর্ট, ও সরকারী হাঁসপাতাল, ও রাজা গোকুল দাসের বাড়ী এখানকার দর্শনীয় বস্তু। জব্বলপুরে বাণিজ্য ব্যবসা খুব উচ্চ স্রোতে চলিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র নগরী হইতে প্রায় দেড় কোটী টাকার উপর মাল আমদানী রপ্তানীতে চালান হইয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসাদারদের মধ্যে রাজা গোকুল দাস সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার কাপড়ের কলটী আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের বাঙ্গলার ধনকুবেরেরা কবে এই পথের অবলম্বী হইবেন?

ঠগীজেল ও শিল্পবিদ্যালয় (School of Industry) এখানকার প্রধান দর্শনীয় বস্তু। কর্ণেল হিউজ্ হ্যালেট্ সাহেবের আমলে ঠগীজেলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। "ঠগ" কথাটা শুনিলে আজও মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই গুপ্ত নরঘাতক সম্প্রদায়, মধ্যপ্রদেশের মধ্যেই কিছু অধিক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত কর্ণেল শ্লিমান ঠগী ব্যাপারের চূড়ান্ত অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলা দুরন্ত ঠগকে এই জেলের ভিতর বন্দী

করেন। তাহাদেরই সন্তান সন্ততিরা এখন এই জেলের মধ্যে বাস করিতেছে। এখনও প্রায় তিন শত বা ততোধিক ঠগ-সন্তান এই জেলের ভিতর চিরআবদ্ধ থাকিয়া তাঁবু ও কার্পেট-নির্ম্মাণ শিল্পে জীবন সমর্পণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আজও সাহস করিয়া তাহাদের বাহিরে ছাড়িয়া দিতে রাজি নন। ভয়—পাছে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিততৃষ্ণা বাহ্য-জগতের সহিত সংমিশ্রণে আবার জাগিয়া উঠে!

জব্বলপুরের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানকার বাঙ্গালীসমাজ এই দূরদেশে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও বিদেশে বসিয়া শারদীয়া পূজার পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। অন্যান্যবার পূজার সময়, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শহজাঁহাপুর, কানপুর, আগরা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে কাটাইয়াছি। কিন্তু এখানে বাঙ্গালীরা দুর্গাপূজা লইয়া যেরূপ মাতিয়া উঠেন, আর কোথাও সেরূপ অনুপ্রাণতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন দিন মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। বেনারস হইতে পুরোহিত ও কারিগর আসিয়া প্রতিমার গঠন ও পূজার কার্য্যে ব্রতী হয়।

এবার পূজার প্রথমদিনে আমরা নাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। নাচের সভা ভারী গরম। সহরের ইংরাজ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বড় বড় লোকে সে স্থান পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী কমিশনার, সিবিল জজ হইতে কালেজের প্রোফেসরে সে স্থান পরিপূর্ণ। কমিশনার সাহেব, তাঁহার সহকারী পুলিশ সাহেব, সিবিল সার্জ্জন, কালেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ও অনেক মিলিটারী সাহেবে সেই "নাচ-মণ্ডপ" পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলকেই পশ্চিমের প্রথামত "পুষ্পগুচ্ছ," "আতর" দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইল। অনেক উচ্চ পদস্থ ইউরোপীয় মহিলাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় ইংরাজবাঙ্গালীর এরূপভাবে সম্মিলন অতি অল্পই দেখা যায়। এ মিলনটা সামাজিকতার উপর। এত অন্তরঙ্গভাবে মেশামেশি উভয় সমাজেরই মঙ্গলকর। যে দ্বেষাদ্বেষী আজকাল চলিতেছে তাহাতে ইহা অতি দুর্লভ দর্শন। এ প্রকার সম্মিলনে দোষের অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক।

পরদিন প্রাতেই "পঞ্চবটী" পাহাড়ে উঠিবার কথা স্থির হইল। রাত্রেই টাঙ্গাওয়ালাকে ডাকাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। যে কয় ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে সুখস্বপ্নেই রজনী ভোর হইল। সূর্য্য উঠিলেই, প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির ক্রোড়ে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিবে ইহা অপেক্ষা সুখের কল্পনা আর কি হইতে পারে?

পঞ্চবটী পাহাড়।

টাঙ্গাওয়ালা রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। আমরা সেই ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতকৃত্য সমাপন করিয়া লইলাম। আবশ্যকমত বস্ত্রাদি ও খাদ্য দ্রব্য লইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। প্রায় আট ক্রোশ রাস্তা চলাফেরা করিতে হইবে, কাজেই এত সতর্কতা—এত আয়োজন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ধীর প্রখর গতিতে নাচিতে নাচিতে অশ্বরাজ আমাদের বহিয়া লইয়া চলিল। শ্রীমান্ সুরেন্দ্রকুমার আমাদের পথপ্রদর্শক। ভবিষ্যৎ-দৃশ্যের সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা "মদনমহল" পাহাড় ছাড়াইয়া "পিস্‌নারি পাহাড়ে"র কোলে উপনীত হইলাম। সহর হইতে রাস্তাটী বরাবর পশ্চিমমুখে গড়া-গ্রামের মধ্য দিয়া মিরগঞ্জের পাশ দিয়া পাহাড়ে পৌঁছিয়াছে। আমরা কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত অকর্ষিত ক্ষেত্র ছাড়াইলাম। গাছের উপর নানাবিধ ফল ফুল, দুই পার্শ্বে ছায়ার ক্রোড়ে শাখাবহুল বিশাল বিটপীরাজি—তাহার উপর দলে দলে বানর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

সহর হইতে পাহাড়ে যাইবার দুইটী রাস্তা আছে। এক বরাবর টাঙ্গা করিয়া সরকারী সড়কের উপর দিয়া, অপরটী রেলযোগে "মিরগঞ্জ" ষ্টেশনে নামিয়া। আমরা প্রথমোক্তটীই পছন্দ করিলাম। প্রায় ৫।৭ মাইল আসিবার পর রাস্তা উচু নীচু বোধ হইতে লাগিল। আমা-দের বামদিকে গগনস্পর্শী শ্যামল তরুলতাচ্ছাদিত বড় বড় গ্রানিট-স্তূপপূর্ণ বিস্তৃত পাহাড় ও ডানদিকে জোয়ার, বজ্‌রা, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র। আট ঘটিকার সময় আমরা "পঞ্চবটী"র কাছে পৌঁছিলাম। এই সময়ে চড়াই, ও [illegible] বেশী বলিয়া বোধ হইল।

ক্রমশঃ গন্তব্য স্থানের যত নিকট যাইতে লাগিলাম ততই দেখা গেল—দুই দিকে পাহাড় ভেদ করিয়া সরকারী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য সরকার বহুব্যয়ে এই সড়ক নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শেষ আমরা নর্ম্মদার দূরশ্রুত স্রোতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কুল-কুল কুল! মরি কি মধুর ধ্বনি! পর্ব্বতবক্ষ প্রবাহিনী মন্থর-গতিশীলা স্থির-তরঙ্গময়ী প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদা যেন এ দীন সন্তানগণের স্নেহময় অভ্যর্থনার জন্য মৃদুধ্বনি করিতেছেন। গাড়ি আর চলিল না। কারণ পথ শেষ হইয়াছে। পথের প্রথম অবস্থায় তাহাকে অনন্তের দীর্ঘতা দিয়াছিলাম। এক্ষণে অনন্তকে সানন্ত হইতে দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতে হইল। যাই হ'ক আমরা রাজা গোকুল দাসের ধর্ম্মশালার নিম্ন দিয়া ক্রমশঃ নদীগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

কেবল বালুকারাশি! কেবল জলস্রোত! বিধৌত তরঙ্গভঙ্গ-প্রহৃত নানাবর্ণের উপলখণ্ড—উপলপূর্ণ নদীসৈকতে অবতরণকালে প্রতিপদে পদস্খলন হইতে লাগিল, কখনও বা জুতা ও মোজার মধ্যে রাশি রাশি বালি ঢুকিতে লাগিল, কখন বা পদদ্বয় বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইতে লাগিল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রতি পদক্ষেপে নূতন শক্তি, প্রতি আবর্ত্তনে নূতন উৎসাহ, প্রতি পদস্খলনে অদম্য দৃঢ়তা। আমাদের মনে তখন কেবল—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই"

এই কথা কয়েকটী জাগিয়া উঠিতে লাগিল। যে স্থানটীতে আমরা উপস্থিত হইলাম, তাহার অদূরেই নর্ম্মদাসঙ্গম। এক দিক দিয়া নর্ম্মদা বহিয়া যাইতেছে ও অপরদিকে "বানগঙ্গা" ও "সরস্বতী" নামক দুইটী নদী নর্ম্মদার সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল নর্ম্মদাক্ষেত্রে পবিত্র তীর্থ। প্রয়াগসঙ্গমের নিম্নেই ইহার স্থান। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে যখন নদীর জল

সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন এই পাহাড়ের সানুদেশে ক্ষুদ্র প্রান্তর মধ্যে এক বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময়ে যাত্রীদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরকারী খরচে এক অল্পদিনস্থায়ী প্রস্তর-সেতু নির্ম্মিত হয়।

বানগঙ্গা ও সরস্বতীর গর্ভ অনেক স্থলেই শুষ্ক দেখিলাম। কেবল স্রোত-বিতাড়িত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ও স্তূপাকার আর্দ্র বালুকায় নদীর গর্ভ পরিপূর্ণ। কোথাও বা ক্ষুদ্র গিরিনদীর স্বচ্ছসলিলময়ী জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র প্রবাহ। আমরা অঞ্জলি ভরিয়া সেই পবিত্র জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম।

এইবার "চড়াই"এর পালা। "উতরাই" এর মুখে বেশ হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে গমন করা হইয়াছিল। কিন্তু এবার পাহাড়ের উচ্চতা দেখিয়া আমাদের হৃদয় দমিয়া গেল। এটা কেবল অনভ্যাসের ফল। আমরা তিনজনেই সুবিধাজনক পথ খুঁজিতে লাগিলাম। একজন পাহাড়ী এই বিজন পর্ব্বতে আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল, সে অবশেষে আমাদের এক সহজগম্য পথে লইয়া গেল।

নদীগর্ভ হইতে ক্রমশঃ আ পরে উঠিতে লাগিলাম। কি আনন্দ! কি উৎসাহ! কে যেন সর্ব্বদাই কাণের কাছে গাইতেছে "আগে চল্ আগে চল্ ভাই"। এ গান, এ অমর কবির অমর গাথা শুনিয়া কি পিপাসু-হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রমের পর আমরা এক বিটপী-বহুল উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

নিম্নে বালুকা ও কঙ্করময় পথ। কোথাও বা তৃণ-বহুল—কোথাও বা তৃণ-বিরল। উপরে নীলাকাশে শুভ্র তুলারাশিবৎ মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ ধাবমান, চারিদিকে পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণের মধুর কূজন, আর দক্ষিণে পশ্চিমে চির-সমুন্নত গগনস্পর্শী পাহাড়শ্রেণী। নানাবিধ বনজ-ফুলে মধুর প্রভাতের মৃত-সঞ্জীবনী হিল্লোল লাগিয়া সুমধুর গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। আর গভীর নির্জ্জনতা আমাদের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ নৃত্য করিতেছে। খানিক দূর গিয়া সেই নির্জ্জন উপত্যকার মধ্যে আমরা একটী বিষয়ে বড়ই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। সেই নির্জ্জন স্থানে দুইটী সমাধি দেখিয়া আমাদের মনে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। মৃত্যুর চির-নির্জ্জনতার সঙ্গে এই পার্ব্বত্য-নির্জ্জনতা মিশিয়া এক কি অদ্ভুত বিভীষিকার সৃজন করিয়াছে! মৃত্যুর পর জীবনের অনন্ত গতির সহিত এই পাহাড়গুলির ও নীলাকাশের অনন্ত ভাব মিশ্রিত হইয়া এক অদ্ভুত কাহিনী প্রচার করিয়াছে।

সমাধিদ্বয় দুইটী ইউরোপীয় যুবকের! হতভাগারা ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণার হস্ত হইতে শোচনীয় পরিণামের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, এখানে চির-বিশ্রাম লাভ করিতেছে। একটী সমাধি পুরাতন—আর একটী অতি নূতন। সবেমাত্র দ্বিতীয়টীর উপর দিয়া একটী বৎসর ষড়ঋতু লইয়া একবার আবর্ত্তন করিয়াছে।

যদি জীবনের নশ্বরতা দেখিতে চাও এইখানে আসিয়া এই নির্জ্জন সমাধি দুইটীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যদি মৃত্যুর চির-নির্জ্জনতা, অনন্ত বিশ্রামের চির-পবিত্রতা দেখিতে চাও, এই

নির্জ্জন সমাধির প্রতি দৃষ্টিপাত কর! প্রকৃতির কোমল-ক্রোড়ে—প্রকৃতির প্রিয়-সন্তান কত আদরে ঘুমাইতে পারে যদি দেখিতে চাও, এই নির্জ্জন সমাধি দেখ! দুঃখময় শোচনীয় স্মৃতির পবিত্র গাথা যদি স্বচ্ছসলিলা, নির্ঝরিণীর কলতানের সহিত এক সুরে বাঁধিয়া শুনিতে চাও ত একবার এখানে আইস! যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু নশ্বর, যাহা কিছু শোকের, যাহা কিছু সুখের—এইখানেই তাহার পবিত্র প্রেম-মন্দির। প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রকৃতির সন্তানকে শোয়াইয়া তাহার উপর—তাহার স্নেহময় আত্মীয়ের সাদা, কাল, লাল, পীত, পাটল, ধূমল প্রভৃতি নানাবর্ণের উপলখণ্ড ধীরে ধীরে সাজাইয়া দিয়াছে। সেই উপলখণ্ডের শেষ শিয়রে মনুষ্যের হস্তখোদিত শোচনীয় কাহিনী! ইহাদের একটীতে লেখা আছে :—

"Here lies the remains of
Richard Bodington Esqr.
Who was attacked by bees
and drowned in the river
Nerbudda, near this spot.
On the 10th of May
1859. A. D.
Aged 29 years.
Erected by his Colleagues in memory of his
virtuous and manly character."

অদ্ভুত কাহিনী—অদ্ভুত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এক হতভাগ্য জীবনের শোচনীয় কাহিনী! এক সম্যক-অপরিস্ফুট জীবনমুকুলের খেদময় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস!

মৌমাছি-দ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যের অপমৃত্যু! বড়ই শোচনীয় কাহিনী! নর্ম্মদাতীরস্থ মর্ম্মর পাহাড়ে ও জঙ্গলের অন্যান্য স্থানে পাহাড়-গাত্রে অনেক মৌমাছির বাসস্থান আছে। ইহারা বড় বড় চাকের মধ্যে অবস্থান করে। আমাদের দেশে বড় ভিমরুলের চাক যত বড়, ইহার এক একটী চাক তাহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ। মৌমাছিগুলি বাঙ্গলা দেশের ক্ষুদ্রকায় শ্রেণীর নহে। দেখিতে বড় ও বেশী বিষাক্ত। ধূম ইহাদের পরমশত্রু। কোন প্রকার ধোঁয়া দেখিলেই ইহারা মহা উত্তেজিত হইয়া চাক হইতে বাহির হয়।

বোডিংটন সাহেবের সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত গল্পটী জব্বলপুরের কোন প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনিয়াছি। সাহেব জি, আই, পি, রেলপথের একজন এঞ্জিনিয়ার। পঞ্চবটী পাহাড়ের উপর শিকার করিতে গিয়াছিলেন। পাহাড়ে এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় জলবিহারী সুন্দরপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়—সাহেব ইহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতেছিলেন। সঙ্গীরা নিষেধ করিলেও তিনি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। যখন পর্ব্বতের চাক হইতে

মৌমাছির দল বন্দুকের ধূম দেখিয়া দলে দলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন নিরুপায় হইয়া সাহেব নর্ম্মদায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিলেন। নর্ম্মদার গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটিল।

আর একবার কাপ্তেন ফরসাইথ নামক একজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ এই প্রকার পাহাড়ী মধু-মক্ষিকার হস্তে পড়েন। সাহেব মান্দলা বিভাগের পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া যাত্রা করিতেছিলেন। পথে মৌছিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু ভয়ানক জ্বর হইয়া অনেক দিন ধরিয়া শয্যাগত থাকিতে হইল। সঙ্গে মোট বহিবার জন্য একটা পনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সঙ্গের লোকেরা যে যেখানে পারিল ছুটিয়া পলাইল। সাহেবের সঙ্গে একটী হস্তী ছিল, সেটাও আক্রান্ত হইয়া দিনকয়েক ধরিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিল।

এমন বিপদজনক মৌচাক ভাঙ্গিয়াও পাহাড়ীরা মধুর ব্যবসা করিতে ছাড়ে না। অন্ধকার রাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে দড়ির সিঁড়ি লাগাইয়া ইহারা চাকে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেয়। মৌমাছিগুলি উড়িয়া গেলে অগ্নি নিবাইয়া দিয়া চাক সংগ্রহ করে। এ প্রদেশের পাহাড়ীদের মধুর ব্যবসা একটী প্রধান জীবিকার মধ্যে গণ্য।

ইহার পর আর একটী ইংরাজের গোর। ইহারও নর্ম্মদায় পড়িয়া অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। সাহেব নাকি নর্ম্মদা প্রপাতে নামিতে গিয়া জীবন হারান। গোরের উপর লেখা আছে—

"2nd Battalion Scotts Rifle
Sacred to the memory of
No 2937—Private James Goudie
D. company.)
Who was drowned in the Nerbudda
on the 17th June 1894
aged 26 years
Erected by Officers."

যুবক গৌডির অপমৃত্যুতে ও এই শোচনীয় স্মরণচিহ্ন দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। শুনিতে পাই ইংরাজী দর্শকেরা ঐ নিভৃত কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উপত্যকা হইতে এক একটী উপলখণ্ড সাজাইয়া দেন। আমরাও সেই প্রথার অনুসরণে গুটিকত মসৃণ শ্বেত-মর্ম্মর সেই দুইটী গোরের উপর বিছাইয়া দিয়া 'ভৃগুক্ষেত্রে'র দিকে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে চলিল সেই নীরব শোকময় কাহিনীর অস্ফুট স্মৃতি। আগামী বারে "ভৃগুক্ষেত্রে" যাহা দেখিয়াছি তাহাই তোমায় বলিব।

কাহাকে ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যখন জ্ঞান হইল, দুইটি সোৎসুক নয়নের সস্নেহ দৃষ্টি নয়নে স্থাপিত দেখিলাম। বুঝিলাম আমার সেই মোহের অবস্থা—যে অবস্থায় আমি আত্মহারা হইয়া অতীতে বর্ত্তমানে মিশাইয়া ফেলি, বাল্যের স্মৃতিগঠিত যৌবনস্বপ্নে একে অন্য ভ্রম করি,—এ আমার সেই মোহের অবস্থা; তাই মিষ্টার জির নয়নে আমার বাল্যসখার স্নেহদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু তখনি সে ভ্রম ভাঙ্গিল; বুঝিলাম ইনি তিনি নহেন—ডাক্তার। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন—"Thank God, the danger is past, she is allright now."

দিদি আমার পাশেই বসিয়াছিলেন; তিনি এক চামচ ঔষধ আমার মুখের কাছে ধরিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—"মণি এইটুকু খেয়ে ফেল।"

আমি বলিলাম "আমার হয়েছে কি,—ওষুধ খাব কেন ?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"না কিছুই হয়নি—ওষুধ না—সরবৎ দেওয়া যাচ্ছে—খেয়ে ফেল দেখি,—I say B—জি একবার এখন দেখতে আসতে চায়; আসতে পারে কি ?"

ডাক্তার বলিলেন—"এখনো বোধ হয় কিছুক্ষণ disturb না করাই ভাল,—If she gets a little sound sleep the nervous system will recover its natural balance. এখন আমরাও যাই—আমারো আর এখানে থাকার আবশ্যক দেখিনে। আপনার স্ত্রী উঁহাকে এখন ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুন। যদি বলেন কাল একবার আমি বরঞ্চ দেখতে আসব—আসতে পারি কি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"নিশ্চয়ই। আজ আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়তে হোত—I don't know how to thank—"

আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহারা চলিয়া গেলেন।—এতক্ষণ যেন কি একটা অজ্ঞাত জলন্ত লৌহভার আমার হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়াছিল, সহসা অশ্রুস্রোতে গলিয়া বাহির হইয়া উঠিল, আমি দুইহাতে দিদির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া—তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"দিদি আমি কি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি ?" দিদি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মি মণি আর কথা ক'সনে—ডাক্তার ঘুম'তে বলেছে—চুপ করে থাক—এখনি ঘুম আসবে।"

আমি থামিলাম, কিন্তু অশ্রুধারা থামিল না; শত ধারায় উথলিয়া উঠিতে লাগিল, অথচ এ দুঃখ যে কেন—কেন যে কাঁদিতেছি তাহা কিছুই বুঝিলাম না; সুখ দুঃখ কিছুরই অনুভূতি আমার তখন ছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে—ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে, দিদির স্নেহাঙ্কের মধ্যে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটিল; অথচ

সুনিদ্রা নহে; ঘুমাইয়াও মনে হইতেছিল যেন জাগিয়া আছি—অথবা জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছি;—মাথার মধ্যে কত রকম দৃশ্য কত রকম ঘটনা ছায়াবাজির মত একটির পর একটি কেমন অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই যেন কে ছিল কে নাই, একজনের সহিত গল্প করিতেছিলাম—সে আর একজন হইয়া পড়িল,—কাহার বাড়ীতে যেন নিমন্ত্রণে যাইব—সাজ সজ্জা করিতেছি—কিছুতেই সজ্জা শেষ হইতেছে না;—বাড়ীর বাহির হইয়াছি গাড়ি খুঁজিতেছি—কিছুতেই খুঁজিয়া মিলিতেছে না; অবশেষে পায়ে চলিতেছি—পথ ফুরাইতেছে না; যদি বা পথ ফুরাইল কাহার বাড়ী যাইতে কাহার বাড়ীতে আসিয়াছি,—এই রকম সব হিজিহিজি স্বপ্ন;—শেষ স্বপ্নটি কেবল বেশ স্পষ্ট—এত স্পষ্ট—যে তাহা এখনো আমার জ্বলন্ত মনে আছে। স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহ দৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম; কিন্তু মনে হইল এ সে নহে; নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু নত করিলাম—তাঁহার চরণে দৃষ্টি পড়িল—অমনি হৃদয় আনন্দে মগ্ন হইয়া উঠিল—আমি আহ্লাদের আবেগে বলিয়া উঠিলাম—"এ সেই সেই!" ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বেশ আলো হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্নময় ঘুম সত্ত্বেও জাগিয়া অনেকটা সুস্থবোধ করিলাম!

মনে পড়িল,—ক্রমে সবই মনে পড়িল,—দুজনের এক একটি কথা আবার যেন নূতন করিয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলাম। চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম—আপনাকে আপনি ভিন্ন বলিয়া অনুভব করিলাম;—বুঝিলাম কাল যাহা ছিল—আজ আর তাহা নাই—কাল যে আমি ছিলাম—আজ আর সে আমি নহি। হৃদয়ে নৈরাশ্য বেদনা জাগিল; কিন্তু এ নৈরাশ্যে ঔপন্যাসিক করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি করিলাম না; কিম্বা, সে যেমনই হোক তবু আমার দেবতা—তবু তাহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল, কেবল তাহার উপর নহে; নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম—কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল এই যে, সে ভ্রান্তি হইতে আমি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুলনায় ডাক্তারের প্রতি খুব শ্রদ্ধা জন্মিল—তাঁহার করুণ সহৃদয় ভাবে পুরুষোচিত মহত্ত্ব দেখিতে লাগিলাম।

আমাকে সুস্থ দেখিয়া দুপরের পর দিদি অসুখের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"অনেক দিন তোর হিষ্টিরিয়া হয়নি,—ভেবেছিলুম একেবারে সেরে গেছে, আবার রাত জেগে নভেল পড়েছিলি বুঝি? তোর সঙ্গে যদি কিছুতে পারা যায়! আচ্ছা নিজের জন্য না হোক আমাদের কষ্ট মনে ক'রেও কি সাবধান হতে নেই।"

আমি বলিলাম—"কই অসাবধান ত আমি মোটেই হই নি—"

দিদি। "তবে অমনতর হঠাৎ হোল কেন? কাল যে ভাবনা গেছে—তা আর কহতব্য

নয়। হঠাৎ দরজার কাছে এসে দেখি—তুই পড়ে, আমি চেঁচিয়ে উঠতেই এঁরা ওঘর থেকে এসে পড়লেন, ভাগ্যিস ডাক্তার কাছে ছিল—তাই রক্ষে। (এইখানে তাঁহার নাম ধরিয়া বলিলেন) আহা সে বেচারার যে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল সে আর কি বলব—তাপর তোকে ত ঘরে উঠিয়ে আনা গেল, সে একবার দেখেও যেতে পারলে না, শুনলুম নাকি ভারী বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী গেছে।"

আমি বলিলাম—ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম—"বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী যেতে পারেন কিন্তু সে আমার অসুখের জন্যে নয়—নিজে ধরা পড়েছেন—সেই জন্যে। দিদি আমরা নিতান্তই ভুল বুঝেছি,—প্রতারিত হয়েছি"—বলিতে বলিতে নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল, অগ্নিময় ক্রোধাশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। দিদি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—

"তোর কথা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে—কাল কি তোকে ঐ ভাবের কথা কিছু বলেছে নাকি? কাঁদিস নে আবার অসুখ করতে পারে—স্থির হয়ে সব বল দেখি কি হয়েছে।"

স্থির হয়ে না পারি অস্থির ভাবেই সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। দিদি শুনিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন—"তবু ভাল এই ব্যাপার? আমার এমন ভয় হয়েছিল—যে না জানি কি!"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"না জানি কি! একজনের সঙ্গে বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়ে অন্য জনের সঙ্গে প্রেমের ভাণ—একি সামান্য ব্যাপার হোল?

দিদি। না ভাণ হতেই পারে না; তোকে যে সে ভালবাসে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ও বিলাতের কথা ছেড়ে দে। প্রথমতঃ কথাটা কতদূর সত্যি মিথ্যে তার ঠিক নেই। তাপর ধর যদি কারো সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েই থাকে, কিন্তু বিয়ে ত আর হয় নি—তা হলে আর এতই রাগের কারণ কি? সব দেশেইত এমন কত শত engagement গড়ছে আবার ভাঙ্গছে—এই সেদিন যে আমার মামাত দেওরের গায়ে হলুদ হয়েও বিয়ে ফিরলো—আর এ তো বাঙ্গালী ইংরাজের engagement, দুজনের স্বভাব দুজনের অবস্থার পার্থক্য একবার ভেবে দেখ দেখি, কোন একটা মোহের মুহূর্ত্তে দুজনে আজন্ম একত্ব শপথ করতে পারে,—কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই অনুতাপ করার কথা—বিয়ে করার যথার্থ উদ্দেশ্য যা পরস্পরের সুখ, এ বিয়েতে আমার ত মনে হয় তার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য। এ অবস্থায় আমিত বলি, কথা রাখার চেয়ে ভাঙ্গাই ভাল। নিজের আহাম্মকীতে" যেন নিজেকেই সে অসুখী করলে কিন্তু আর একজনের চিরজীবনের সুখাসুখও যখন—

আমি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শুনিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু তার সুখ-দুঃখ ভেবেই কি এ বিয়ে ভাঙ্গা হয়েছে? সে ভ্রান্তনারী সর্ব্বত্যাগী হয়ে এখনো পূর্ণ বিশ্বাসভরে তার পথ চেয়ে আছে, আর সে কি না গোপনে গোপনে আর একজনকে ভালবাসা জানাচ্ছে বিবাহ-প্রস্তাব করছে—এতে কি সে পুরুষের খুবই সাধুতা দেখতে পাচ্ছ; দিদি তুমি এমন প্রশান্তভাবে এ ঘটনা কি করে দেখছ আমি ত ভেবেই পাইনে।" দিদি বলিলেন "আমার ভিতরকার কথাটা কি জানিস, আমি অন্তর থেকে তাকে এতে দোষী বলে বিশ্বাস করতে

পারছিনে। বিলাতের মেয়েদের কুহক ত প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে নেহাৎ কোনরূপ একটা পাকে চক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই এর এমন একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে যে তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই মায়া করবে।”

আমি। তুমি বুঝি ভেবেছ এসব কথা আমি তার কাছে তুলতে যাব ?”

দিদি। তোর তুলতে হবে না সে নিজেই তুলবে সেজন্য ভাবনা নেই, না হয় আমরা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—তার সঙ্গে বুঝি আর এ কথা তোলা যায় না ?”

আমি। বিয়ে স্থির এখনো হয়নি, আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।”

দিদি বিস্ময়ে রাগে বলিলেন “তুই ক্ষেপেছিস নাকি, এই সামান্য কারণে বিয়ে বন্ধ হবে ; ওকথা মনেও আনিস্‌নে, তাহলে সমাজে কি কলঙ্কের সীমা থাকবে ; সে পুরুষমানুষ তার কি, তোর সঙ্গে না হলে এখনি অন্য আর একজন সেধে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।

আমি। নাইবা বিয়ে হল, আমি তার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।

দিদি ! তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখ তুই যে এমন করে নিজের চিরজীবনের সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছিস সেকি কোন একটা ন্যায়ের অনুরোধে ? আমি ত এতে অন্যায় ছাড়া ন্যায় দেখতে পাচ্ছিনে। তুই যেজন্য তাকে দোষী করছিস—এতে তোরও সেই ঠিক একই রকম অন্যায় করা হচ্ছে। যে তোকে প্রাণপণে ভালবাসছে, মিথ্যা কারণে তাকে তুই চিরঅসুখী করতে যাচ্ছিস ?

আমি। মিথ্যা কারণ !

দিদি। নিশ্চয় বলছি মিথ্যা কারণ। তার কাছে আসল ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবি—তার তেমন দোষ নেই। অন্ততঃ তার এতে কি বলার আছে সেটা শোন—শুনে তারপর যা হয় স্থির করিস, খুনী যে তারও বক্তব্য না শুনে বিচার হয় না ; আর তুই তারপক্ষে একটা কথা না শুনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিস, তোর দেখছি অত্যন্ত কঠিন হৃদয় !

আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম।—কি করিয়া আমার মনের ভাব তাঁহাকে বুঝাইব ; তিনি সাংসারিক চক্ষে এ ঘটনা দেখিতেছেন, তাঁহার অভিজ্ঞ হৃদয় বলিতেছে “সংসারে এরূপ ঘটিয়াই থাকে, দোষেগুণে মানুষ অতএব মানুষে দেবতা চাহিলে তোমাকে নিরাশা সার করিতে হইবে, তুমি শুধু দেখ সে নিতান্ত ঘৃণ্য দোষ করিয়াছে কি না ? যদি না করিয়া থাকে তবেই সে ক্ষমা পাইবার পাত্র।” আমার নবীন হৃদয়ের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় উচ্চতর আদর্শে ইহাতে কোন সান্ত্বনা নাই। আমার মনে—যে আমার ক্ষমার পাত্র সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে ; আমাতে স্বামীতে আমি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব। অন্যে শুনিলে ইহা বৃথা কল্পনা বলিয়া উপহাস করিবে—কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ হৃদয়ে

ইহা আকাশকুসুম নহে, প্রকৃত সত্য, কিন্তু এ সত্য আমি অন্যকে কি করিয়া বুঝাইব? কেবল তাহাই নহে, আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা কখনো তাহার সম্ভাবনা আছে আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়,—পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতি কে করিবে? আমি কি করিয়া বুঝাইব যে আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি—বিবাহ করিতে পারি—তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু তাহা ভ্রমক্রমে; মোহভঙ্গে পরিত্যক্ত বিসর্জ্জিত ভগ্ন অঙ্গহীন মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে হৃদয়ের শোভা হইবে না। জীবন পর্য্যন্ত তাহাতে বিকৃত বিরূপ হইয়া পড়িবে—রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে? তাই নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দিদি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া নিজেই সে কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"ডাক্তার আমাকে যা বলেছিল—তুমি তা শুনেছিলে—না?" এই প্রথম আমাকে তিনি 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কালিকার বিবাহ প্রস্তাবের পর আর আপনি বলিয়া সম্ভাষণ বোধ করি তাঁহার সঙ্গত মনে হইল না। অথবা এইরূপ সম্বোধনে এখন অধিকার জন্মিয়াছে বিবেচনা করিলেন। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম—শুনিয়াছি। তিনি তখন বলিলেন "তুমি ভেবে নিয়েছ কি একটা, I am so sorry,—গুরুতর ব্যাপার কিন্তু আসলে তেমন কিছুই নয়—সামান্য flirtation মাত্র, বিলাতে ত এমন সারাদিনই হয়ে থাকে—"

আমি ক্রোধ চাপিয়া সহজ গম্ভীরভাবে বলিলাম—"কিন্তু ডাক্তারের কথায় ত উল্টোই মনে হ'ল।"

"Oh! the meddling fellow——He is a puritanic hypocrite of the first water! অন্যের সম্বন্ধে একটা কথা পেলে হয়—তিলকে তাল করে তোলে।"

আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম একজন পরিত্যক্ত অসহায় রমণীর পক্ষ গ্রহণ করে যে সে হিপক্রিট, তবে যে বিশ্বস্তহৃদয় রমণীকে ফাঁকি দেয় তাহাকে অভিধানে কি নামে সম্বোধন করে—বোধ করি Honorable man!

কথাটা বোধ করি অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, বলিয়াই যদিও আমি অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর বলিলেন—"আমি ফাঁকি দিই নাই, যদি বিবাহ করিতাম তাহলেই বরঞ্চ ফাঁকি দেওয়া হইত। কেননা আমি তাহাকে কোন জন্মেই ভালবাসিতে পারিতাম না।

"তবে engaged হইলেন কেন?"

"ঠিক engaged হই নাই তবে তবে—একটা ভুল বোঝা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে আমার দোষ নয়, বলিতে ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তুমি যখন এতদূর শুনিয়াছ, না বলিলেও উপায় নাই।"

বলা বাহুল্য তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে সেই ইংরাজ ললনারই উপর বর্ত্তমান সমাজ প্রথায় দোষ অধিক পৌঁছায়। সেই তাঁহাকে প্রথমে অনুরাগ দেখাইয়াছিল—তাঁহাকে তাহাদের বাড়ীতে ক্রমাগত যাইতে বলিত, না গেলে দুঃখ করিত, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিত ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন পুরুষের পক্ষে এরূপ আহ্বান উপেক্ষা করা নিতান্ত অসৌজন্য কাজ, তিনি তাই এইরূপে তাহার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, অবশেষে যখন বুঝিলেন তাহার প্রত্যাশা বড় অধিক সে বিবাহ আশা করে, তখন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার কথার এই সারমর্ম্ম। জানিনা এই বিবরণে অন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল—তাহাও নহে।

আমি বলিলাম "কিন্তু আপনি তাহাকে ভুল বুঝিতে দিলেন কেন; আপনার পক্ষে যাহা flirtation তাহার পক্ষে তাহা জীবন্ত অনুরাগ, আপনার খেলা তাহার মৃত্যু, এরূপস্থলে বিবাহই আপনার উচিত কার্য্য।"

"তুমি কি মনে কর—দৈবাৎ একটা অন্যায় করিয়াছি বলিয়া সেই অন্যায়কে চিরস্থায়ী করাই কর্ত্তব্য?—আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি, কেবল আমার কষ্ট নহে—আমার ভাই, বোন, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের চিরকষ্ট, দেশের সহিত আজন্ম বিচ্ছেদ; এবং এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট বহন করিব যাহার জন্য তাহারো চিরকষ্ট, কেননা তাহার প্রতি আমার এমন ভালবাসা নাই যাহাতে তাহাকে সুখী করিতে পারি—এ অবস্থায় তুমি কি আমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতে?"

কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হইল, বলিলাম—"কিন্তু তবে সে কেন এখনো বিবাহের প্রত্যাশা করিতেছে—অন্ততঃ তাহাকে পরিষ্কার করিয়া মনের ভাব জানাইয়া মুক্তি লওয়া উচিত ছিল।"

"আমি ত মনে করিয়াছিলাম যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব জানিতে দেওয়া হইয়াছে, তবে এখনো যদি ভুলভ্রান্তি থাকে আমার বিবাহের খবর পাইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

কথাটা বড় খারাপ লাগিল, বাস্তবিক সে যদি ইঁহাকে ভালবাসে—আর বিবাহের আশা করে তাহা হইলে এই খবরে তাহার কিরূপ হৃদয়দাহ হইবে, তাহার ভালবাসা আমার

আগে, তাহার অধিকার আমার আগে, আমি কোন্ প্রাণে তাহার এরূপ যন্ত্রণার কারণ হইব—! আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম "আপনি ন্যায় অন্যায় কি করিয়াছেন জানি না, তাহার বিচারক ভগবান—আমরা নহি, তবে যে রমণী আপনাকে এতদূর ভালবাসে তাহার সুখের পথে আমি কাঁটা হইব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।" তিনি যেন বজ্রাহত হইয়া খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, আমার কাছ হইতে এরূপ কথা শুনিবেন—ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। কিছু পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ছলনার অভিযোগ দিতেছ, আমি আর যাহাকেই ছলনা করিয়া থাকি—তোমাকে করি নাই—কিন্তু তুমি আমাকে ছলনা করিয়াছ, তুমি আমাকে না ভালবাসিয়াও ভালবাস এইরূপ বুঝিতে দিয়াছ! যদি সত্য সত্য আমাকে ভালবাসিতে, তাহা হইলে কখনই এই সামান্য অপরাধে বিবাহ ভাঙ্গিতে চাহিতে না, আমার অবস্থা বুঝিয়া বরঞ্চ মমতা করিতে—Oh my God—have I lived to hear this !"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম,—যখন দিদি আসিলেন তখন তাঁহার সহিত দু একটা কথা কহিবার পর তিনি বলিলেন "আজ রাত্রেই একটা মোকদ্দমায় মফঃস্বলে যাইতে হইতেছে, হয়ত ঘণ্টাখানেক থাকিতে হইবে—আশা করি চিঠিপত্র পাইব" তাহার পর বিদায় গ্রহণ কালে আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বলিলেন, অতি ব্যথিতকরুণ কণ্ঠে বলিলেন "কি আর বলিব my life and death are in your hands—এই বুঝিয়া বিবাহ ভাঙ্গিবার কথা মনে করিও।"

ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হলওয়েল যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্ধকূপহত্যাকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, এত কথা কখনই একেবারে মিথ্যা কথা হইতে পারে না! কিন্তু হলওয়েলের সত্যনিষ্ঠা কতদূর প্রবল তাহার পরিচয় পাইলে, তাঁহার কথায় আর আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে হলওয়েল অন্ধকূপহত্যার প্রধান প্রচারক, সেই হলওয়েলই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবার সময়ে ঢাকার হত্যাকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"নবাব মীর-

জাফর খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা আর কি বলিব? তিনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নওয়াজেস-মহিষী ঘসেটি বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গকে ঢাকার রাজকারাগারে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করাইয়াছেন!"* উত্তরকালে কলিকাতার ইংরাজ-দরবার অর্থাৎ হলওয়েলের স্বদেশীয় সহযোগীগণ এই হত্যাকাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, হলওয়েলের হত্যাকাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা।† যিনি মীরজাফরের পদচ্যুতি সমর্থন করিবার জন্য এমন মিথ্যা হত্যাকাহিনী রচনা করিয়া স্বজাতিসমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনিই অন্ধকূপহত্যাকাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন! তাহাও যে এইরূপ সর্ব্বৈব মিথ্যাকাহিনী নহে, তাহার প্রমাণ কি?

হলওয়েল আপন ব্যয়ে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কেন; সেই পবিত্র সমাধিস্তম্ভ ইংরাজেরাই স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মমতাবোধ করেন নাই কেন, এ সকল কথার রহস্য নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হলওয়েলের হত্যা-কাহিনী রচনা করিবার বাহাদুরী বুঝিতে পারিয়া সেকালের ইংরাজদরবারের সদস্যগণ কি অন্ধকূপহত্যাকাহিনীর সত্যতাবিষয়েও সন্দিহান হন নাই; এবং তাহাই কি উত্তরকালে অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভবিলোপের সহায়তা করে নাই?

সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্টবিড়ম্বনা! ঘসেটি বেগম সিরাজদ্দৌলার জননীর সহিত সসম্ভ্রমে রাজান্তঃপুরে বসতি করিলেন, পলাসীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফরের সুশাসনে ঢাকায় কারারুদ্ধ হইলেন, মীরজাফরের দেহাবসানের পরেও সশরীরে জীবিত রহিলেন, অথচ ইতিহাসে তাহার সমুচিত সমালোচনা না হওয়ায় কল্পনাকুশল বাঙ্গালী কবি অবলীলাক্রমে সিরাজশিবিরে ঘসেটি বেগমের প্রেতাত্মাকে উপনীত করিয়া তাঁহার মুখে সিরাজদ্দৌলাকে শুনাইয়া দিলেন:—

"সিরাজ, তোমার আমি পিতৃব্য-কামিনী;
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্।"‡

এই কবি-কাহিনীর ভিত্তিমূল কোথায়? অথচ এই সকল কাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া কত করতালি আকর্ষণ করিতেছে, সিরাজ-চরিত্র কত ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে!

---

* Long's selections from the Records of the Govt. of India, vol. I.

† In justice to the memory of the late Nabob Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell in his address to the proprietors of East India Stock (page 46) are cruel aspersions on the character of that prince, *which have not the least foundation in truth.* Letter to Court, 30 September, 1766 supplement.

‡ পলাসির যুদ্ধকাব্য—তৃতীয় সর্গ; দ্বিতীয় স্বপ্ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইংরাজের সর্ব্বনাশ!

ইংরাজবণিকের দর্প চূর্ণ করাই সিরাজদ্দৌলার একমাত্র অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবামাত্র, তিনি আর অধিকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি ২রা জুলাই সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—মহারাজ মাণিকচাঁদ তিন সহস্র সিপাহী সাহায্যে কলিকাতার শাসনভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ রাজশক্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না;—তাহার নাম পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।*

পথশ্রম দূর করিবার জন্য হুগলীতে বিচিত্র পটমণ্ডপ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। সেখানে আসিতে না আসিতে, অভ্যর্থনার সমারোহে জলস্থল টলমল করিয়া উঠিল। সেকালের বাদশাহ বা নবাবেরা যেখানে ছাউনী ফেলিতেন, সেই স্থান বহুজনাকীর্ণ রাজনগর হইয়া উঠিত। চারিদিকে যথাযোগ্য দূরস্থানে পাত্রমিত্র ও সামন্তবর্গের পট্টাবাস, তাহার বাহিরে চক্রাকারে সেনানিবাসের সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ, তাহার পার্শ্বদেশে অগণিত বিপণিশ্রেণী;—কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুরচিত কনকপদ্মবিভূষিত নবাবের গর্ব্বোন্নত পটমণ্ডপ;—সেই হস্ত্যশ্বপদাতিসেনা, সেই প্রহরগণনানিপুণ প্রহরীদল, সেই সর্ব্বজনভৈরব মোগলবিভবের সমুজ্জল চিত্রপট শ্মশানভূমিকেও নন্দনশোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত! দ্বারে দ্বারে দৌবারিকদল করালকৃপাণস্কন্ধে নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া বেড়াইত, প্রভাতে সায়াহ্নে রাজবৈতালিকগণের তানলয়সংযুক্ত সুমধুর যন্ত্রসংগীত বায়ুভরে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া চলিত। তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথ সময়েও প্রদীপ্ত প্রদীপালোকে চারিদিক ঝলমল করিত!

হুগলীর পটমণ্ডপে সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। সে দরবারে ওলন্দাজ ও ফরাসিবণিক্গণ গললগ্নীকৃতবাসে আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য সসম্ভ্রমে উপঢৌকনহস্তে উপনীত হইলেন। ওলন্দাজেরা ৪॥ লক্ষ এবং ফরাসিরা ৩॥ লক্ষ টাকা 'নজর' প্রদান করিলেন। অতঃপর ইংরাজদিগের কথা উত্থাপিত হইল। তাঁহাদিগকে একেবারে দেশ-বহিষ্কৃত করা যে সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় নহে, সে কথা বুঝাইয়া দিয়া তিনি ওয়াটস্ এবং কলেট সাহেবকে মুক্তিদান করিলেন, এবং হলওয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মীরমদন ইতিপূর্ব্বেই নবাবের অজ্ঞাতসারে হলওয়েল এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে বন্দীবেশে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং আপাততঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইতে পারিল না। যাঁহারা পল্‌তায় পলায়ন করিবার অবসর না পাইয়া ইতস্ততঃ লুকাইয়া রহিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজ সওদাগরেরা যদি কেবল মাত্র সওদাগরি করিবার

---

* নবাবের আদেশে কলিকাতার নাম হইল "আলিনগর"! এখন "আলিপুরে" তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

জন্য কলিকাতায় বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা অনায়াসে নগরপ্রবেশ করিতে পারিবেন;—এইরূপ সাধারণ রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া সিরাজদ্দৌলা হুগলী হইতে ছাউনী উঠাইয়া পুনরায় রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।* পলায়নপরায়ণ ইংরাজগণ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংরাজবন্ধু উমাচরণের বদান্যতাগুণে অন্নজল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা সমুচিত সমারোহে ১১ই জুলাই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিজয়োৎসবের আনন্দকোলাহলে, নাগরিকদিগের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীতে, মঙ্গলবাদ্যের মধুর নিক্বণে, ঘন ঘন কামানগর্জ্জনের গুরুগম্ভীর রবে এবং নবাব-সেনার সগর্ব্ব আস্ফালনভরে মুরশিদাবাদ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! সেই আনন্দকোলাহলের মধ্যে রত্নচতুর্দ্দোলারোহণে পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধীশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন নগরপ্রদক্ষিণ করিয়া বেগমমহলীতে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হলওয়েলের কারাকক্ষ তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সহসা বাদ্যোদ্যম নীরব হইয়া গেল, দোলারোহণ পরিত্যাগ করিয়া সিরাজ-দ্দৌলা স্বয়ং পদব্রজে কারাগারদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, পার্শ্বস্থ চোপদারকে দিয়া তৎক্ষণাৎ হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগের শৃঙ্খলমোচন করাইয়া, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, পুনরায় দোলারোহণ করিলেন।†

ইংরাজদিগের পক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আর কোনরূপ প্রতিবন্ধক রহিল না। পূর্ব্বকাহিনী বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ধীরে ধীরে কলিকাতায় শুভাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বভাবদোষে অতি অল্পদিনের মধ্যেই "জন বুলের" সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! একজন মদিরাসক্ত সার্জ্জন সাহেব একদিন একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিয়া বসিলেন। একালে এরূপ ঘটনায়,—আকস্মিক দুর্ঘটনা বলিয়া,—ইংরাজমাত্রেই বিনাদণ্ডে বা যৎসামান্য দণ্ডে পরিত্রাণলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; সেকালে মুসলমান রাজদরবারে ইহাতে হুলস্থুল উপস্থিত হইল। রাজা মাণিকচাঁদের আদেশে একের অপরাধে ইংরাজমাত্রেই কলিকাতা হইতে তাড়িত হইলেন।‡ ইংরাজের কপাল ভাঙ্গিল; তাঁহাদের জন্য আর কলিকাতায় স্থান হইল না; কেবল হেষ্টিংস প্রভৃতি কয়েকজন কুঠিয়াল কাশিমবাজারে বসিয়া রহিলেন, তদ্ভিন্ন আর আর ইংরাজেরা,—যে যেখানে ছিলেন,—সকলেই আসিয়া পলতার বন্দরে সমবেত হইতে লাগিলেন!

---

* Two or three days before his departure, he published leave to such as had escaped the dungeon to return to their houses in the town, where they were supplied with provisions by Omichand, whose intercession had probably procured their return. —Orme, vol. II. 80.

† He ordered a Suttaburdar and Chopdar immediately to see our irons cut off, and to conduct us wherever we chose to go; and to take care that we received no trouble nor insult.—Holwell.

‡ Orme, vol. II. 80.

এতদিনের পর ইংরাজের প্রবল প্রতাপ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল; কাশিমবাজার গেল; কলিকাতা গেল; কলিকাতার ইংরাজদুর্গের উপর রাজা মাণিকচাঁদের বিজয়পতাকা সগৌরবে আকাশে অঙ্গবিস্তার করিল;—ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া পল্‌তার পলায়িত জাহাজে সম্মিলিত হইতে লাগিল।

সকলই ফুরাইল! তথাপি এ সকল শোচনীয় কাহিনী সহসা মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারের কর্ণগোচর হইতে পারিল না! তাঁহারা সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া ১৫ জুলাই তারিখে কাশিমবাজার অবরোধের প্রথম সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তেমন বিচলিত হইবার কারণ ছিল না;—বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রায় মধ্যে মধ্যেই সেরূপ সংবাদ আসিত; আবার হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই শুনা যাইত যে, "গোলযোগ মিটমাট হইয়া গিয়াছে; সময়োচিত উপঢৌকন দিয়া সকলকেই শান্ত করিয়াছি; বাণিজ্য-ব্যবসায় একরূপ ভালই চলিতেছে!" * সুতরাং কাশিমবাজারের সংবাদ পাইয়াও, মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কেবল কলিকাতার সেনাবল বৃদ্ধি করিবার জন্য মেজর কিলপ্যাট্রিকের সঙ্গে ২৪০ জনমাত্র গোরা পল্টন পাঠাইয়া দিয়া, দ্বিতীয় সংবাদের অপেক্ষায় কথঞ্চিত নিশ্চিন্তমনেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৫ই আগষ্ট তারিখে রণপলায়িত ম্যানিংহাম সাহেব মাদ্রাজের বন্দরে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার মুখে মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কলিকাতার কথা, সিরাজদ্দৌলার কথা, ইংরাজের সর্ব্বনাশের কথা;—এক সঙ্গে সকল কথাই শুনিতে পাইলেন! সে সংবাদে মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! সকলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন;—"হায়! হায়! কি হইল? এতদিনের এত আশা,—সকল আশাই এক ফুৎকারে নির্ম্মূল হইয়া গেল!" †

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস চলিয়া গেল। তখন লোক ডাকাইয়া, সভা বসাইয়া, যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রবল বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বীর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিবার উত্তেজনা করিতে লাগিলেন;—কিন্তু তখন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষীণবল, ফরাসি-সমর-শঙ্কায় নিরন্তর চিন্তাক্লিষ্ট, তাহাতে সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির হইয়া উঠিল না!

এদিকে মেজর সাহেব ভাগীরথী-মুখে প্রবেশ করিয়াই পল্‌তার বন্দরে আসিয়া পলায়িত ইংরাজ-জাহাজের সন্ধান পাইলেন! তিনি আর ২৪০ জন গোরা লইয়া একাকী কি করিবেন? সকলকে যথাশক্তি আশা ভরসায় উৎসাহিত করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পল্‌তার বন্দরেই জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ফেলিলেন! পলায়িত ইংরাজগণ তখন পর্য্যন্তও জীবিত,—কিন্তু সকলেই একরূপ জীবন্মৃত! অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, যাঁহারা সুস্থ সবল, তাঁহা-

* Thornton's History of British Empire, vol I. 197

† On the 5th of August news arrived of the fall of Calcutta, which scarcely created more horror and resentment than consternation and perplexity.—Orme, vol II.

রাও ভগ্নহৃদয়ে মলিনমুখে সতৃষ্ণনয়নে অকূল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কতদিনে মাদ্রাজ হইতে সেনাদল আসিবে—কেবল সেই চিন্তায় শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন!

দুর্দ্দশার দিনে দুর্ম্মতি আসিয়া ইংরাজদিগের দুঃখদৈন্য দ্বিগুণ করিয়া তুলিল! কেন তাঁহাদের এরূপ শোচনীয় দুর্গতি উপস্থিত হইল,—সেই কথা লইয়া তুমুল গৃহকলহ উপস্থিত হইল! নব্যতন্ত্রের ইংরাজ-যুবকেরা ইংরাজ-দরবারের উপরেই সকল অপরাধ আরোপ করিতে লাগিলেন! যাঁহারা দরবারের সদস্য, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরকে অপরাধী করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না! এই সূত্রে ইংরাজদিগের মধ্যে দিবানিশি বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল; কথায় কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল; সর্ব্বপ্রকার সমবেদনা দূরীভূত হইয়া গেল; অবশেষে অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে,—"যাঁহারা উৎকোচ-লোভে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং যাহাকে তাহাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কোম্পানীর নামাঙ্কিত পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারাই সকল অনর্থের মূল!" * এই গৃহকলহ উপলক্ষে ইংরাজদিগের ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকগণ অনেক যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এ সকল কথা নিতান্তই অমূলক! এতকালের পর সে সকল অভিযোগের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজ-দরবারের সদস্যদিগের ব্যবহারগুণেই নবাব সিরাজদ্দৌলা এতদূর উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিব,—না, পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকদিগের কথাই অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইব? ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি বলেন,—"যুবকদলের অভিযোগে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন। বৃদ্ধদিগকে পাকেচক্রে পদচ্যুত করিবার জন্যই যুবকদল এই সকল অমূলক অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন!" † কাহার কথা সত্য, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই; অথচ সিরাজদ্দৌলাই যে সকল অপরাধে অপরাধী, তাহা চিরদিনের মত মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

পল্‌তায় পলায়ন করিয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা হইল;—কিন্তু ইংরাজদিগের দুর্দ্দশার আর অবধি রহিল না! একে নিদারুণ গ্রীষ্মকাল, তাহাতে একেবারে নিরাশ্রয়;—একে রোগক্লিষ্ট, তাহাতে আবার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান;—একে সকলেই মর্ম্মপীড়িত, তাহাতে আবার প্রতিদিনই খাদ্যাভাব! জাহাজের ভাণ্ডার শূন্য; তহবিলে তঙ্কার অনটন; নিকটে হাট বাজারের অসদ্ভাব;—ইচ্ছা থাকিলেও মাণিকচাঁদের ভয়ে দোকানী পশারী জাহাজের কাছে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না! আর কিছুদিন এরূপ দুর্দ্দশার প্রতিকার না হইলে, সকলকেই একে একে ভাগীরথী-গর্ভে জীর্ণ-কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে হইত! মাণিকচাঁদের

* Orme, vol II. 82-83.
† Orme, vol. II. 81

ভয়ে সকলেই জড়সড় ;—কেবল ফরাসী আর ওলন্দাজ আর ইংরাজের বিপদের বন্ধু কৃষ্ণকায় 'নেটিভ' (বাঙ্গালী) বণিকেরা গোপনে গোপনে যাহা কিছু অন্নজল পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতেই কোনরূপে কায়ক্লেশে ইংরাজের দিনপাত হইতে লাগিল! *

চতুর লোকে একবার একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলেই যথেষ্ট হয়। তাহার পর সে আপন কৌশলে সহজেই বসিবার স্থান করিয়া লইতে পারে। ইংরাজদিগেরও তাহাই হইল। যদি সিরাজদ্দৌলা পল্‌তা পর্য্যন্ত সসৈন্যে শুভাগমন করিতেন, তবে হয়ত সকলেই চোরের মত পলায়ন করিবার পথ পাইতেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ তাড়াইবার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়া, কেবলমাত্র উদ্ধত-ব্যবহারের শাস্তি দিয়াই নিরস্ত হইলেন। ইহাতেই ইংরাজেরা পল্‌তায় পলায়ন করিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করাই সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় ছিল ;—কেবল দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই তিনি ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই! † এ কথা একেবারে মিথ্যা কথা। সিরাজদ্দৌলার মনে সেরূপ কল্পনা উদিত হইলে ইংরাজ তাড়াইতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব ঘটিত না, এবং হেষ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ প্রভৃতি ইংরাজ কুঠিয়ালগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে অক্ষতশরীরে কাশিমবাজারে অবস্থান করিবার অবসর পাইতেন না!

ইংরাজেরা শতবর্ষ বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন ; ইংরাজেরা জঙ্গল কাটিয়া কলিকাতায় বিচিত্র ইন্দ্রপুরী রচনা করিয়াছেন ; ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রখাত খনন করাইয়া কত লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়া দিয়াছেন ;—সুতরাং আত্মীয়তাসূত্রেই হউক, আর চিরকৃতজ্ঞ বাঙ্গালীজাতির স্বভাবসুলভ পরোপকার প্রবৃত্তির জন্যই হউক, এ দেশের অনেক গণ্যমান্য লোকে ইংরাজের দুঃখদুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে উমাচরণ ইংরাজবন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্দগুণে সর্ব্বস্বান্ত, মর্ম্মপীড়িত, শোকগ্রস্ত পথের ফকির সাজিয়াছিলেন, তিনিও দুর্দ্দশার দিনে সাশ্রুনয়নে নবাবদরবারে ইংরাজের হইয়া কত কাকুতি মিনতি জানাইতে লাগিলেন! হেষ্টিংস এবং ডাক্তার ফোর্থ সাহেব কাশিমবাজারে বসিয়া গোপনে গোপনে মন্ত্রীদলের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন ; যে সকল আরমানী বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে গতিবিধি করিতেন, তাঁহারাও ইংরাজদিগকে রাজধানীর গুপ্তসংবাদ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এই সকল চেষ্টায়

---

* The remains of our unfortunate colony were now lying on board a few defenceless ships at Fulta, the most unwholesome spot in the country, about twenty miles below Calcutta, and destitute of the common necessaries of life : but, by the assistance of the French, and the Dutch, to whose humanity they were much indebted on this occasion, and partly by the assistance of the *natives*, who both from interest and attachment, privately supplied them with all kinds of provisions, they supported the horror of their situation till August."—Ive's Journal.

† Orme vol. II. 79.

কালক্রমে ইংরাজের দুঃখ দুর্দশার অবসান হইবার সদুপায় হইতে লাগিল।* দেশের লোকে বুঝিতে পারিল যে, আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ইংরাজেরা আবার এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য নবাবের সনন্দলাভ করিবেন, সুতরাং দেশের লোকের আনুগত্য দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল।

মেজর সাহেব পল্‌তায় আসিয়া এই সকল শুভলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আশা হইল, সাহস হইল ;—সময় পাইয়া মাণিকচাঁদকে হস্তগত করিবার আয়োজন হইল ; এবং নবাবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিনীতভাবে আবেদনপত্র লিখিত হইতে লাগিল! রাজা মাণিকচাঁদ ইতিহাসে চতুর-চূড়ামণি বলিয়া সুপরিচিত। নবাব-দরবারের স্রোত কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সে স্রোত আবার ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনিও ইংরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপনের জন্য অসম্মত হইলেন না। ইংরাজেরা নবাবের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই পত্রে অন্ধকূপহত্যার জন্য কোন প্রকার আর্ত্তনাদ করা হইল না ; আবার যাহাতে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কথাই বিবিধবিধানে বিবৃত হইল। যতদিন সনন্দ না আসিতেছে, ততদিন অন্ততঃ অন্নাভাবে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা হইল। ওলন্দাজদিগের গভর্ণর বিস্‌ডম্‌ সাহেবের যোগে এই আবেদনপত্র নবাবদরবারে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

ভরসা পাইয়া ইংরাজ কুঠিয়ালগণ জাহাজের উপরেই মন্ত্রীসভার বৈঠক বসাইতে আরম্ভ করিলেন। সে বৈঠকে 'অনরেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত রোজার ড্রেক" সাহেব বাহাদুর সভাপতি, এবং ওয়াট্‌স্‌, হলওয়েল ও মেজর কিলপ্যাট্রিক সদস্যের আসন গ্রহণ করিলেন।†

২২শে আগষ্টের বৈঠকে, সভাপতি মহাশয় সকলকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে,—আর ভয় নাই ; মাদ্রাজ হইতে শীঘ্রই গোরাপল্টন আসিতেছে ; কিন্তু সেই দিনই সংবাদ আসিল যে, ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের আবেদনপত্রখানি নবাবদরবারে পাঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন পত্রখানি কিরূপে নবাবের নিকট প্রেরিত হইতে পারে, তাহার জন্য পরামর্শ চলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন কলিকাতা অঞ্চল হইতে খোজা পিক্রু এবং এব্রাহিম জেকব্‌স্‌ নামক দুইজন আরমানী বণিক পল্‌তায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ-হিতৈষী উমাচরণের নিকট হইতে একখানি গুপ্তলিপি আনিয়াছিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইল। হায়! উমাচরণ ;—সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "চিরদিনও যেমন, এখনও সেইরূপ ভাবে তিনি ইংরাজের কল্যাণকামনায়

* Long's selections from the Records of the Government of India.

† এই বৈঠকের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যবিবরণী Long's selections from the Records of the Government of India নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর ইংরাজেরা যদি রাজা রাজবল্লভ, রাজা মাণিকচাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা বাজিদ প্রভৃতি পাত্রমিত্রের সঙ্গে গোপনে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে চান, তিনি তাহাও যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সদুত্তর আনাইয়া দিবেন।* ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যে ইংরাজেরা এবং যে হলওয়েল সাহেব উমাচরণকে নিতান্ত কুটিলহৃদয় পরমপাষণ্ড অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ বলিয়া পৃথিবীর নিকট পরিচিত করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিপদের দিনে সেই উমাচরণকে ততদূর অবিশ্বাস করেন নাই! ইংরাজেরা সময় পাইয়া উমাচরণের সঙ্গে জাল জুয়াচুরি করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু পদে পদে বিড়ম্বিত হইয়াও সেই উমাচরণ আজীবন ইংরাজের কল্যাণকামনায় সহস্র বিপদেও ইংরাজদিগকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ করেন নাই। ইতিহাসে এ সকল কথার যথাযোগ্য সমালোচনা হয় নাই বলিয়া, বাঙ্গালী কবি লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"——যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ ফণা আস্ফালিয়া।"†

উমাচরণের সহায়তাগুণে রাজা মাণিকচাঁদ সহজেই বশীভূত হইলেন। একদিন যে মাণিকচাঁদ ইংরাজ-দলনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রৌষধিগুণে সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে স্বয়ং মাণিকচাঁদের পত্র ইংরাজ-দরবারে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। সে পত্রে ইংরাজ আবার সাহস পাইলেন; রাজা মাণিকচাঁদ যে যথাশক্তি ইংরাজের সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাইতে বিলম্ব হইল না;—পল্‌তায় বাজার বসিল, ইংরাজের অন্নকষ্ট দূর হইয়া গেল।‡

রাজা মাণিকচাঁদ এত সহজে ইংরাজের বশীভূত হইলেন কেন, ইতিহাসে সে রহস্য মীমাংসিত হয় নাই। মাণিকচাঁদ যেরূপ চরিত্রের লোক, বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে চিরদিন ক্ষিপ্রহস্ত। সিরাজ যখন সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, জগৎশেঠ এবং খোজা বাজিদ কৃতাঞ্জলি হইয়াও যখন সিরাজদ্দৌলাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই, মাণিকচাঁদ তখন নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার আশায় সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইংরাজদলনে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতা জয় করা হইল, কলিকাতার নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল, কলিকাতার সৌধধবল ইন্দ্রপুরী হইতে ইংরাজ গৃহতাড়িত হইল;—মাণিকচাঁদ বুঝিলেন যে, আর বিনাযুদ্ধে "আলিনগরে" ইংরা-

---

* Consultation on board the Phœnix Schooner, Fulta, August 22, 1756.

† পলাসির যুদ্ধকাব্য।

‡ The same day there came another letter to the Major by Coja Petross and Abraham Jacobs from Raja Manik Chand of the 2nd. inst. at Allinagore (Calcutta) with many compliments and the strongest assurance of his assistance. He sent at the same time a boat with a *dustick* with orders for the opening a bazar and for the supplying us with provisions of all kinds.—Consultations, 5 September, 1756.

জের পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু মাণিকচাঁদ জানিতেন যে, বিপদে পড়িয়া বৃটীশসিংহ কিছুদিনের জন্য লাঙ্গুল প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেও, অবসর পাইবামাত্র আবার বীরদর্পে কলিকাতার উপর হুঙ্কার করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, এবং সে আক্রমণে মাণিকচাঁদেরই সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি সেই জন্য মূলাজোড়ে এক নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদি সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে আবার বাতাস ফিরিয়া গেল! সিরাজদ্দৌলার মতি গতি শান্তভাব অবলম্বন করিল; ইংরাজদিগের পুনরাগমনের আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহাদের করুণক্রন্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মাণিকচাঁদের নিকট বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। উমাচরণ অনুরোধ জানাইবামাত্র মাণিকচাঁদ ইংরাজদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন!

নবাব-দরবারে ইংরাজদিগের কাতর নিবেদনে শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন সময়ে কাশিমবাজার হইতে সহসা সম্বাদ আসিল যে,—"মুরশিদাবাদে বড়ই গোলযোগ! বাদশাহ পুর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গকেই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তদনুসারে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, অনেকেই তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন। আর সে সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার প্রবল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে;—তাঁহার রত্ন-সিংহাসন যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।*

এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরাজদিগের পূর্ব্বসংকল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—আর কেন? সময় থাকিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। ইংরাজ-দরবার তাহাই করিলেন। তাঁহারা শওকতজঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার জন্য এবং সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য "নজর" পাঠাইয়া পত্র লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। †

সিরাজদ্দৌলা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না; তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ কাকুতি মিনতি চলিতে লাগিল। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও এই রাজবিদ্রোহীতার সন্ধান পাইতেন, তবে হয়ত পল্‌তার বন্দর ইংরাজের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিত না।

এদিকে মাদ্রাজনিবাসী ইংরাজগণ দুইমাসের মধ্যেও তর্কবিতর্ক শেষ করিতে পারিলেন না। ইংরাজের ফৌজ অপ্রচুর; চিরশত্রু ফরাসী হয়ত শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে;—এমন সময়ে মাদ্রাজ হইতে পল্টন পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে বিষয়ে বিষম মতভেদ

* Mr. Warren Hastings writes from Cossimbazar that great preparations were there making for a war with Shocut Jung, the Nabob of Pyrnea, who has had the Nabobship of Bengal, Bahar and Orissa conferred upon him by the king of Dily.—Consultations, 5 September 1756.

† The Board agreed to send a letter in Persian to the Pyrnea Nabob with presents, hoping he might defeat Sirajed Dowla.—Consultations, 15 September, 1756.

উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল,—অবশেষে স্থির হইল যে, অন্যান্য প্রদেশের ভাগ্যে যাহা হয় হউক, সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার উদ্ধারসাধন করাই কর্ত্তব্য। এই সময়ে বিখ্যাত ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব মান্দ্রাজ-দরবারের সদস্য ছিলেন, তিনি এইসকল তর্কযুদ্ধের সবিস্তার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।* কলিকাতার উদ্ধারসাধন করা স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সেনাপতি করা হইবে, তাহা সহজে স্থির হইল না।

পিগট সাহেব মান্দ্রাজের গভর্ণর। পদগৌরবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সেনানায়কদিগের মধ্যে কর্ণেল অল্‌ডারক্রন্ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের যুদ্ধকলহে তাঁহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই। কর্ণেল লরেন্সের যোগ্যতা আছে, অভিজ্ঞতাও আছে,—সকল বিষয়েই তিনি পরিপক্ক। কিন্তু তিনি হাঁপানী রোগে জর্জ্জরিত,—বাঙ্গলার জলবায়ু তাঁহার ধাতুতে সহ্য হইবে না। এইরূপে যখন একে একে সকল সেনাপতি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন, তখন কর্ণেল ক্লাইবের উপর অগত্যা এই ভার ন্যস্ত হইল। যাঁহারা ক্লাইবের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিলেন যে ইংরাজভাগ্যে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল!

কর্ণেল ক্লাইবের নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে তাঁহার গর্ব্বোন্নত বীরপ্রকৃতি যে সুবৃহৎ চিত্রপট বিরাজিত রহিয়াছে, † তাহার প্রত্যেক তুলিকাসম্পাতে আজিও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক তীব্রতেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। কত সুলেখক তাঁহার বীরকীর্ত্তির বর্ণনা করিয়া সাহিত্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কর্ণেল ক্লাইব 'আজন্মসৈনিক,'—এত সাহস, এত বীরদর্প, এত প্রত্যুৎপন্নমতি একাধারে আর কাহারও জীবনে বিকশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

মান্দ্রাজ-দরবার স্থির করিয়া দিলেন যে, সেনাপতি ক্লাইব কলিকাতার ইংরাজদরবারের আজ্ঞাবহ হইবেন না; স্বাধীনভাবে সকলকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সসৈন্যে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বরের নৌসেনাপতি আড্‌মিরাল ওয়াটসন্‌কেও সেই সঙ্গে প্রেরণ করা স্থির হইয়া গেল।

ভারতভাগ্যবিধাতা মহাবীর ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ পাঁচখানি রণপোত লইয়া ১৬ই অক্টোবর মান্দ্রাজের উপকূল ছাড়িয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কোম্পানী বাহাদুরের পাঁচখানি জলযান মালপত্র বহিয়া চলিল। ৯০০ গোরাপল্টনের সঙ্গে ১৫০০ কালা সিপাহী সগর্ব্বে বঙ্গোপসাগর বিকম্পিত করিয়া বৃটীশের রণবাদ্যনিনাদে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে জাহাজে পদার্পণ করিল। জাহাজ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল;—যতদূর দৃষ্টি চলিল, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া ইংরাজ নর নারী রুমাল উড়াইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

একজন বাঙ্গালী-কবি শ্রুতিসুমধুর সংস্কৃত কবিতায় নব্যভারতের ইতিহাস সংকলন করিয়া

* Orme, vol. II. 84-89.

† Calcutta—its highways and by-paths.

গিয়াছেন। * তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্যের প্রাধর্য্য রক্ষার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"অনুকূলোঽভবদ্বায়ুঃ প্রয়াণে ক্লাইবস্য হি।" কিন্তু প্রভঞ্জন অনুকূল হইতে পারিলেন না; বায়ুবেগে জাহাজগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। আড্‌মিরাল পোকক ২৫০ গোরা লইয়া 'কম্বরল্যাণ্ড' নামক সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন; এবং 'মার্‌ল্‌বরা' নামক আর একখানি কোম্পানীর জাহাজে অধিকাংশ গুলিগোলা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল; এই দুইখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় জাহাজ যে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহার আর সন্ধান মিলিল না! অবশিষ্ট জাহাজগুলি অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া অবশেষে বলেশ্বরের বন্দরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

সিরাজ না শওকতজঙ্গ,—কাহাকে চাও?

ইংরাজদিগের যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, তাহাতে এদেশের লোকের ধারণা ছিল যে, ইংরাজদমন করা বোধ হয় মানুষের সাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্যে বৃটীশ "বেয়নেটে" ফরাসী সেনা উপর্য্যুপরি পরাজিত হইতেছিল; সে সংবাদে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহুবলে সেই অজেয় মহাশক্তিকে মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া মহাসমারোহে রাজধানী প্রত্যাগমন করায় দেশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল;—যাঁহারা আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য দরিদ্রের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না, সেই সকল পাত্রমিত্রদল বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ আশা শওকতজঙ্গ;—কিন্তু অতঃপর তিনিও যে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং সিরাজদ্দৌলা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলার কপালে নিরুদ্বেগ হইবার অবসর ঘটিল না। একমাসকালও নির্ব্বিবাদে কাটিল না। পূর্ণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ সসৈন্যে মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন;—এইরূপ জনরব আবার দেশরাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। গুপ্তচরসহায়ে সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, এই জনরব অলীক জনরব নহে। দিল্লীর বাদশাহ দীর্ঘকাল রাজকর না পাইয়া অবশেষে মন্ত্রীদলের মন্ত্রণাক্রমে শাহজাদাকেই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন;—তদনুসারে শাহজাদা সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা ও শওকতজঙ্গ যুগপৎ রাজধানী আক্রমণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলে শাহজাদার নামে শওকতজঙ্গ রাজ্যশাসন করিবেন। সিরাজ নীরবে এই রণসমাচার লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না;—তিনিও সিংহাসন রক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

---

* লঘুভারতম্।

সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে তাঁহার মন্ত্রীদলের চক্রান্তবলেই এই অভিনব অভিযানের সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিয়া শওকতজঙ্গকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া দিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা যে কিরূপ স্বদেশহিতৈষী পরিণামদর্শী বীরপুরুষ, সিরাজদ্দৌলা তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। শওকতজঙ্গ কুক্রিয়াসক্ত তরুণযুবক, তাঁহার মন্ত্রীদল স্বার্থলুব্ধ চাটুকার মাত্র,—তাঁহাকে পরাজয় করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু শাহজাদা যদি শওকতজঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন, তবে সে সম্মিলিত শক্তি পরাজয় করা বড়ই অসাধ্য হইয়া উঠিবে। যদিও দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি বাদশাহের নামের ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি সর্ব্বথা বিলুপ্ত হইয়াছিল না। সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে, সেই বাদশাহের নামের দোহাই দিয়া বাদশাহজাদা সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হইলে এ দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই মুহূর্ত্তমধ্যে বাদশাহের পক্ষে চলিয়া পড়িবে, সিরাজকে হয়ত বিনাযুদ্ধে তাঁহার আত্মপক্ষীয় পাত্রমিত্রেরাই বাদশাহের নিকট বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং তিনি আর কালক্ষয় না করিয়া শাহজাদার শুভাগমনের পূর্ব্বেই পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনে কৃতসংকল্প হইলেন।

শওকতজঙ্গ রাজবিদ্রোহী। তথাপি শওকতজঙ্গ পরমাত্মীয়। আলিবর্দ্দীর বংশধর বলিয়া তিনিও লোকসমাজে সবিশেষ সুপরিচিত। সুতরাং সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পাত্রমিত্রগণ নানারূপ চক্রান্ত করিয়া সিরাজদ্দৌলার মনোরথ পূর্ণ করিবার অবসর প্রদান করিবেন না। সিরাজ সেইজন্য এক কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

পূর্ণিয়া প্রদেশে বীরনগরে একজন ফৌজদার থাকিত। সেই পদ শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া সিরাজদ্দৌলা রাসবিহারী নামক একজন অনুগত ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া শওকতজঙ্গের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।* সিরাজ যাহা চাহেন, তাহাই হইল। শওকতজঙ্গ পত্রপাঠ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমি বাদশাহী সনন্দ পাইয়া বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আমার নিতান্ত পরমাত্মীয়। তোমার প্রাণবধ করিতে ইচ্ছা নাই। যদি প্রাণ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন নির্জ্জন পল্লীতে পলায়ন করিতে চাও, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না। বরং তুমি অন্নবস্ত্রে কষ্ট না পাও, তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছি। আর বিলম্ব করিও না;—পত্রপাঠ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন কর। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের কপর্দ্দকেও হস্তক্ষেপ করিও না। যত শীঘ্র পার প্রত্যুত্তর পাঠাইও। সময় নাই। অশ্ব সুসজ্জিত। আমিও রেকাবদলে পা তুলিয়া দিয়াছি। কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব।" †

সিরাজদ্দৌলা যথাকালে এই উদ্ধতলিপি নবাব-দরবারের পাত্রমিত্রদিগের কর্ণগোচর

* Stewart's History of Bengal.
† Stewart's History of Bengal.

করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, অতঃপর কেহ আর যুদ্ধযাত্রাকালে বাধা প্রদান করিবে না, এবং রাজবিদ্রোহী শওকতজঙ্গের সপক্ষ হইয়া বাদানুবাদ করিতে সাহস পাইবে না। কিন্তু কথা উঠিতে না উঠিতেই প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। মন্ত্রীদল বুঝিলেন যে, শাহজাদা শুভাগমন করিতে এখনও অনেক বিলম্ব; তিনি সশরীরে শুভাগমন না করিলে প্রকাশ্যে শওকতজঙ্গের পক্ষাবলম্বন করা বিড়ম্বনামাত্র;—ইহার মধ্যেই যদি সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধযাত্রা করেন, তবে শওকতজঙ্গের সকল চক্রান্তই চূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে সিরাজদ্দৌলাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। জগৎশেঠ মুখপাত্র হইয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"দিল্লীশ্বরই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার স্বামী; সুবাদার তাঁহার সনন্দবলে শাসনভার পরিচালন করেন। সিরাজদ্দৌলার সনন্দ নাই; শওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কে রাজা কে প্রজা তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।" সিরাজ বুঝিলেন যে চক্রান্ত বড়ই কুটিলপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন; কেহ কেহ এরূপও রটনা করিতে লাগিলেন যে, নবাব ক্রোধকম্পিতকলেবরে জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, তাহাতেই সভাভঙ্গ হইয়া গেল।* বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলার আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ রহিল না;—তিনি বাহুবলে পূর্ণিয়া আক্রমণের জন্য সসৈন্যে ধাবিত হইলেন।

শাহজাদা শুভাগমন করিবার পূর্ব্বে পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে হইলে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করা আবশ্যক;—উত্তরে হিমালয়, সে পথে আক্রমণ করাও অসম্ভব, পলায়ন করাও অসম্ভব। সিরাজদ্দৌলা তিনদিক হইতে তিনদল সেনাসহায়ে পূর্ণিয়া আক্রমণ করাই স্থির করিলেন; কিন্তু বিশ্বস্ত রণকুশল তিনজন সেনাপতি কোথায়? জগৎশেঠকে করারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করায় মীরজাফর সর্ব্বসমক্ষে অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আর সিরাজদ্দৌলার জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন না। বিদ্রোহের স্পষ্ট সূচনায় সিরাজদ্দৌলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগৎশেঠকে কারামুক্ত করিতে হইল, মীরজাফরকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতে হইল, এবং রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতা প্রদেশে রাখিয়া অন্যান্য দলবল লইয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিতে হইল। একদল স্বয়ং নবাবের সঙ্গে রাজমহলের পথে ধাবিত হইল, এই দলে মীরজাফরকে সেনাপতি করিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিলেন। একদল রাজা রামনারায়ণের আজ্ঞায় পাটনা হইতে পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিয়া শাহজাদার গতিরোধের আদেশ প্রাপ্ত হইল, আর একদল মহারাজা মোহনলালের আজ্ঞায় জলঙ্গী বহিয়া, পদ্মা উত্তীর্ণ হইয়া, সরদহ হইতে রাণী ভবানীর রাজ্যের ভিতর দিয়া স্থলপথে পূর্ণিয়া আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত হইল।†

শওকতজঙ্গ ইন্দ্রিয়াসক্ত গর্ব্বোন্মত্ত অকর্ম্মণ্য তরুণ যুবক। তিনি কাহারও পরামর্শে

---

* ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই কথা রটনা করিয়া গিয়াছেন;—ইহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

† Stewart's History of Bengal.

কর্ণপাত না করিয়া নিজেই সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া নবাবগঞ্জ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। জীবনে একদিনের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই, ধূমপুঞ্জে আকাশ অন্ধকার করিয়া কামানমুখে মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ হইলে, কোথায় কেমন করিয়া সেনাসমাবেশ করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অথচ প্রবীণ সেনানায়কগণ কোন বিষয়ে পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলে শওকতজঙ্গ স্পষ্টই বলিয়া উঠেন যে,—তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়াছেন। শওকতজঙ্গ প্রভু,—সেনানায়কগণ পদানত ভৃত্য। তাঁহারা আর কি করিবেন? সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া পটমণ্ডপে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

তথাপি শওকতজঙ্গের প্রবীণ সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষে অনুকূল স্থানেই যুদ্ধভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প সেনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখীন হইবার পক্ষে সেরূপ যুদ্ধভূমি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্মুখে বহুক্রোশবিস্তৃত জলাভূমি, তাহার উপর দিয়া শত্রুদলের গোলন্দাজ বা অশ্বারোহীদিগের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই;—সেই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার উপযোগী একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ, তাহার মুখে অল্প কয়েকশত সেনা সমাবেশ করিলেই শত্রুসেনা ব্যূহভেদ করিতে পারিবে না। এমন অনুকূল স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াও শওকতজঙ্গ বুদ্ধির দোষে ব্যূহ রচনা করিতে পারিলেন না। তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনা-সমাবেশ করিয়াছেন,—সুতরাং তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবে কে? তিনি দুই দুই ক্রোশ ব্যবধানে এক এক সেনাপতির পটমণ্ডপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

শওকতজঙ্গ যখন মহাসমারোহে যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখন মোহনলালের সেনাদলের সঙ্গে মীরজাফরের সেনাদল মিলিত হইয়া মার মার শব্দে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কেহই তাহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা ক্রমে জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া মোহনলালের সেনাদল গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ গোলাই অর্দ্ধপথে পঙ্কসলিলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। যে দুই একটি গোলা কচিৎ শওকতজঙ্গের সেনানিবাসে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শওকতজঙ্গ বাহাদুর হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! সেনাদল ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, অবসর পাইয়া মোহনলাল ক্রমেই সেই সঙ্কীর্ণ পথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন,—এমন সময়ে একজন প্রবীণ আফগান সেনাপতি শওকতজঙ্গের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন;—জাঁহাপনা! এ কিরূপ সমর-কৌশল? আমরা দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মোল্কের অধীনে অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছি; কিন্তু এমন যুদ্ধ ত কখনও দেখি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে; যে যেদিকে পারিতেছে সে সেইপথেই পলায়ন করিতেছে! এমন করিয়া কতক্ষণ শত্রুসেনার গতিরোধ করিবেন? গোলন্দাজদিগকে সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী রাখিয়া যথাশাস্ত্র যুদ্ধব্যাপারে অগ্রসর হউন।"

শওকতজঙ্গের তরুণহৃদয়ে এই উপদেশবাক্য তীব্র তীরের মত বিঁধিয়া পড়িল। তিনি স্ফুরিতাধরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ;—"যাও! যাও! আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আসিও না। নিজাম-উল-মোল্‌ক গাধা! তাই সে তোমাদের কথা শুনিয়া সেনাচালনা করিত। আমি এই বয়সে এমন তিনশত যুদ্ধ বুঝিলাম, আজ কিনা তুমি আমাকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছ!" আফগান সেনাপতি সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামক একজন হিন্দু সেনাপতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আর শওকতজঙ্গের আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। যে সকল পদাতিসেনা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার কামান চালনার প্রতিবন্ধক হইতেছিল, তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া শ্যামসুন্দর কামান লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামসুন্দর একজন প্রভুভক্ত মসিজীবী হিন্দু ;—যুদ্ধব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। শত্রুসেনার আগমনসংবাদে তিনি লেখনী ত্যাগ করিয়া গোলন্দাজদলের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত শ্যামসুন্দর এরূপ বীরপ্রতাপে অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, রণপণ্ডিত মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধপথে অশ্বরশ্মি সুসংযত করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামসুন্দরের কামান ভীমকলরবে ঘন ঘন অনলবর্ষণ করিয়া মোহনলালের সেনাপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া তুলিল।

শ্যামসুন্দরের বীরপ্রতাপে শওকতজঙ্গ এতই উত্তেজিত হইলেন যে, তিনি আর অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া অশ্বসেনাকেও অগ্রসর হইবার আদেশ প্রচার করিলেন। পুরাতন অশ্ব-সেনানায়কগণ নবাবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশ্বসেনা অগ্রসর হইলে একজনও প্রত্যাগমন করিবে না ; উভয়পক্ষের গোলাবর্ষণে মধ্যপথে পঞ্চত্বলাভ করিবে। শওকতজঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন ; "হিন্দু শ্যামসুন্দর কেমন বীরপ্রতাপে অগ্রসর হইতেছে,—সে মরিল না,—আর তোমরা মুসলমান বীরপুরুষ! তোমরাই মৃত্যুভয়ে জড়সড় হইয়াছ? বুঝিলাম তোমরা সকলেই কাপুরুষ।" সেনাপতিগণ সে ধিক্কার সহ্য করিতে পারিলেন না ; পলকমধ্যে দলে দলে অশ্বারোহণ করিয়া সমর-তরঙ্গের মধ্যে সগর্ব্বে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন! শওকতজঙ্গ ভাবিলেন যে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন ;—যেরূপ বীরপ্রতাপে অশ্বসেনা অগ্রসর হইল, তাহারা অপর পারে উত্তীর্ণ হইতেই যাহা কিছু বিলম্ব ;—নচেৎ যুদ্ধজয়ে আর সন্দেহ কি? তিনি তখন বিজয়োৎফুল্ল-হৃদয়ে পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পানপাত্র উঠাইয়া লইলেন। সারঙ্গী সারঙ্গ ধরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল ; তাহার সহচরীগণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া কটাক্ষে কুটিল সন্ধান পূরণ করিতে বিলম্ব করিল না ;—শওকতজঙ্গ সুরা ও সঙ্গীতমোহে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

এদিকে অশ্বসেনা জলাভূমি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবামাত্র পঙ্কসলিলে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিতে লাগিল। যুদ্ধ হইল না, কেবল অনবরত নরহত্যায় যুদ্ধভূমি রুধিররঞ্জিত হইতে লাগিল। এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় কে কতক্ষণ মৃত্যু-

কামনায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?—সেনাদল একে একে পশ্চাদপদ হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ ভাবিলেন যে এই সময়ে শওকতজঙ্গ সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয়ত সেনাদলের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহারা তাড়াতাড়ি নবাবের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। নবাব তখন সংজ্ঞাশূন্য, উষ্ণীষ খসিয়া পড়িতেছে, অসি কক্ষচ্যুত হইয়াছে, হস্তপদ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে, পটমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া নূপুর কঙ্কণ রুণুঝুণু বাজিয়া উঠিতেছে। তথাপি সেনাপতিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না;—তাঁহারা ধরাধরি করিয়া শওকতজঙ্গকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইলেন এবং সেইরূপভাবেই তাঁহাকে রণভূমে আনয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেনাদলের সাহস হইবে কি, তাঁহার দৃষ্টান্তে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। শত্রু-শিবির হইতে মুহুর্মুহুঃ লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে, সাহসী সুচতুর প্রভুভক্ত ফৌজদারী ফৌজ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড পীড়নে ধরাশায়ী হইতেছে। সেনাপতিগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাবকে চেতন করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন;—কিন্তু হায়! শওকতজঙ্গ তখন একেবারে সংজ্ঞাশূন্য; কেবল চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে "বহুত আচ্ছা বিবিজান" বলিয়া সংগীতের তালরক্ষা করিতেছেন।

হায়! সিরাজদ্দৌলা! এই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া তোমাকে রসাতলে দিবার জন্য যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহারাই আজ ইতিহাসের নিকট সম্মানাস্পদ;—আর তুমি তাহাদের রাজা আশ্রয়দাতা প্রতিপালক হইয়াও শতকলঙ্কে কলঙ্কিত!

শওকতজঙ্গকে বহুক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। অব্যর্থ-সন্ধাননিপুণ সিরাজ-সৈনিকের গুলি আসিয়া তীরবেগে তাঁহার ললাট ভেদ করিল; শওকতজঙ্গের সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল!

পূর্ণিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। মহারাজ মোহনলাল তাহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে রাজপদ মন্ত্রীপদ বিতরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সিরাজ রাজকোষ হস্তগত করিয়া শওকত-জননীকে সসম্ভ্রমে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন; সেখানে সিরাজ-জননীর সহিত শওকত-জননী অন্তঃপুরে স্থানলাভ করিলেন।

অবসান।

মিলনান্তে।

আমি যে তাহার পানে চাহিয়া থাকি না
নিমেষবিহীন হয়ে আপনা ভুলিয়া,
পাগল না হই শুনে তার কণ্ঠবীণা,
পরশ-আবেশে আঁখি আসেনা ঢুলিয়া,
সে কি হায় ভালবাসা শুকায়েছে বলে,
লুকায়েছে ইন্দ্রজাল তাই অবসাদ ?
না গো না, অনেক দিন এ হৃদয়তলে
বহেছে সুখ-লহরী, আসেনি বিষাদ,
বহুক্ষণ বদ্ধ আছি মিলন-পিঞ্জরে ;
তার হাসি, তার কথা, মোহন চাহনি
তীব্র মদিরার মত দিবস রজনী
করি' পান, আছি ভোর উন্মাদনা জরে।
বুকে সে আছে কি ভূমে, বুঝিতে পারিনা ;
সহসা যদি সে চুমে, তবু শিহরি না।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিরহান্তে।

বিরহবৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদমন্ত্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গ পানে
ছুটিয়া গেল না উর্দ্ধে উদ্দাম পরাণে
বসন্তে মানসযাত্রী বলাকার মত ?
কেন তোর সর্ব্ব তন্ত্রী সবলে প্রহত
মিলিত ঝঙ্কার ভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্ত্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি ? হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ? তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশনিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন তার
সে দিনের মত ক'রে বাজেনাক আর ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অষ্টম অধ্যায়।

কলিকাতার পুনরুদ্ধার।

পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনের জন্য সিরাজদ্দৌলা কিছুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের কোন সন্ধান লইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে অনেকের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কলিকাতায় পুনরাগমনের পথ সহজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রগণ যখন সিরাজদ্দৌলাকে অনুনয় বিনয় করিয়া সেই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। সকলেই শুনিল যে, ইংরাজেরা শীঘ্রই কলিকাতায় পুনরাগমনের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইবেন।

সিরাজদ্দৌলার বাহুবল ছিল, বুদ্ধিকৌশল ছিল, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অদম্য হৃদয়বেগ ছিল। বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যে আব্দার ধরিয়া বসিতেন, কেহ তাহা ছাড়াইতে পারিত না; যুবক সিরাজদ্দৌলাও যখন যাহা করিতে চাহিতেন, কেহ তাহাতে বাধাপ্রদান করিতে পারিত না। পাত্রমিত্রগণের কুটিল ব্যবহারে তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন হৃদয় ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল; নিজে যাহা বুঝিতেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলেই সন্দেহ হইত যে, তাহার মধ্যে হয়ত কোন গুপ্তকল্পনা লুক্কায়িত আছে। লোকের ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে এইরূপে অনেক সন্দেহের বীজ নিক্ষিপ্ত হইলেও, স্বভাবসুলভ সরল বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, অথবা কোরাণ শপথ করিয়া পরম শত্রুও যাহা বলিত, তিনি অবলীলাক্রমে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন। এরূপ সরল বিশ্বাস না থাকিলে সুচতুর সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু সিরাজ-চরিত্রের যাহা সদ্গুণ তাহাই তাঁহার শত্রুদলের হাতে পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ সহজ করিয়া দিল। সকলেই বুঝাইলেন যে, ইংরাজবণিকের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, তাঁহারা আর অতঃপর উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দান করিবেন না, অতএব তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পুনরাগমন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হউক। সিরাজদ্দৌলাও বলিলেন—তথাস্তু! শওকতজঙ্গের পরাজয়ের পর আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্যই যে দশজনে মিলিয়া ইংরাজকে আবার এদেশে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—সময় থাকিতে সিরাজদ্দৌলা তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিবার অবসর পাইলেন না।

এ দিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ,—সকলেই সিরাজদ্দৌলার বাহুবলের ও শাসনকৌশলের পরিচয় পাইয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের উভয়সঙ্কট

উপস্থিত হইল। কার্য্যানুরোধে তাঁহারা সকলেই সিরাজদ্দৌলাকে চিনিয়াছিলেন; সিরাজও তাঁহাদের সকলকেই চিনিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওয়া অথবা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণা করা;—মন্ত্রীদলের পক্ষে উভয় পক্ষই তুল্যরূপ সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং ইংরাজদিগের আগমন-সংবাদে তাঁহারা সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া যাহাতে ইংরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘনীভূত হয়, তাহার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদিগের কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, সকলই চলিতে লাগিল; নবেম্বর মাসের শেষে মেজর কিলপ্যাট্রিক তাঁহাকে স্পষ্টই লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "জগৎশেঠই ইংরাজের একমাত্র ভরসাস্থল; সুতরাং ইংরাজেরা যে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছেন, এ বিষয়ে যেন শেঠজীর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে।" শেঠজীর আর সন্দেহ রহিল না;—তিনি কায়মনোবাক্যে ইংরাজদিগের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদেশে একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে,

"স্বকার্য্য সাধিতে খল তোষামোদ করে,
তাহে মুগ্ধ হয় যত বোধহীন নরে।"

শেঠজী সে পুরাতন প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যে ইংরাজেরা একবৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করিয়া জগৎশেঠের আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার প্রত্যাশায় গোপনে গোপনে বাদশাহের দরবারে অর্থবৃষ্টি করিতেছিলেন; তাঁহারাই যখন কার্য্যানুরোধে শেঠজীকে আকাশ হইতেও উচ্চস্থানে উঠাইতে লাগিলেন, তখন শেঠজী একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন! ভবিষ্যতের যবনিকা যে কি ভীষণ দৃশ্যপট আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া, গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া হতভাগ্য উমাচরণও কায়মনোবাক্যে ইংরাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। দিন যাইতে লাগিল;—কিন্তু দিন দিনই ইংরাজের আশালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুরচূড়ামণি মাণিকচাঁদ অতীব সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল যে, পূর্ণিয়ার যুদ্ধেই সিরাজের সর্ব্বনাশ হইবে;—যখন তাহা হইল না, তখন তিনি গোপনে গোপনে ইংরাজের সহায়তা করিয়া, বাহিরে কলিকাতা রক্ষার জন্য বাহাড়ম্বর দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না।*

পাদরী বেণ্ট্ একজন চুঁচুড়ার পাদরী সাহেব। তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ কলিকাতায় বাস করিবার উপলক্ষে তথাকার গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন।

---

* And yet Omichand and Manikchand were at this time in friendly correspondence with the English, they (negotiated at this time between the Nawab and the English) understanding how to run with the hare and keep with the hound.—Revd. Long.

তাঁহার পত্রে পল্‌তার ইংরাজেরা জানিতে পারিলেন যে, "মাণিকচাঁদ নদীর দিকে অনেক-গুলি তোপ সাজাইয়া আসর জমকাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকলই বাহ্যাড়ম্বর! দুর্গে দেড়হাজারের অধিক সিপাহী নাই। কামানগুলি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। টানার দুর্গে কেবল ২০০ সিপাহী আছে; হুগলীতে দুর্গমধ্যে ৫০ জন এবং বাহিরে ৫০০ জনের অধিক পল্টন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" *

উমাচরণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "লোকে নবাবের ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না; কিন্তু ইংরাজদিগের পুনরাগমনের জন্য খোজা বাজিদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সওদাগর-গণ একান্ত উৎসুক।" † হলওয়েল সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, "কলিকাতার দুর্গ একরূপ অরক্ষিত। তাহার চারিটি বুরুজই অকর্ম্মণ্য। কলিকাতার লোকে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাই-তেছে। তাহাদের বিশ্বাস যে নবাব-দরবার হইতে ইংরাজাগমনের অনুমতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কেহ আর কলিকাতা রক্ষায় মনোযোগ দিতেছে না। ‡ এই সকল সংবাদে পল্‌তার ইংরাজদল আশায় আনন্দে মান্দ্রাজের সেনাদলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ পুরাতন বন্ধু। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উভয় বন্ধু মিলিত হইয়া মালাবার উপকূলের এক লাভজনক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সুবর্ণদুর্গের বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধজাহাজের আড্ডা ছিল; অংগ্রীয়া নামক একজন মহারাষ্ট্র-বীর তাহার নৌসেনাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কালক্রমে মহারাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সমুদ্রবক্ষে যাহার তাহার অর্ণবপোত লুণ্ঠন করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে কি মহারাষ্ট্রীয়সেনা কি ইউরোপীয় বণিক, সকলেই সমানভাবে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া নিরুদ্বেগে সমুদ্রকূলে বসিয়া রহিয়াছেন; সেই সুযোগ পাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থবলে তাঁহাদের সহায়তা ক্রয় করিলেন; এবং সেই সমবেতশক্তি সুবর্ণদুর্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হিন্দুদিগের নৌসেনাবল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এই উপলক্ষে তাহা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ যথেষ্ট অর্থ লুণ্ঠনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মোট ১৫০০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। §

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সনের যুদ্ধজাহাজ যখন উড়িষ্যার উপকূলের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন মহাবীর ক্লাইব মহামতি ওয়াট্‌সন্‌কে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শের বিষয় আর কিছু নহে,—বাহুবলে বাঙ্গলাদেশ

---

* Long's selections from the Records of the Government of India, vol. I.

† Omichand writes from Chinsura that Coja Wazed and other merchants would be glad to see the English return, were it not for the fear of the Nabob.—Revd. Long.

‡ Ibid,

§ The enterprise succeeded and the prize-money amounted to £150000.—Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

লুণ্ঠন করিতে পারিলে কে কিরূপ ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারই কথা! ওয়াট্‌সন্ সুবর্ণদুর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাহিলেন; ক্লাইব তাহাতে সম্মত হইলেন না;—সে যাত্রা ক্লাইবের ভাগ কিছু কম হইয়াছিল! অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সে যাত্রায় যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে ভাগ হইবে,—সমান সমান! *

যাঁহারা ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌কে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কোনরূপে কলিকাতার বাণিজ্যাধিকার পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে বিনা-রক্তপাতে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাবের নিকট হইতে সিরাজদ্দৌলার নামে সুপারিশপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর সেই সকল আদেশ পালন করিবার জন্য যাঁহারা সসৈন্যে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিলেন, তাঁহারা সেনাসাহায্যে বঙ্গভূমি লুণ্ঠন করিয়া কে কত অর্থলাভ করিবেন, সেই চিন্তা লইয়াই বিভোর হইয়া রহিলেন! ইহাতে মীরজাফরের ভাগ্যবৃক্ষে কিরূপ সুধাফল ফলিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা এ সকল গুপ্তমন্ত্রণার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। মেজর কিলপ্যাট্রিক বা পল্‌তার ইংরাজদিগেরও তাহা জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ বাণিজ্যাধিকার লাভ করিবার জন্যই কাকুতি মিনতি জানাইতে লাগিলেন এবং সিরাজদ্দৌলাও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সকল গোলযোগের অবসান হয় হয়, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, ইংরাজবণিক অনেক গোলা বারুদ লইয়া মান্দ্রাজ হইতে পল্‌তার বন্দরে আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছেন! এই সংবাদ আসিতে না আসিতেই সেনাপতি ওয়াট্‌সনের নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজদূত উপনীত হইল।

ওয়াট্‌সনের পত্রখানি এইরূপ :—

FROM ON BOARD HIS BRITANICK MAJESTY'S SHIP KENT,
AT FULTA, THE 17*th December*, 1756.

"The King, my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet, to protect the East India Company's trade, rights and privileges. The advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects, are too apparent to need enumerating: how great was my surprise, therefore, to hear you had marched against the

* After they had been sometime at sea, a Council was held on board Admiral Watson's ship to settle the distribution of prize-money.—Clive.

said Company's factories, with a large army, and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money, and killed great numbers of the King my master's subjects.

"I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their former factories and houses, and hope to find you willing to restore them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered and by that means put an amicable end to the troubles and secure the friendship of my King, who is a lover of peace and delights to act in equity. What can I say more?"

নবম অধ্যায়।

কে শান্তিপ্রিয়,—মুসলমান সিরাজ, না খৃষ্টীয়ান ইংরাজ?

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ পল্‌তায় পদার্পণ করিয়াই বীরদর্পে কলিকাতা পুনরধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মনে মনে লঙ্কাভাগ করিয়া তাহার কাম্যধন লুণ্ঠন করিবার জন্যই এতদূর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, পল্‌তার ইংরাজেরা তাহার গুপ্ত সমাচার জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিতে নিতান্ত অসম্মত;—নবাব যখন বিনাযুদ্ধেই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আর অনর্থক নরহত্যায় লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন যে যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং সৈন্যক্ষয় হইবার অনিশ্চিত ফলাফল পরিহার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ধীরভাবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বিনাযুদ্ধে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিতে পারা যাইবে। ক্লাইব সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ত আর কলিকাতার রণপলায়িত কাপুরুষ ইংরাজ-দরবারের আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্গদেশে শুভাগমন করেন নাই? সুতরাং তাঁহারা কেহই ক্লাইবের গতিরোধ করিতে পারিলেন না; কলিকাতা আক্রমণ করাই স্থির হইয়া গেল! মহাবীর ক্লাইব তখন গর্ব্বোন্নত মস্তকে অনেক কটূকাটব্য প্রয়োগ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন, এবং সেই পত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য মাণিকচাঁদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলাবাহুল্য মাণিকচাঁদের সাহসে কুলাইল না; তিনি কিছুতেই সে উদ্ধতলিপি নবাবের নিকট প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন না। যথাসময়ে সেই

* Ive's Journal.

পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হইলে সন্ধির আশা, শান্তির আশা, ইংরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা,—সকল আশাই নির্ম্মূল হইত ; নবাবসেনা ভীমকলরবে কলিকাতাভিমুখে ধাবিত হইয়া ক্লাইবের সমরপিপাসা শান্ত করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিত না। পল্‌তার ইংরাজগণ সমর-বিরোধী ; তাঁহাদিগের সুহৃৎ মাণিকচাঁদও সমরবিরোধী ;—সুতরাং সে পত্র ক্লাইবের নিকট পড়িয়া রহিল।

ক্লাইব ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ময়দাপুরের ময়দানের নিকটে জাহাজ লাগাইয়া স্থলপথে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীতীরে বজ্‌বজ্‌ নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ওয়াট্‌সন্‌ জলপথে সেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন, এবং যদি কেহ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়নের আয়োজন করে, স্থলপথে ক্লাইব তাহাদের গা দূর করিতে ত্রুটি করিবেন না ;—এইরূপ সংকল্পেই যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হইল! কিন্তু যু উপক্রমেই গৃহকলহের সূত্রপাত হইল। স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে, কামান ট ার জন্য, বারুদ টানিবার জন্য, রসদ টানিবার জন্য, গোরু ঘোড়া মহিষের প্রয়োজন। কলিকাতার পলায়িত ইংরাজগণ এই সকল জীবজন্তু সংগ্রহ করিয়া না দিলে ক্লাইবের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই নবাবের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। ক্লাইব তাঁহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া স্বয়ং অধ্যবসায়বলে সমস্যাপূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন ;—দুইটিমাত্র কামান এবং একখানিমাত্র বারুদের গাড়ি সজ্জীভূত হইল ; পদাতিকগণ পর্য্যায়ক্রমে তাহা টানিয়া লইতে লাগিল। এইরূপ অসমসাহসে অকুতোভয়চিত্তে অপরাজিত উৎসাহে ক্লাইবের সেনাপ্রবাহ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ওয়াট্‌সন্‌ জলপথে ধীরে ধীরে উজান বহিয়া চলিতে লাগিলেন। *

ময়দাপুর হইতে বজ্‌বজিয়া আটক্রোশ। পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায়, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া সেই আটক্রোশ আসিতেই ইংরাজ-সেনা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। দুর্গটি নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন, তন্মধ্যে সিপাহীর সংখ্যাও যৎসামান্য ;—তথাপি ওয়াট্‌সন্‌ না আসিলে, একাকী ক্লাইব দুর্গাক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না। সকলেই পথশ্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রহরী পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সকলেই একে একে অনাবৃত ভূতলশয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ইংরাজেরা সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এই সংবাদে মাণিকচাঁদ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে, সন্ধিও হয় হয় হইয়াছে ;—সুতরাং তিনি মোটেই যুদ্ধকলহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি নবাবের লবণের মর্য্যাদা রক্ষার

---

* This arose from the continued apprehensions of the Council at Fulta, who, clinging to their first fear with more than martyr's steadfastness, did not venture to provide a single beast either of draught or burden, lest they should incur the Subahdar's resentment.—Thornton vol. I. 204.

জন্য লোক দেখাইবার মত বাহ্যাড়ম্বর করিতে হইল, মাণিকচাঁদ স্বয়ং সসৈন্যে বজ্‌বজিয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাণিকচাঁদ গোলাবর্ষণ করিয়া সুপ্তসিংহকে প্রবোধিত করিতে না করিতে উভয়দলে শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে পরীক্ষায় রাজা মাণিকচাঁদ বীরোচিত কর্ত্তব্যপালনের জন্য ব্যাকুল হইলেন না;—ইংরাজেরা দুই চারিটি গোলা ছাড়িতে না ছাড়িতেই মাণিকচাঁদ পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "মাণিকচাঁদের উষ্ণীষের নিকট দিয়া শন্ করিয়া বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, আর তিনি অমনি চম্পট।" * তিনি আর সে অঞ্চলে মুহূর্ত্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারিলেন না; বজ্‌বজ্ ছাড়িয়া, কলিকাতা ছাড়িয়া, একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিলেন! মাণিকচাঁদের পলায়নকাহিনী সবিশেষ বিস্ময়-পরিপূর্ণ;—ইতিহাস তাহার রহস্যনির্ণয় না করিয়া তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়াছে; কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মাণিকচাঁদের যে নূতন সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত কি ইহার কোনই সংস্রব ছিল না? †

ইহার পর আর যুদ্ধ করিতে হইল না। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ ২রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা-দুর্গের নিকটস্থ হইলে, দুর্গাধিকারী সিপাহাদল দুই চারিটি গোলা চালনা করিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল;—মহাবীর ক্লাইব সদর্পে কলিকাতার শূন্যদুর্গে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়া দিলেন।

দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইল, রণকোলাহল শান্তিলাভ করিল, কিন্তু ইংরাজসেনানায়কদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ উভয়েই চতুরচূড়ামণি;—চতুরে চতুরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। উভয়েই বুঝিলেন যে দুর্গ যাঁহার হস্তে থাকিবে, লুটের ধনে তাঁহারই আধিপত্য জন্মিবে। সুতরাং ওয়াট্‌সন্ দুর্গদখল করিবার জন্য কাপ্তান কূটকে এক পরোয়ানা প্রদান করিলেন। কাপ্তান কূট পরোয়ানা লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "ওয়াট্‌সনের অধিকার মানি না; আমি দুর্গাধিপতি,—যদি আজ্ঞাপালন করিতে ইতস্ততঃ কর, এখনই কারারুদ্ধ করিব!" কূট সাহেব কূটকৌশলে পরাস্ত হইয়া ওয়াট্‌সন্‌কে পরোয়ানা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ওয়াট্‌সন্ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন;—তিনি কাপ্তান স্পিককে পাঠাইয়া দিলেন; স্পিক আসিয়া ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার আজ্ঞায় দুর্গাধিকার করিয়াছ?" ক্লাইব বলিলেন যে তিনিই প্রধান সেনাপতি, সুতরাং দুর্গাধিকারে তাঁহারই একমাত্র ক্ষমতা,—ওয়াট্‌সনের কোন ক্ষমতা নাই। এই সংবাদে

---

* Ive's Journal.

† The Government (in 1763) agreed to entertain on the Company's pay the son of the deceased Manickchand, who was useful to them in various ways during the preceding 30 years though he led the Nawab's troops against the English at the battle of Budge-Budge.—Revd. Long.

ওয়াটসন্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্লাইব সহজে দুর্গাধিকার পরিত্যাগ না করিলে "তাঁহাকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিব";—ক্লাইব বলিলেন, 'তথাস্তু; কিন্তু এই আত্মকলহের জন্য ওয়াট্‌সন্ দায়ী'! অবশেষে কাপ্তান লাথাম ও স্বয়ং ওয়াট্‌সনও দুর্গমূলে শুভাগমন করিলেন, এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া ক্লাইবের হস্তেই দুর্গাধিকার সমর্পিত হইল।* পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দুর্গজয়ের কাহিনী লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু এরূপ গৃহকলহের দৃষ্টান্ত বোধ হয় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয়দলের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য ড্রেক সাহেবকে কলিকাতার শাসনভার প্রদান করা হইল; তিনি পুনরায় কলিকাতার কর্ত্তা হইয়া সগৌরবে আসনগ্রহণ করিলেন।

ইংরাজেরা দুর্গপ্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গমধ্যে কোম্পানীর দ্রব্যজাত যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে,—কিছুই অপহৃত বা বিলুণ্ঠিত হয় নাই। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যে সকল বাড়ীঘর ছিল, তাহাই কেবল সিপাহীরা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্বীকার বাক্যই সিরাজদ্দৌলার দোষক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি যে ইংরাজদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন না, তাহা কেবল মুখের কথা নহে, তাঁহার এই সকল কার্য্যই তাহার অকাট্য প্রমাণ, কিন্তু ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ অনেকে স্বপ্রণীত গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইয়াছেন।

দুর্গ হস্তগত হইল। দেশের লোকে দলে দলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইংরাজবাণিজ্য পুনঃসংস্থাপনের সূত্রপাত হইল। ক্লাইবের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু লঙ্কাভাগ ত হইল না! কলিকাতা ইংরাজের রাজধানী; তাহা লুণ্ঠন করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং দেশ লুণ্ঠনের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন! অবশেষে হুগলী লুণ্ঠন করা স্থির হইল। হুগলী বহুদিনের পুরাতন স্থান; ফৌজদারের রাজধানী; বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তিভূমি;—সেখানে অবশ্যই অগণিত ধনরত্ন পুঞ্জীকৃত থাকা সম্ভব। মেজর কিলপ্যাট্রিক বহুদিন নিষ্কর্ম্মা বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার উপরেই লুণ্ঠনের ভার সমর্পিত হইল। পদাতিক গোলন্দাজ, ভলণ্টিয়ার,—লুণ্ঠনলোভে ইংরাজমাত্রেই হুগলীর দিকে ছুটিয়া চলিল। হুগলীর দুর্গ এবং রাজধানী লুণ্ঠিত হইল; তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া ইংরাজসেনা যতদূর পারিল লোকের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।†

ওয়াট্‌সন্ এবং ক্লাইব বঙ্গদেশে শুভাগমন করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট সন্ধির প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলাও সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে কথায় কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া, ইংরাজেরা বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তথাপি সিরাজদ্দৌলা তাহাতে উত্যক্ত না হইয়া পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে :—

* Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons, 1772.

† The fort and city were plundered, and as many of the magnificent houses destroyed, as the short time would permit.—Ive's Journal.

January 23, 1757.

You write me, that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trades, rights and privileges : the instant I received this letter, I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again.

I must inform you, that Roger Drake, the Company's Chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority ; he gave protection to the King's subjects who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid, but to no purpose. On this account, I was determined to punish him, and accordingly expelled him my country : but it was my inclination to have given the English Company permission to have carried on their trade as formerly, had another Chief been sent here : for the good therefore of these Provinces, and the inhabitants, I send you this letter ; and if you are inclined to re-establish the Company, only appoint a Chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce upon the same terms as heretofore enjoyed. If the English behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection, and assistance." *

এই পত্রে সিরাজচরিত্রের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত ইতিহাস-বর্ণিত সিরাজদ্দৌলার কত প্রভেদ ! কিন্তু ইংরাজেরা সে সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয়প্রদান করিতে পারিলেন না। এই পত্র যখন ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তখন তাঁহারা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া, হুগলী বিপর্য্যস্ত করিয়া, বীরসিংহ হইয়া দুটীশদুর্গে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুতরাং ওয়াট্‌সনের শান্তমূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া গেল ;—তিনি এবার সিংহবিক্রমে প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন যে :—

"You told me in your letter, that the reason of your expelling the English out of these countries was, the bad behaviour of Mr. Drake, the Company's Chief in Bengal. But besides that, Princes and Rulers of States, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed, and the truth (is) kept from them by the arts of

* Ive's Journal.

crafty and wicked men ; was it becoming the justice of a Prince to punish all for one man's sake? Or to ruin and destroy so manoy innocent people as had no way offended, but who, relying on Our Royal Phirmaund, expected protection and security both to their property and lives, instead of oppression and murder, which they unhappily found? Are these actions becoming the justice of a Prince? No body will say, they are. They can only then have been caused by men, who have misrepresented things to you through malice, or for their own private ends ; for great Princes delight in acts of justice, and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the fame of a great Prince, and lover of justice, shew your abhorrence of these proceedings, by punishing those evil counsellors who advised them ; cause satisfaction to be made to the Company, and to all others who have been deprived of their property, and by these acts turn off the edge of the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. Drake, as it is but just that the master alone should have a power over his servant, send your complaints to the Company, and I will answer for it they will give you satisfaction.

Although I am a soldier as well as you, I had rather receive satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects."*

এই পত্রখানি যখন সিরাজদ্দৌলার হস্তগত হইল, তৎপূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনকাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারে চিরদিন যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, ওয়াট্সনের পত্রেও তাহাই হইল। সিরাজদ্দৌলা মুসলমান,—ওয়াট্সন্ সুসভ্য খৃষ্টীয়ান ; সুতরাং মুসলমান নবাব খৃষ্টীয়ান সওদাগরের ধর্ম্মনীতির যুক্তিতর্ক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা বাক্য-নবাব ; 'যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহার অনুকরণ করিও না'—এই নিগূঢ় নীতি-রহস্যের উপাসক ; পরকার্য্য সমালোচনায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ; আত্মকার্য্য লইয়া কেহ সমালোচনা করিতে চাহিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন ; কার্য্য যেরূপ হয় হউক, বাক্যে তাহার দোষক্ষালনের সময়ে সকলেই পঞ্চমুখে ইংরাজের গুণগান করিতে লালায়িত ;—সিরাজদ্দৌলা তরুণযুবক, তিনি ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ সমালোচনা

* Ive's Journal.

করিয়া ইংরাজের নামে শিহরিয়া উঠিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা পদাশ্রিত বণিক হইয়াও হুগলীর নিরপরাধ নাগরিকদিগকে (কেবলমাত্র লুণ্ঠন-লোভেই) হত্যা করিয়া, তাহাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া দস্যুতস্করের ন্যায় অর্থশোষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিনা তরবারির শোণিত-কলঙ্ক ধৌত করিতে না করিতেই লেখনী গ্রহণ করিয়া প্রবীণ ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য সিরাজদ্দৌলাকে তিরস্কার করিতে বসিয়াছেন। যুদ্ধকলহে একজনের অপরাধে চিরদিনই দশজনের দণ্ড হইয়া থাকে। এক রাবণের অপরাধে সমগ্র রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; এক নেপোলিয়নের অপরাধে অগণ্য ফরাসীসেনার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; ইংরাজরাজ্যেও এক নরপতির কল্পিত অপরাধে অসংখ্য নাগরিকের শোণিত-প্রবাহে শ্বেতদ্বীপ রুধিরচর্চ্চিত লোহিতবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার ইংরাজেরা দশজনে মিলিয়া, সভা করিয়া, মন্তব্য লিখিয়া, নবাবদূতকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া কি সমুচিত অপরাধ করেন নাই;—না, সে অপরাধ কেবল একজনের অপরাধ? যাঁহারা অপরাধী ড্রেক সাহেবের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লড়িবার জন্য যুদ্ধশিক্ষা করিয়া টানার দুর্গাক্রমণে, উমাচরণের সর্ব্বনাশ সাধনে অতিমাত্র প্রশংসনীয় বীরকীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া কার্য্যকালে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে নিরপরাধ হইলেও আত্মকার্য্যেই অপরাধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে;—রাজার অপরাধে প্রজার, সেনাপতির অপরাধে সেনাদলের, নানারূপ দণ্ড হইয়া থাকে। যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিলে, তাহাতে রাজদুর্গের সঙ্গে সঙ্গে কত কাঙ্গাল-কুটিরও ভস্ম হইয়া যায়;—কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে? ওয়াট্‌স্‌ন্ কোন লজ্জায় সত্যসঙ্কোচ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলা পরের কথায় নির্ভর করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন? কলিকাতা হইতে নবাবদূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার কথা কলিকাতার ইংরাজেরাও অস্বীকার করেন নাই; ওয়াট্‌সন্ কি গলাবাজিতে সকল কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন? ওয়াট্‌স্‌ন্ যাহাই বলুন, ইংরাজের কাগজপত্র তাহার পক্ষসমর্থন করে না। ড্রেক সাহেব যেরূপ উদ্ধত ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়াট্‌স্‌ন্ বলেন যে তজ্জন্য কোম্পানীর কাছে করজোড়ে নালিশ করাই সিরাজদ্দৌলার কর্ত্তব্য ছিল। সিরাজদ্দৌলা আর তাহার কি প্রত্যুত্তর দিবেন? তিনি যে দেশের নবাব, ড্রেক সাহেব সেই দেশের একদল সওদাগরের গোমস্তা মাত্র; অথচ সেই দেশে বসিয়া তাঁহাকে ইহাও শুনিতে হইল যে, কোম্পানীর নিকট নালিশ না করিয়া নিজে নিজে ড্রেক সাহেবকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে! শাসনক্ষমতা সংস্থাপনের জন্য, আত্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনমান রক্ষা করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; মুসলমান-নবাব উত্ত্যক্ত হইয়াও কতদূর ক্ষমাশীল হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"You have taken and plundered Hughley, and made a war upon my

subjects : these are not acts *becoming merchants !* I have, therefore, left Muxudabad, and am arrived near Hughley ; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. *Nevertheless*, if you have a mind to have the Company's business settled upon its ancient footing, and to give a currency to their trade, send a person of consequence to me, who can make your demands, and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a Perwannah for the restitution of all the Company's factories, and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the English, who are settled in these Provinces, *will behave like merchants, obey my orders, and give me no offence*, you may depend upon it I will take their loss into consideration and adjust matters to their satisfaction.

You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war ; therefore, if you will, on your part, relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship, and preserve a good understanding for the future with your nation.

You are a Christian, and know how much preferable it is to accomodate a dispute, than to keep it alive ; but if you are determined to sacrifice the interest of your Company, and the good of private merchants to your inclination for war, it is no fault of mine : to prevent the fatal consequence of such a ruinous war, I write this letter." *

এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবীণ নরপতির শান্তপ্রকৃতির ঔদার্য্যগুণ প্রকাশিত রহিয়াছে, সিরাজদ্দৌলা তরুণযুবক হইয়াও যে সেরূপ উন্নত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সবিশেষ গৌরবের কথা। রাজা হইয়া প্রজার সঙ্গে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হওয়া রাজার পক্ষে সর্ব্বথা অকল্যাণের কথা ;—তাহাতে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি, একের অপরাধে দশের সর্ব্বনাশ এবং দেশের সমূহ অমঙ্গল। একথা সিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াই—সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে ইংরাজদিগের ব্যবহারের তুলনা কর। কে শান্তি প্রিয়,—মুসলমান সিরাজ, না খৃষ্টীয়ান্ ইংরাজ ?

* Ive's Journal.

দশম অধ্যায়।

আলিনগরের সন্ধি।

মুসলমান ইতিহাস-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ইংরাজেরা যখন হুগলী লুণ্ঠনে অবসরশূন্য, ঠিক সেই সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ পাইলেন যে, স্বদেশে ফরাসীদিগের সঙ্গে আবার সমরকলহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ এবং ফরাসী শান্তভাবে জীবনধারণ করিতে শিখিল না। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসর কেবল যুদ্ধকলহ চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন রণশ্রান্ত হইলে, পরামর্শ করিয়া হাঁপ ছাড়িবার জন্য উভয়েই কিছুদিনের মত সন্ধিসংস্থাপন করে;—কিন্তু কিছুদিন বিশ্রামলাভ করিয়াই পুনরায় সমর-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে।" *

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বাহুবল সুবিস্তৃত করিতেছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালাদেশে তিনশত গোরা এবং অনেকগুলি সুশিক্ষিত গোলন্দাজ রাখিতেন। এদেশের লোকের নিকট ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীরাই বীরকীর্ত্তির জন্য সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশে ফরাসীজাতির সহিত সমর-কোলাহল উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। চিরশত্রু ফরাসীসেনার সঙ্গে নবাবের সেনাদল মিলিত হইলে, ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইতে কতক্ষণ? ক্লাইব তাহা বুঝিতেন। তিনি বিলাতের সংবাদ পাইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, এবং এই দুঃসময়ে সহসা গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে কলহের সূত্রপাত করিয়া যে সমূহ অমঙ্গল আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। † তাড়াতাড়ি উমাচরণ এবং জগৎশেঠের শরণাগত হইয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অকস্মাৎ হুগলী লুণ্ঠনের সমাচার শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধোন্মত্তহৃদয়ে কলিকাতাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন; ইংরাজগণ সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে? নবাব কি আর সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন? সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এতদিনে ইংরাজের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ‡ সিরাজদ্দৌলা 'নরশোণিত-লোলুপ নৃশংস নরপতি' হইলে তাহাই হইত। কিন্তু তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকগণ সে কথা স্বীকার না করিলেও, কর্ণেল ক্লাইব নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে,

---

* Mustafa's Mutakherin, I. 759.

† Thornton's History of the British Empire, vol. I, 208.

‡ The English were now very desirous to make their peace with that formidable ruler; but the capture of Hoogly, undertaken *solely with a view to plunder*, had so augmented his rage, that he was not in a frame of mind to receive from them any proposition.—Mill, vol. II. 157.

সন্ধির জন্য তাঁহাকে সবিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় নাই ;—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাই সর্ব্বাগ্রে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সকল আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন। *

সিরাজদ্দৌলা সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন কেন? ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি,—সে ত কেবল বালির বাঁধে সমুদ্রতরঙ্গের গতিরোধ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস! যদি সত্যসত্যই সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তথাপি কয়দিন তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে? স্বদেশের নিকটতম প্রতিবাসীর সঙ্গে যাহাদিগের কলহবিবাদ ছয়শত বৎসরেও শান্তিলাভ করিল না, বিদেশে তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা কয়দিন প্রতিপালিত হইবে? সন্ধিপত্র ত কেবল ইংরাজের মুখের কথা;—তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি? এই ত সেদিন তাঁহারা বিপদে পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সেকথা পুরাতন না হইতেই লুণ্ঠন-লোভে হুগলীর কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন! সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হয় নাই,—কত বহুমূল্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত নিরন্ন কাঙ্গালকুটির দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, হুগলীর ইতিহাসবিখ্যাত সমৃদ্ধজনপদ শ্মশানভস্মে পরিণত হইয়াছে! আজ না হয় আবার ফরাসী-সমর-শঙ্কায় চিন্তাকুলহৃদয়ে খৃষ্টীয়ান ইংরাজ নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব মেষশাবকের ন্যায় করুণকণ্ঠে "শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিয়া কাতর ক্রন্দনে নবাব-দরবারের শরণাপন্ন হইয়াছেন; কিন্তু সময় পাইলেই তাঁহারা যে আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি?

যদিও অনেকে এই সকল কথা উপস্থিত করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে বাধা দিবার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না, তথাপি সিরাজদ্দৌলা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কলিকাতায় শিবির-সংস্থাপন করিয়াই সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা কি ইংরাজ-ভয়ে ভীত হইয়াই সন্ধির জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলেন যে, তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপ বিপদবেষ্টিত, তাহাতে ভীত হইবার কারণ ছিল না;—তাঁহাদের সেনাবল অল্প; তাহারও কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গতাড়িত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে; যাহারা বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারাও সকলে জীবিত নাই; আর যাহারা জীবিত, বাঙ্গালার জলবায়ু অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে! ইহাদের ভয়ে ভীত হইবার কারণ ছিল না;—তথাপি সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন?

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে ভাল মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহার বাল্যসংস্কারের সহিত যৌবনের অভিজ্ঞতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজদমন করিতে না পারিলে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না। নবাব আলিবর্দ্দীও অন্তিম সময়ে

---

* According to Orme (vol. II. 129) it was Clive who proposed negotiations.—Clive himself represented the overture as coming from the Subahdar.—Thornton's History of the British Empire, vol. I. 209.

তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সে কথার ক্রমশঃ পরিচয় পাইতে লাগিলেন, এবং দিব্যনেত্রে ইংরাজের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আতঙ্কযুক্ত হইলেন। আজ হুগলী বিপর্য্যস্ত হইল, কাল হয়ত অন্য কোন স্থান বিধ্বস্ত হইবে। সিরাজ দেখিলেন যে, ইংরাজ দ্বিতীয় বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত করিবে;—কত সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইবে, কত নিরীহ নাগরিক হাহাকার করিবে, কত রুধিরকর্দ্দমে বঙ্গভূমি কলঙ্কিত হইবে; এবং এত করিয়াও একদিনের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিবার অবসর ঘটিবে না! ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার দুইটিমাত্র সদুপায়;—হয় শত্রুতাসাধনে, না হয় মিত্রতাবন্ধনে; হয় করাল কৃপাণ-মুখে, না হয় লেখনীসাহায্যে। আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া শত্রুতাসাধন করিয়া দেখিলেন;—তাহাতে হিতে বিপরীত হইল; ইংরাজ দমন হইল না; বরং চিরশত্রুতার সূত্রপাত হইল। সুতরাং মিত্রতাবন্ধনে ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার জন্যই সিরাজদ্দৌলা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাহিতৈষণা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া কুচক্রী মন্ত্রীদল তাঁহার প্রস্তাবে নানা প্রকারে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বিচলিত হইলেন না।

নওয়াজেস মোহম্মদ এবং শওকতজঙ্গের পরলোকগমনে কুচক্রীদলের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইংরাজ একমাত্র শেষ সম্বল। তাঁহারা যদি সিরাজের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সিরাজ নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ, কিন্তু দুষ্টদলের সর্ব্বনাশ। নবাব এতদিন বিপদবেষ্টিত বলিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং সিরাজদ্দৌলাকে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর প্রদান করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহারা ইংরাজের সঙ্গে চিরশত্রুতা সঞ্জীবিত রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত রাখিবার জন্যই সন্ধির প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন; এবং জানিতেন বলিয়াই আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না।

ইংরাজেরা সন্ধির জন্য ব্যাকুল; সিরাজদ্দৌলাও সন্ধির জন্য লালায়িত! এ সন্ধির গতি-রোধ করিবে কে? তখন কুচক্রীদলের কুমন্ত্রণা আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য প্রতিবাদে পরাজিত হইয়া অপ্রকাশ্য কৌশলবলে সিরাজদ্দৌলার শান্তি-পিপাসার গতিরোধ করিবার আয়োজন হইল!

সেকালের কলিকাতা সহরে বণিকরাজ উমাচরণের রাজবাটীই সর্ব্বাপেক্ষা পরম রমণীয় স্থান বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার দীপালোকবিভূষিত সুসজ্জিত পুষ্পো-দ্যানেই সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। চারিদিকে গর্ব্বোন্নতমস্তকে সশস্ত্র সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান,—যথাযোগ্য রাজপরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করজোড়ে উপবেশন করিয়াছেন,—মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত মস্‌নদ, কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্নরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপ,—সেই স্বর্ণসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সিরাজ-

দ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকান্তি সদ্যোজাত প্রফুল্ল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়ালস্ এবং স্ক্রাফ্‌টন্ দরবারে পদার্পণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সৌভাগ্য-গর্ব্বের ফলিত জ্যোতিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ! এই রত্ন-সিংহাসন যাঁহার পাদপীঠ, এই সুশিক্ষিত দৃঢ়োন্নত বীরমণ্ডলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রীদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিভবচ্ছটা যাঁহার রত্নমুকুট সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,—সর্ব্বনাশ ! ইংরাজ-বণিক কোন্ সাহসে তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ? কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাদিগের মনে হইল,—এ সকল বুঝি ইন্দ্রজাল ! এ সকল বুঝি কেবলমাত্র ইংরাজদিগকে ভয় দেখাইবার বাহ্যাড়ম্বর ! তখন তাঁহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্যই তিনি সশরীরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহারাও সন্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছেন ; যুদ্ধকলহে তাঁহাদিগের বাণিজ্যবিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে। সিরাজদ্দৌলা তখন ইংরাজদিগকে সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেওয়ানের পটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সহাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কুচক্রী-মন্ত্রীদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা সুকৌশলে সন্ধির প্রস্তাব চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যে দুইজন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রতিনিধি সাজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া; নবাব-দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুঠিয়াল সিবিলিয়ান ;—সিরাজদ্দৌলার নামে তাঁহাদের অন্তরাত্মা সহজেই কাঁপিয়া উঠিত। মন্ত্রীদল অনন্যোপায় হইয়া, এই ইংরাজযুগলের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার করিয়া কার্য্যোদ্ধারের আয়োজন করিলেন !

ইংরাজেরা দরবার হইতে বাহির হইবামাত্র সুচতুর উমাচরণ আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাণে কাণে নিতান্ত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"দেখিতেছ কি ? প্রাণ বাঁচাইতে চাহ ত এখনই পলায়ন কর। সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ—এ সন্ধি নহে ;—ইহা কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল। নবাবের সেনাদল আসিয়াছে, কিন্তু কামানগুলি এখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ; সেইজন্য তোমাদিগকে সন্ধির কথা উঠাইয়া প্রতারিত করিতেছে। কামান আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। তোমরা কয়জন ? সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে ?" ইংরাজদ্বয়ের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। কি সর্ব্বনাশ ! এই সাদর সম্ভাষণ, এই সন্ধির শান্তি-সূচনা,—এ সকলই কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল ? এখন উপায় কি ? মুখের ভাব দেখিয়া উমাচরণ বুঝিলেন যে,—ঔষধ ধরিয়াছে। তিনি অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর উপায় কি ? দেওয়ানের পটমণ্ডপে গমন করিলেই বন্দী হইতে হইবে ! এখনও সাবধান হও। মশাল নিভাইয়া

দিয়া আঁধারে আঁধারে দুর্গমধ্যে পলায়ন কর।" যে কথা সেই কাজ ;—ইংরাজেরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, সিরাজদ্দৌলা কি কামান না লইয়া রিক্তহস্তে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন ?

সিরাজদ্দৌলা এই কুটিল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না ; কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজ-শিবিরে একজনও ঘুমাইবার অবসর পাইল না। ক্লাইব তপ্তাঙ্গারের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রতাবে ওয়াট্‌সনের নিকট ছুটিয়া চলিলেন ;—ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইয়া আপন পদাতিকসেনার সহিত সম্মিলিত করিলেন ; এবং রজনী তিন ঘটিকার সময়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সসৈন্যে নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব-শিবিরে ৬০০০০ সিপাহী এবং ১৮০০০ অশ্বারোহী ৪০টি কামান লইয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন ;—তাহারা জাগিয়া উঠিলে যে ইংরাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ক্লাইব তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না !

একে নিশাকাল ; তাহাতে নিদারুণ শীত। সকলেই নিঃশব্দ নিঝুন। সেই নৈশনীরবতা আলোড়ন করিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম কলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল ! গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্ ; গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্ ; গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্ ;—ইংরাজের কামান ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল, গুড়ুম—গুড়ুম—গুম্। সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া সিপাহীসেনা কামান-গর্জ্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না ! তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির আকুল করিয়া তুলিল ; এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল জ্বালাইয়া, কামানের নিকটে দাঁড়াইতে লাগিল। তখন নবাব-শিবিরের কামানগুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না !

সিরাজদ্দৌলা গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভাত হইলেও ভাল করিয়া দৃষ্টি-সঞ্চালনের উপায় হইল না ;—ঘন ঘনাকারে ধূমপুঞ্জ দিঙ্‌মণ্ডল আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার উপর কুজ্ঝটিকায় চারিদিকে সমাচ্ছন্ন ; নিকটে কি দূরে, কোনদিকেই নয়নসঞ্চালনের সুবিধা নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উভয়পক্ষের কামানগুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠিতেছে ; আর মধ্যে মধ্যে আহতের আর্ত্তনাদে চারিদিক আকুল করিয়া তুলিতেছে ! সকলেই বুঝিল যে লড়াই বাধিয়াছে ;—কিন্তু সহসা লড়াই বাধিবার কারণ কি সে কথা কেহই বুঝাইতে পারিল না।

৭টা বাজিয়া গেল। তথাপি সেই কুজ্ঝটিকা, তথাপি সেই ধূমপুঞ্জ, তথাপি সেই কামান-গর্জ্জন। কে কোথায় ছিটাইয়া পড়িয়াছে ;—শত্রু নিকটে কি দূরে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না ; কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানেরা কামানে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, আর প্রদীপ্ত লৌহপিণ্ডরাশি তীব্রতেজে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। যখন দিবালোক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, ক্লাইবের সমর-পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তাঁহার গর্ব্বোন্নত গোরাসৈন্য দূরপথে হেটমুণ্ডে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতেছে ;—আর মুসলমান অশ্বসেনা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়া ছুটাইয়া ধাবিত হইতেছে। ইংরাজদিগের দুইটি

কামান মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে ;—এখানে, ওখানে, সেখানে, চারিদিকে ইংরাজ-সেনার বীরমুণ্ড রুধিরকর্দ্দমে ধরা-বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! একে সামান্য সেনাবল লইয়া ক্লাইব এবং ওয়াট্সন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন ; তাহাতে ক্লাইবের অবিমৃষ্যকারিতায় একদিনেই ১২০ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইয়াছে, এবং শতাধিক সিপাহীসেনা কালকবলে নিপতিত হইয়াছে! নবাব-শিবিরেও হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ;—কত হতভাগা আর নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিবার অবসর পায় নাই; কত সিপাহী শত্রুমিত্রের যুগপৎ অনলবর্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!

সহসা এই যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত হইল কেন? সিরাজদ্দৌলা তাহার কারণানুসন্ধান করিতে বসিয়া মন্ত্রীদলের মন্ত্রণার বাহাদুরী বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মীরজাফরের ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনিও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন। এই সেনাপতি, এই প্রভুভক্ত মন্ত্রীদল লইয়া ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস হইল না ;—সিরাজদ্দৌলা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যে সিরাজদ্দৌলা আবাল্য ইংরাজদলনে কৃতসংকল্প, তিনিই যে আবার সন্ধির জন্য সরলভাবে লালায়িত হইয়াছেন, ইংরাজেরা সে কথায় সহসা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। ক্লাইব রণভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল ; কিন্তু ওয়াট্সন্ তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"I am fully convinced that the Nabob's letter was only to amuse us in order to cover his retreat, and gain time till he is reinforced, which may be attended with very fatal consequences. For my own part, I was of opinion that attacking his rear when he was marching off, and forcing him to abandon his cannon, was a most necessary piece of service to bring him to an accomodation ; for till he is well thrashed, don't, sir, flatter yourself he will be inclined for peace. Let us, therefore, not be overreached by his politics, but make use of our arms, which will be much more prevalent than any treaties or negotiations."

ক্লাইব কিন্তু ওয়াট্সনের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। মন্ত্রীদলের কুমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ক্লাইব যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র সুস্থির করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজদিগের অনুরোধ রক্ষার জন্য মীরজাফর এবং রায় দুর্ল্লভকেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল। ইতিহাসে ইহারই নাম,—'আলিনগরের সন্ধিপত্র।'

এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজবণিক বাদশাহী ফরমাণের লিখিত সমুদায় বাণিজ্যাধিকার পুনঃ-

প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার দুর্গসংস্কারের অনুমতি প্রদত্ত হইল; কলিকাতায় টাকশাল বসাইয়া বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল; এবং কলিকাতা লুণ্ঠনসময়ে ইংরাজদিগের যাহা কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, সিরাজদ্দৌলা তাহাও পূরণ করিবার জন্য সম্মতিদান করিলেন।

তত্ত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যখন বিন্দির মা মিত্রগৃহিণীর নিকট আসিয়া মৃণালিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার প্রথম প্রস্তাব করিল, তখন তিনি রৌদ্রে বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন; সুতরাং প্রথমে কথাটা তাঁহার কাণে পৌঁছিল না।

বিন্দির মা পুনরায় কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কি বলেন? মা ঠাকরুণ অনেক ক'রে বোলে দিয়েছেন—তা মেনাদিদি এখানে রয়েছেও ত অনেক দিন।"

মিত্রগৃহিণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "ওমা বল কি গো, এখন আমি কি কোরে বৌমাকে পাঠাই—, আমারই শরীর দেখ্‌ছ ত, কখন আছি কখন নাই—।"

পার্শ্বে এতক্ষণ ওপাড়ার "মেজ ঠাকরুণ" বসিয়া বসিয়া গ্রামের সমস্ত লোকের দোষগুণ বর্ণনা করিয়া মিত্রগৃহিণীকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন, এবং তাহার সহিত গৃহিণীর নিকট হইতে কয়েকটা আলু ও পটোল বিনামূল্যে আদায় করিয়া প্রাতঃকালের আহারের ভবিষ্যৎ সুখচিত্র মনে মনে কল্পনা না করিতেছিলেন, এমন নয়।

এই জন্য অকস্মাৎ মৃণালিনীর মাতার পুরাতন ঝি মৃণালিনীকে লইয়া যাইবার জন্য অসময়ে আসিয়া মেজ ঠাকরুণের ঔদারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত দেওয়াতে, তিনি ঝিয়ের উপর আন্তরিক চটিয়াছিলেন।

তিনি আর থাকিতে না পারিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, "আহা—মেয়ে, তোকে কত বলি, শরীরের দেখ্। ভাগ্‌গিদোষে সকলেই গেছে—এক ছেলে আছে তার জন্যও ত সংসারটা দেখ্‌তে হয়—।" এই বলিয়া চক্ষে বস্ত্রমার্জ্জন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তুলিলেন। বিন্দির মা এত দুঃখেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; কারণ, যে মিত্রগৃহিণীর শারীরিক অসুস্থতা লইয়া এত কথা হইল, তিনি একটি প্রকাণ্ড তৈলপাত্রবিশেষের ন্যায় অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসুন্ধরাকে পীড়ন করিতেছিলেন।

বিন্দির মা বলিল—"প্রায় দু বচ্ছর হোল দিদিকে পাঠান নি, কতবার লোক এসে ফিরে গেছে, কিন্তু এবার একবার দয়া কোরে পাঠিয়ে দিন, বাবুর বড় ব্যায়রাম হোয়েছে—তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমায় আসবার সময় কত কোরে—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিত্রগৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর আদিখ্যেতায় কাজ নাই। আমি কি তাঁকে চিনি না, কোন্‌মুখে মেয়ে নিয়ে যেতে লোক পাঠান? মনে নেই রথের তত্ত্বর কথা? জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব অমনি কোরে দিতে হয়? শীতের তত্ত্বে কি ঐ শাল? একবার মুখের কথা বোলেছিলাম বোলে, আমায় কম গালাগাল দিয়েছিল?"

মেজ ঠাকরুণ অমনি বলিয়া উঠিলেন "আহা—তুই মেয়ে, ভালমানুষ কি না, তাই সব সহি কোরেছিলি। মাগো মা—শীতের সময় জামাইকে কি ঐ তত্ত্ব করে—আমরা যে এত গরীব তবু আমরা নিজের হাতে প্রাণ থাক্‌তে কখনও এমন জিনিষ দিতে পারি না।"

মিত্রগৃহিণী পূর্ব্বস্বরে বলিলেন "বলত মেজ মাসি, আমার প্রবোধ কি ভেসে এসেছিল? যদি ভালরকম কুটুম্বিতা না কোরতে পারবি তা বাপু কেন আমার ঘরে এলি? তাঁকেও তখন আমি বারবার বোলেছিলাম,—গরীবের ঘরে কাজকারবার কোর না—কোর না। তা আমার কথাই বা শোনে কে? বোল্লেন কি না—মেয়েটি লক্ষ্মীমন্ত—মেয়ে দেখেই দিচ্চি। আরে আমার সাতলক্ষ্মীর লক্ষ্মীর ধন রে—।"

বিন্দির মার কাছে প্রত্যেক কথা যেন উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত বোধ হইতেছিল,—একবার জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু ভাবিয়া দেখিল আজ জোর করিবার সময় নহে।

সে প্রথমে অনুনয় বিনয় করিল, চোখের জল ফেলিল, হাতে পায়ে ধরিতেও ত্রুটি করিল না, কিন্তু কিছুতেই মৃণালিনীর শাশুড়ির মন নরম হইল না।

অবশেষে বলিল "মা, আমি তামা তুলসী হাতে নিয়ে দিব্বি করছি দুদিন পরেই আবার দিদিকে রেখে যাব,—কেবল দুটী দিনের জন্য নিয়ে যেতে দাও, বাবু অনেক দুঃখ ক'রে একবার দেখা কর্‌তে চেয়েছেন—।"

প্রবোধের মাতা ভ্রুকুটি সহকারে বলিলেন—"আমি তোমাদের সকলকেই চিনি। কই বাছা সব তত্ত্বই কোর্ব্বে বোলেছিলে, কটা কোরেছ শুনি। প্রবোধকে যে ঘড়ীর চেন দেবার কথা ছিল, তাই বা কই? বিয়ে ত আজ সাড়ে তিন বচ্ছর হোল হোয়ে গেছে; মিথ্যে অসুখের নাম কোরে মেয়ে নিয়ে যেতে চান ত আগে সব তত্ত্ব চুকিয়ে দিন—পাড়ার লোকের কাছে কি আর আমার মুখ দেখাবার যো আছে?"

মেজ ঠাকরুণ সুবিধা বুঝিয়া বলিলেন, "তা আর একবার কোরে বোলতে, মেয়ে? হা তত্ত্ব জো তত্ত্ব কোরে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছল, কিন্তু কোথায় বা কি?"

প্রবোধের মাতা মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "খ্যামতা আছে যে দেবে? না বাছা তোমাদের কারসাজি চোল্‌বে না। একে আমার প্রবোধ বাড়ি নাই, তাতে আবার আমার এই ত অবস্থা। বৌমা গেলে কে যে মুখে জল টুকু তুলে দেবে তার ঠিকানা নাই। ঐ ঘরে বৌমা আছে দেখা করে যাও।"

রাগে ও ক্ষোভে বিন্দির মার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিছু না বলিয়া সে ধীরে ধীরে পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া গেল।

মেজ ঠাকরুণ বলিলেন "তা তুমি মেয়ে চালাক কি না, তাই বৌর বাপের চালাকিটা ধোরে ফেল্লে—আমরা হোলে কি আর পার্ত্তুম ?"

প্রবোধের মাতা বলিলেন "চালাকি না জুয়োচুরি! তিনি যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন তবে বুঝতেন, তাঁর এ সম্বন্ধে কত ঝক্কি। গরীবের সঙ্গে আমাদের কারকারবার চলে ? না আছে তত্ত্ব—না আছে তাবাশ—।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্দির মা মৃণালিনীদের অনেক কালের ঝি। সে মৃণালিনীকে হইতে দেখিয়াছে—তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সুতরাং "মেনাদিদি"র স্নেহের উপর যে তাহার যথেষ্ট দাবীদাওয়া ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিন্দির মা ঘরের ভিতর গিয়া দেখিল, মৃণালিনী দুই হাত ঘোমটা টানিয়া দরজা ধরিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মৃণালিনীর দুঃখ আরও বর্দ্ধিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঝি আর আমি এখানে থাক্‌বো না, আমাকে নিয়ে চল্।"

বিন্দির মা মৃণালিনীকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া দেখে যে, নিজেকেই সান্ত্বনা করিবার জন্য অপর একজনের প্রয়োজন। সে মৃণালিনীকে জন্মিতে দেখিয়া আজ ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছে—তাহার কষ্ট বিন্দির মা কি করিয়া সহ্য করিবে? আজও বিন্দির মার সে কথা মনে পড়ে, যখন মৃণালিনী হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার সংসারের একমাত্র স্নেহবন্ধন বিন্দি—বিন্দুবাসিনী সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! তাহার পর মৃণালিনীকে লইয়া সে সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া—বহুকালসঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকু অর্পণ করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল!

অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া বিন্দির মা বলিল "দিদি কাঁদিস্ নে। দেখ্‌লি ত কত বল্লুম কিন্তু তোর শাশুড়ি কোন মতেই রাজী হোল না—"

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ঝি, বাবা ভাল আছেন ?"

বিন্দির মা এ প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে বলিল "হাঁ আজকাল একটু ভাল আছেন—মধ্যে একটু অসুখ করিয়াছিল—" অসুখটা যে কি তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে সাহস হইল না!

মৃণালিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "মা কেমন আছেন ?"

বিন্দির মা বলিল "মাও ভাল আছেন। তাঁরা দুজনেই তোমাকে দেখবার জন্য বড় কাতর হোয়েছেন কিন্তু দেখ্‌লে—"

এই কথা শুনিয়া মৃণালিনীর চোখের জল উথ্‌লাইয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ঝি, তোর পায়ে পড়ি আমাকে নিয়ে চল, আমি এখানে থাকলে বাঁচব না। আচ্ছা ঝি,

এক কাজ কোর্‌লে হয় না, চল্‌না কাউকে কিছু না বোলে আমরা রাত্তিরে পালিয়ে যাই ?”

বালিকার অজ্ঞতা দেখিয়া ঝি একটু হাসিল—বলিল “সে কি হয় দিদি ? আচ্ছা আমি আর একবার তোমার শাশুড়িকে বোলে দেখ্‌ছি।” এই বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া পুনরায় প্রবোধের মাতার নিকট প্রস্তাব করিল।

রন্ধননিপুণা পাঠিকাবর্গ যদি উত্তপ্ত তৈলকটাহে জলবিন্দু নিক্ষেপের অতর্কিত পরিণাম দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিন্দির মার কথায় মিত্রগৃহিণীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

বিন্দির মা একটু রুক্ষস্বরে বলিল “তোমার যেন বৌ, কিন্তু বাপমায়েরও ত মেয়ে বটে, তাঁদের দিকেও ত একবার দেখ্‌তে হয়।”

গৃহিণী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন “অমন মেয়ে ঘরে তুলেছি এই ভাগ্‌গি। খোঁজ খবর নাই, তত্ত্বকরা নাই, কোন্ হিসাবে মেয়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্—দূরহ বাড়ী থেকে।”

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিবে, বিন্দির মা এতটা আশঙ্কা করে নাই—সুতরাং তাহার গায়ে অপমানটা বড় বিঁধিল। সে কৈবর্ত্তের মেয়ে, সুতরাং ছাড়িয়া কথা কহিবে কেন ? বিশেষতঃ যখন দেখিল মৃণালিনীকে লইয়া যাইবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন সে কোমর বাঁধিয়া শব্দসাগর মন্থন করিয়া সর্ব্বপ্রকার অশাস্ত্রীয় সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে একবার মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু অধিক অপমানিত হইবার আশঙ্কায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল।

কিন্তু কলহের সময়ও সে যে দ্বারের পার্শ্ব হইতে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে না পাইতেছিল, এমন নহে, এবং যখন সে উত্তপ্ত হৃদয়ে ও অনাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে পুনরায় কম্পিত পদে গ্রাম্যপথ দিয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল, তখনও তাহার বোধ হইতেছিল যেন বহুদূর হইতে একটি করুণ-বিলাপধ্বনি সমস্ত পল্লীখানিকে কাঁপাইয়া দ্বিপ্রহরের শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

যাইতে যাইতে সে অনেকবার অনিশ্চিত হৃদয়ে পথে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকবার ভাবিয়াছিল আর একবার মৃণালিনীর শাশুড়ির নিকট গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখে কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ব্যবহারের কথা স্মরণ হওয়াতে সে আরও দ্রুতপদে চলিতেছিল।

এই প্রকারে অতি কষ্টে সে পাঁচক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। যতটা ক্রোধের সহিত বিন্দির মা মৃণালিনীর শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, এখন তাহা অনেকটা উপশমিত হইয়াছিল। দুঃখে অঝোরে তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া মৃণালিনীর পিতাকে বলিয়া আসিয়াছিল যে, যে করিয়াই হউক সে মৃণালিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। তাহার কষ্টের বিশেষ কারণ এই যে, চিন্তামণি

কবিরাজকে চুপি চুপি মৃণালিনীর পিতার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আরোগ্য সম্বন্ধে আশা করা দুরাশা মাত্র !

বিন্নির মা তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃণালিনীর পিতা হরকালী দে হুগলী-জজআদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার বেতন যে বড় অধিক ছিল, তাহা নহে ; তবে হুগলী ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩।৪ ক্রোশ দূরে অমরপুর নামক একটি গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল, তথায়ই স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা লইয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেন।

মৃণালিনী যখন ৮ বৎসরের, তখন গ্রামের সকল লোকেই হরকালীকে বলিত "দাদা তোমার এ মেয়ে পার কোরতে টাকা খরচ হবে না, কত বড় লোকে এসে সেধে মেয়ে নিয়ে যাবে।"

বস্তুতঃ গ্রামে তেমন সুন্দরী কন্যা কাহারও ছিল কি না সন্দেহ। কন্যার প্রশংসা শুনিয়া মৃণালিনীর মাতা কেবল প্রার্থনা করিতেন যে, তিনি "বড়ঘরের" জন্য বড় বিশেষ লালায়িত নহেন, তবে সেখানেই 'মৃনু' পড়ুক—সে সুখী হইলেই যথেষ্ট হইল।

দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে অনেক জায়গা হইতে সম্বন্ধও আসিয়াছিল ; কিন্তু যখন কুলপুরোহিতগণ দুটা পাশ, তিনটা পাশের সম্বন্ধ আনয়ন করিয়া তাহার সহিত দুই তিন সহস্র রৌপ্যমুদ্রার দাবী করিয়া সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিত, তখন হরকালী বাবু চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেন। তিনি দেখিলেন যে পাড়ার লোকে যে বিনাব্যয়ে না হউক, অন্ততঃ অল্পব্যয়েও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা জানাইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কাল বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ ৩৫৲ টাকা বেতনের চাকরি করিয়া যে তিনি এত টাকার চতুর্থাংশও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই !

মৃণালিনী যখন ১০ বৎসরে পড়িল, তখন তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বহু অনুসন্ধানের পর পাণ্ডুয়া ষ্টেশন হইতে পাঁচক্রোশ দূরে——গ্রামে একটি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনরব। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রবোধচন্দ্র এণ্ট্রেন্স পাশ হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওভারসিয়ারি পাঠ করিতেছিল। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সর্ব্ববিষয়েই ভাল ; সুতরাং হরকালী বাবু যখন ১৫০০ হাজার টাকার দাবীর কথা শুনিলেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। আট বৎসর চাকরি করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা এবং পৈতৃক ভদ্রাসনের কতকাংশ বন্ধক দিয়া মৃণালিনীর বিবাহ দিলেন।

হরকালী বৈকুণ্ঠ মিত্রকে ভাল লোক বলিয়া দেখিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রথমে তাঁহার স্ত্রীকে চিনিতে পারেন নাই।

বৈকুণ্ঠ বাবুর স্ত্রী ধনীর কন্যা, এইজন্য স্বামীর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তিনি স্বয়ংই যে একজন বড়লোক, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য বৈকুণ্ঠ বাবু যখন হরকালীর কন্যার সম্বন্ধের কথা তুলিলেন, তখন তিনি নথ নাড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া "সেরেস্তাদারের" মেয়েকে গৃহে আনয়ন করিতে বিশেষ আপত্তি করিলেন, এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা হইলে কি হয়, বৈচি হইতে বসুদিগের বাটি হইতে যে কন্যার সম্বন্ধ আসিয়াছে, তাহা যে লক্ষগুণে ভাল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কারণ তাহারা বড়লোক, সুতরাং "দিইবে থুইবে" ভাল।

কিন্তু শত বাক্যঝঙ্কারেও মিত্রগৃহিণীর আপত্তি টিকিল না। পাড়ায় পাড়ায় যখন রাষ্ট্র হইল যে প্রবোধের মাতার আপত্তি উপেক্ষা করিয়া, বৈকুণ্ঠ বাবু পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তখন অপমানে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য গৃহিণী বারবার বসুন্ধরার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম সুশ্রী বধূটি দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন "টাকা লইয়া কি হইবে? টাকা লইলে এমন বৌ ত হইত না।" কিন্তু পাড়ার সম্মানিতা মহিলাবর্গ, বিশেষতঃ মেজঠাকরুণ আসিয়া যখন হরকালী দের দরিদ্রতার সহিত বসুদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের তুলনা করিয়া, প্রকারান্তরে স্বামীর নিকট মিত্রগৃহিণীর অপমানের কথা উত্থাপন করিতেন, তখন পুরাতন কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহার ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত।

তাহার পর যখন জামাই-ষষ্ঠীর প্রথম তত্ত্ব আসিল, তখন তাহা দেখিয়া গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। যাহারা তত্ত্ব আনিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্ভাষণে অভিহিত করিতে ক্রটি করিলেন না, এবং রথের তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব, চড়কের তত্ত্ব প্রভৃতি হিন্দুদিগের বারমাসের তের পার্ব্বণের প্রত্যেকটিতে যদি মনোমত দ্রব্য না আসে, তবে তিনি যে হরকালীকে "নাকের জলে চোখের জলে" করিবেন—এ প্রকার ভয় দেখাইলেন।

কিন্তু রথ গেল, শীত গেল, দোল ও চড়ক—গেল কোনও তত্ত্বই আসিল না। তাহার উপর যখন প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিত, তখন প্রবোধের মাতার ক্রোধ ও অপমানের সীমা থাকিত না। তিনি বলিতেন "কি কোরব বল, আমার কি দোষ, তখনই বোলেছিলাম—ওরা গরীব, না পায় পোরতে, না পায় খেতে—ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রে কখনও সুখ হবে না।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই "আহা আহা, করিত, এবং তাহার ফলে মেজঠাকরুণ সেদিবস ৪টা আলুর স্থলে ৮টা আলু পাইতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহারা ভাবিত না হরকালী দিবে কোথা হইতে?

বিবাহের কিছুদিন পরেই বৈকুণ্ঠ বাবু অকস্মাৎ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন প্রবোধের মাতার শোকের মাত্রাটা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাহা আপনা আপনি কমিয়া আসিল।

এদিকে কিছুদিন পরে প্রবোধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দারভাঙ্গায় একটা ওভারসিয়ার-পদ গ্রহণ করিল, বেতন ৩০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু তাহার মাতা সকলকে বলিয়া বেড়াইতেন তাঁহার পুত্রের মাহিনা ৮০৲ টাকা। ২০ গণ্ডা টাকা মাহিনার কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনীগণ ধন্য ধন্য করিত, তাহাতে অহঙ্কারে মিত্রগৃহিণীর বক্ষস্ফীত হইয়া উঠিত। তবে এ চাকরীর একটা দোষ ছিল—প্রবোধ বড় একটা ছুটি পাইত না সুতরাং প্রায়ই তাহার বাটি আশা ঘটিত না।

কিন্তু তাহার মাতা ইহাতেও একটা সুবিধা দেখিয়াছিলেন। মৃণালিনী এক বৎসরের পর দিনকতকের নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিল। তাহার কয়েক মাস পরে যখন পুনরায় "ঘর" করিতে আসিল, তখন প্রবোধের মাতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আর শীঘ্র বধূকে পাঠাইবেন না। বিনাবাধায় হরকালী দের প্রতারণার নিমিত্ত তাঁহাকে জব্দ করার ইহাই মহাসুযোগ।

এইজন্য দুই বৎসরের মধ্যে যতবার মৃণালিনীকে লইয়া যাইতে লোক আসিয়াছে, তিনি ততবার তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।

এই প্রকারে শেষবার বিন্দির মা কি প্রকার অপমানিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিন্দির মা চলিয়া যাইবার পর মৃণালিনী অনুচ্চস্বরে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাবার পীড়ার কথা, মার দুঃখের কথা এবং পরিশেষে বিন্দির মার অপমানের কথা ভাবিতে লাগিল! ঝি না খাইয়া এতটা পথ রাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহা তাহার নিকট বড় সামান্য বিষয় বলিয়া বোধ হইল না।

অকস্মাৎ চাতাল হইতে তাহার শ্বশ্রঠাকুরাণী জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন "বলি বৌমা, জল তুল্‌তে হবে না. খালি কাঁদলে ত আর বাপের বাড়ি যাওয়া হয় না—আর আমিও বলি, এমন বাপের বাড়ি যেতে লজ্জাও হয় না, কি বল গা ?"

শেষোক্ত প্রশ্নটি মেজ ঠাকরুণকে করা হইল। বলা বাহুল্য তিনি তখনও অপ্রত্যাশিত আলু পটোলের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এবং মনে মনে বিন্দির মাকে গালি দিয়া ভাবিতে-ছেন, আজ কোথা হইতে এই সর্ব্বধ্বংসকারিণী, অক্ষিখাদিকা, সন্তানবিরহিতার কন্যা আসিয়া এত গোলযোগ বাধাইয়া গেল !

মিত্রগৃহিণীর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তা আর একবার ক'রে বোল্‌তে, সেখানে থাবে কি ? আহা, তুমি মেয়ে বড় ভালমানুষ কি না, তাই এত যত্ন ক'রে খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ।"

গৃহিণী একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর কি করি বল,—গরীবের মেয়ে এসে পোড়েছে, কিন্তু তখনই বারণ ক'রেছিলাম—তা তিনি ত শুনলেন না।"

মেজঠাকরুণ কি করেন, অনেকগুলি অসংলগ্ন "হাঁ" "তা বৈকি" "আহা" শব্দ উচ্চারণ

করিয়া মিত্রগৃহিণীর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন, এবং বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ আহারীয়ের সংস্থান করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন বিপুল কৃষ্ণবর্ণ বপুখানি লইয়া অতিকষ্টে উঠিয়া গৃহান্তরে •লন। গিয়া দেখেন মৃণালিনী তখনও দরজার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে। তাহার আর সহ্য হইল না, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "তুমি বাছা দিনরাত কেঁদে কেঁদে অমঙ্গল ডেকে এনো না! গরীবের মেয়ে গরীবের মত থাক্‌বে, এত বাড়াবাড়ি কেন বল দেখি? তত্ত্ব নেই তাবাশ নেই—আমার কিসে মানসম্ভ্রম থাকে তার দিকে দেখা নাই, তার পরেই হঠ্‌ বল্লেই হঠ কোরে নিয়ে যাবে নাকি? এই ত আজ তোমার বাপের বাড়ির লোকই আমায় সব্বাইয়ের সাম্‌নে কি অপমানটাই না কোরে গেল—এ সব কি তোমার বাপ মায়ের শেখান নয়? ওই যে বলে—"বিয়ের সঙ্গে গোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর"—যাও, ওঠো, রান্নাবান্নার চেষ্টা দেখ—আমি ত তখনই তাঁকে ব'লেছিলাম—!"

মৃণালিনীর প্রতি এ প্রকার সম্ভাষণ আজ নূতন নহে। প্রথম যখন সে শ্বশুরালয়ে আসে, তখন বৈকুণ্ঠ বাবু জীবিত ছিলেন, এবং প্রবোধ তখনও বিদেশে যায় নাই, সুতরাং সকলের নিকট হইতে নববধূজনোচিত সমাদরপ্রাপ্তি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একবৎসরের পর যখন সে আবার শ্বশুরালয়ে আসিল, তখন দেখিল, সমস্ত বিষয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই অজানিত আত্মীয় ও অনাত্মীয়বর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন আদর করিয়া মৃণালিনীর পিতামাতার অদর্শনজনিত কষ্টের লাঘব করিতেন, সে সদাশয় শ্বশুর আর জীবিত নাই! এবং রাত্রিতে যখন সে অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদুস্বরে ও সলজ্জভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাড়ি পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুযোগ করিত, তখন প্রবোধচন্দ্র ব্যাকুল ও গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া বিংশতিবার ঢোঁক গিলিত, এবং নিজের অক্ষমতা সম্পূর্ণ বুঝিয়াও, শীঘ্রই মৃণালিনীকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবে, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিত। কিন্তু এখন আসিয়া দেখিল সে স্বামীও বহুদূরে "ছাইভস্ম" ও "অপ্রয়োজনীয়" কার্য্যে গিয়াছেন। আছেন কেবল শ্বশ্রূঠাকুরাণী—কিন্তু তিনি দিবারাত্র পল্লী মাতাইয়া দেশ কাঁপাইয়া বধূর দোষ এবং তাহার পিতার দারিদ্র্যের কথা ঘোষণা করিয়া অনির্ব্বচনীয় আত্মসুখ লাভ করিতেন।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র, শ্বশুরালয়ে আসিয়া অকস্মাৎ কেন যে তাহাকে এতটা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে, মৃণালিনী প্রথমে তাহার কারণ ভাবিয়া পায় নাই। পল্লীনিবাসিনী সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কথা কহা, দ্রুত বাসন মাজিতে না পারা, প্রতিদিন ১৫ কলসি জল তুলিতে না পারা, রন্ধন করিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলা, এবং "কাক কোকিল ডাকিবার" পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া দুই হাঁড়ি "গোলা" না দেওয়া যে কিসে "বড়মানুষির" লক্ষণ এবং তাহাদিগের সহিত পূজার তত্ত্ব, চড়কের তত্ত্ব, বা আমসন্দেশের যে কি অভেদ্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহার ক্ষুদ্র মস্তিকে তাহা কোন ক্রমেই প্রবেশ করিত না।

তাহার মনে হইত যে, বিবাহের পরও সে দ্বিপ্রহরে কতকগুলি বালিকার সহিত নিজের গ্রামে দত্তদের আমবাগানে অপক্ক আম লবণসহযোগে অনুপম তৃপ্তির সহিত খাইতে গিয়াছে, কতবার সে নন্দীর পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া "ফেনা" তুলিয়া দিয়াছে, কাট্‌না কাটিতে গেলে কতবার তাহার মাতা হাত কাটিয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে সে কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়াছেন, রন্ধন করিবার কথা বলিলে কতবার তাহাকে "ছেলে মানুষ" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, এবং "কানাচে" রৌদ্র আসিবার পরও তাহাকে শয্যা হইতে তুলিতেন না! এই জন্য অতর্কিতভাবে যখন তাহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী রুক্ষস্বরে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে মনে মনে ভাবিল, বুঝি একবৎসরের মধ্যেই তাহার বাল্যচপলতার সমস্ত অজানিতভাবে কোন দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে; বসন্তের পুষ্পময়ী সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে না ভাবিতে যেমন কখন বসন্ত চলিয়া গিয়া কোথা হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ আসিয়া পড়ে সেই রকম যেন কখন মৃণালিনী বালিকা হইতে গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে জানিয়াও জানিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কষ্টে জর্জ্জরিত এবং দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া বিন্দির মা ধীরে ধীরে বিষণ্ণবদনে হরকালী বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

হরকালী মুদ্রিত নয়নে শয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী মস্তকের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতে করিতে চক্ষু মুছিতেছিলেন। দারুণ পৃষ্ঠব্রণ ক্ষতে আক্রান্ত হইয়া তিনি অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছেন, বিশেষতঃ আজকাল কবিরাজের মুখভাব দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া হরকালী দরজার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে ও মেনা এলি? আয় মা—দেখে যা—।"

বিন্দির মা আর থাকিতে পারিল না, বালিকার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল "বাবা, মেনাদিদিকে পাঠালে না—।"

হরকালী ধীরে ধীরে বলিনে "তা ত আমি ব'লেছিলাম। আমি যে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে অগাধ দেনার জলে ডুবেছি—আমার যে বাড়ী বাঁধা—তাকি তার শাশুড়ি জানে না—?"

বিন্দির মা এবং হরকালীর স্ত্রী উভয়েই সশব্দে কাঁদিতেছিলেন।

হরকালী বলিলেন "আর কাঁদছ কেন? অনেক ভেবে চিন্তে দেখে শুনে সোনার পুতুলটিকে দিয়েছিলাম—কে জানে তার শেষ এই হবে? বড় কষ্ট রইল একবার তাকে শেষ দেখা দেখতে পেলাম না—যাবার সময় একবার তাকে কোলে নিতে পারলেম না—সে যে এখনও দুধের মেয়ে—"

বিন্দির মা কাঁদিয়া বলিল "বাবা আর বোল না—।"

হরকালী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"না বোল্লে কি কপাল বন্ধ থাকে? এই যে মেনা হওয়া পর্য্যন্ত কিসে সে সুখে থাকে, দিনরাত তার প্রার্থনা কোরে আসছিলাম তার কি হোল? কপাল—কপাল—। আর আমি চল্লুম কিন্তু কালী যেন মেনাকে চিরসুখিনী করেন—।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় "হরিবোল" ধ্বনিতে ক্ষুদ্র অমরপুর গ্রামখানির পথঘাট প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্র অবধি হরকালীর পত্নী এবং বিন্দির মার রোদনধ্বনি নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছিল।

পাড়ার লোক যে শুনিল সেই চক্ষের জল ফেলিল। হরকালী দরিদ্র হইলে কি হয়, তাঁহার গুণে কি ধনী কি দরিদ্র সকল প্রতিবাসীই মুগ্ধ ছিল; বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত হইল।

লোকে বলে সকলের ত [illegible]গ মৃত্যুসংবাদ গিয়া পৌঁছে, কিন্তু কেহ সংবাদ দিবার ছিল না বলিয়া মৃণালিনী পিতার [illegible]্যুর কথা দিনকতক পরে শুনিল। শুনিয়া কথাটা প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু যখন দুইবার গ্রামের রামহরি ঠাকুরদার পত্রখানি পড়িয়া দেখিল, তখন আর তাহা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আজ বালিকা সমস্ত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া পিতার জন্য বালিব[illegible]র মতই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরকালীর মৃত্যুসংবাদে মিত্রগৃহিণী মনে মনে কতকটা আনন্দ অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, "যেমন সে ফাঁকি দিয়া নির্জের কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিল, তেমনি তাহাকে জব্দ করিয়াছি—নিয়মমত তত্ত্বতাবাস কোর্‌লে—দিলে থুলে, মেয়ের মুখ দেখিতে পাইত, কিন্তু যেমন আমার মাথা হেঁট করিয়েছিল, তেমনি আপশোসে মোরেছে—।"

মৃণালিনী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল এমন সময় তাহার শাশুড়ি আসিয়া বলিলেন "বলি, চেঁচিয়ে যে পাড়ার লোক জড় কোরলে! আরত কারুর বাপ মরে না—?"

মৃণালিনী ঘোমটা টানিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "পায়ে পড়ি—একবার মার সঙ্গে দেখা—।"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী উত্তপ্ত হইয়া বলিলেন আর কোন গরবে সেখানে যাবে? যাক্‌—বলি, অমন কো[illegible]রে চেঁচিও না—চারিদিকে যে শত্তুর হাঁসছে—।"

মৃণালিনী আর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। ফুলিয়া ফুলিয়া সমস্ত দিন মাটিতে শুইয়া কাঁদিল—অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল! মিত্রগৃহিণী সেইদিন পুকুরে স্নান করিতে গিয়া সগর্ব্বে বলিলেন—"আমি অমুখ ঘোষের মেয়ে—আমার চোখে ধুলো দেওয়া? যেমন তত্ত্ব না ক'রে আমার মান রাখে নাই, সেই রকম মেয়ে আটকে রেখে কেমন জব্দ কোরেছি—।"

কতিপয় অনুগ্রহলাভাকাঙ্ক্ষিনী প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা, বলা বাহুল্য তন্মধ্যে আমাদিগের মেজঠাকরুণও ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, তুমি বাছা সেকেলের লোক তুমি আর পার্ব্বে না ? তুমি যেমন বৌকে তাঁবে রেখেছ, এমন কটা লোকে পারে ?

কতিপয় অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূ ঘাটের অপর পার্শ্বে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন আর একজনের গাত্রপীড়ন করিয়া বলিল "মরণ আর কি ? এমন রায় বাঘিনীটাকে যম কি ভুলে রয়েছে ?" এই কথা শুনিয়া অপর কয় জন সমস্বরে ও অনুচ্চে মিত্রগৃহিণীর বদনে অগ্নিদেবের অবস্থিতি প্রার্থনা করিল !

শোক কিছু চিরকালের জন্য নহে। হরকালীর মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম প্রতিবাসীগণ দিন কয়েক দুঃখ প্রকাশ করিয়া একেবারে তাঁহার কথা বিস্মৃত হইল। কিন্তু বিন্দির মা এবং মৃণালিনীর মাতার ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যখন হরকালী পত্নীর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি বংশবন অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রপল্লীখানিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিত, তখন বৃদ্ধাগণ অর্দ্ধসুপ্তাবস্থায় মশককুলের উদ্দেশ্যে বৃথা চপেটাঘাত করিয়া বলিতেন "বড্ড শোকটা লেগেছে, কিন্তু এত বাড়াবাড়িটাও ভাল নয়—।"

বিন্দির মা অনেক বুঝাইয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল, কিন্তু মৃণালিনীর মাতাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। বিশেষতঃ মৃণালিনীকে দেখিবার জন্য তাহার মাতা বড়ই ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, এবং তাহারই জন্য দিবারাত্র অশ্রুজল ফেলিতেন ! হরকালীর মৃত্যুর সময় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অত্যাচারের কথা স্মরণ হইলে, বিন্দির মা নিজের চোখের জলই ধরিয়া রাখিতে পারিত না !

কাঁদিতে কাঁদিতে দুইমাস অতিবাহিত হইয়া গেল ! এখনও মৃণালিনীর মাতা কন্যাকে একবার দেখিবার জন্য প্রত্যহ ক্রন্দন করিতে থাকেন। বিন্দির মা বিধবার সে অনুযোগ আর সহ্য করিতে পারিল না—একদিন অনেক সান্ত্বনা করিয়া মৃণালিনীর মাতাকে বলিল "মা যদি আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে হই, তবে এবার যে কোরে হোক মেনাদিদিকে নিয়ে আস্‌বই আসব—।"

হরকালীর পত্নী আশ্বস্তা হইলেন, কিন্তু কি উপায়ে যে মৃণালিনীকে বিন্দির মা লইয়া আসিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, জিজ্ঞাসা করাতে বিন্দির মাও কিছু বলিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে মৃণালিনী আদৌ সুখিনী হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। এত কষ্টেও যদি সে এক একবার পিতামাতাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহার কোনও দুঃখ থাকিত না।

দুইটা বৎসর মাত্র শ্বশুরালয়ে আসিয়া, তাহার বোধ হইত যেন কতকাল হইল সেই কবে—আসিয়াছে, এতকাল বাবা ও মাকে না দেখিয়া সে কি করিয়া জীবিত আছে ;

এই প্রশ্ন করিয়া সে মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইত! কিসের দোষে যে তাহার কপালে এত দুঃখ, তাহাও সে বুঝিতে পারিত না! আজও তাহার সেই বৈশাখী ব্রতের কথা মনে পড়ে, যখন সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একখানি রক্তাক্ত চেলি পরিয়া ভক্তিভরে তুলসীমণ্ডপের কাছে বসিয়া মাতার সহিত "দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী" হইতে এবং "কৌশল্যার মত শাশুড়ি" পাইবার জন্য কতবার প্রার্থনা করিয়াছিল! হায়, কোথায় গেল তাহার সে ব্রত, কোথায় গেল বা মাতার সেই স্নেহসম্ভাষণ!

সেই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষু বহিয়া জল পড়িত, কেহ তাহা দেখিতে পাইত না; শাশুড়ির তীব্র তিরস্কারে তাহার হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত, কিন্তু কেহ তাহা জানিতে পারিত. না, প্রত্যহ নীরব-রোদনে তাহার বালিশ আর্দ্র দেখা যাইত! এত তিরস্কারেও সে একটি কথাও বলিত না! এই যে জীবনের তেরটা সুদীর্ঘ বৎসর, ইহার মধ্যে সে একদিনও মাতার নিকট তিরস্কৃত হয় নাই, সুতরাং শাশুড়ির চীৎকার তাহার নিকট অভিনব হইলেও, সে ভাবিত বুঝি এই গঞ্জনা সহ্য করা "গৃহিণীত্ব" লাভের অন্যতম উপায়! কিন্তু পিতামাতার দারিদ্র্যের কথা শুনিলে তাহার হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিত; নিজে সে সমস্ত ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মিত্রগৃহিণী যখন সকলকে শুনাইয়া তাহার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া গালি দিতেন, তখন মৃণালিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়টি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইত!

সুদূর প্রবাস হইতে সে মধ্যে মধ্যে প্রবোধের পত্র পাইত—তাহাতে অনেক কথা থাকিত, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠক পাঠিকাবর্গের অত্যধিক কৌতুহলপ্রকাশ করা অনুচিত। তবে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সে একবৎসর ধরিয়া ছুটি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনও মতেই পাইতেছে না, এবং মৃণালিনী যে পত্রের উত্তর দেয় না, ইহার অপেক্ষা অধিক কষ্টের বিষয় নাই।

মৃণালিনী পত্রের শেষভাগ পড়িয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত! সে খুব ভাল লিখিতে জানিত না বটে; কিন্তু যাহাই হউক সে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৫ জায়গা কালির ফোঁটা ফেলিয়া "পোড়া" কলমের দোষ দিয়া, মাথায় কলম পুঁছিয়া ভাল করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য অক্ষরগুলির উন্নতি না হইয়া বরং আরও অবনতি ঘটিত এবং "শ" "স" "ই" "ঈ" "ক" "ব" প্রভৃতি সমবায়সাধন করিয়া "কবে অশীবে আমারর্পনাম যানীবে" এই প্রকারে পত্রশেষ করিয়া পাড়ার ময়রাগৃহিণীর হস্তে সেখানিকে ডাকে ফেলিয়া দিতে বলিত, তথাপি যে কেন প্রবোধ পত্র পান না তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না!

একদিন মৃণালিনী গোপনে মোদকরমণীর নিকট চিঠিখানা দিয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ জল লইতে বাহিরে আসিয়া দেখে মিত্রগৃহিণী ময়রাগৃহিণীর নিকট চিঠিখানা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। অকস্মাৎ বধূকে দেখিয়া শাশুড়ি কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া বলিলেন "চিটি লেখালেখি কি? আজকালকার মেয়ে কি না—লজ্জাও করে না!"

প্রবোধ যে কেন চিঠি পায় না, মৃণালিনী তাহা কতক বুঝিতে পারিল। কিন্তু ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিবার কুবুদ্ধি তাহার এখনও হয় নাই। পাছে নিজের অত্যাচারের কথা পুত্রের নিকট বর্ণনা করে, এই ভয়ে প্রবোধের মাতা বধূর চিঠিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। মৃণালিনী কথনও আভাসেও সেকথা লেখে নাই, সুতরাং ভাবিল বুঝি চিঠি লেখা বড় দোষের কথা। সেই অবধি সে আর কোথায়ও চিঠি লিখিতে সাহস করিত না।

গুরুতর পরিশ্রমে তাহার মধ্যে মধ্যে অসুখ করিত।
পারিতেছে না, এমন সময় শ্বাশুড়ি ঠাকুরাণী বৃহৎ দেহখানি দোলাইতে দোলাইত-
মুখবিকৃত করিয়া বলিলেন "কি গো বড়মানুষের মেয়ে, স্যিয্য যে মাথায় উঠল এখনও ওঠা হয় নি কেন ?"

মৃণালিনী তিন হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিল "আজ অসুখ করেছে—।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী সপ্তমে উঠিয়া বলিলেন "আ মোরে যাই, কি সোহাগ রে—কোথায় একটু সর্দ্দি হয়েছে—তা আর ওঠবার ক্ষমতা নাই! ওঠ রান্নাবান্নার চেষ্টা দেখ, কত আদিখ্যেতাই শিখেছ—তবু যদি হরকালী দে সেরেস্তাদার না হোত।"

এই বলিয়া ভূতল কাঁপাইয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন। আর কিছুতে না হউক, শেষ কথায় পিতার প্রতি বিদ্রূপটা মৃণালিনীর প্রাণে বড় লাগিল। পরলোকগত পিতার স্নেহমুখখানি আবার মনে হওয়ায় অভাগিনী ভাবিল বুঝি মরিলে ইহা অপেক্ষা সুখ পাওয়া যায়! সে ভাবিল অকারণ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গালি প্রদান করার অধিক নৃশংসতা বুঝি আর নাই! আজ আর কাঁদিতে সাহস হইল না—আজ প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি যে করিয়া হউক রন্ধন করিবে স্থির করিল।

অতি কষ্টে উঠিয়া ধীরে ধীরে রন্ধন-গৃহে গেল।

এদিকে মিত্রগৃহিণী চাতালে আসিয়া মেজঠাকরুণকে বধূর দোষের কথা অবগত করাইতেছিলেন, এমন সময়ে রন্ধনগৃহে একটা গুরুভারদ্রব্য পতনের শব্দ হইল। মিত্রগৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "কি বৌমা হাঁড়িটা ভাঙ্গলে ? এমন মেয়েও ত বাছা কোথাও দেখি নি, এই সেদিন পুর্ণিম্মের সময় নূতন হাঁড়ি কেড়েছি—।" এই বলিয়া রন্ধনগৃহের দিকে আসিলেন, ব্যাপারটা কি তাহা দেখিবার জন্য মেজঠাকরুণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

আসিয়া দেখেন, মৃণালিনী অচৈতন্য হইয়া মেজের উপর পড়িয়া আছে। মেজ ঠাকরুণ আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি আসিয়া মুখে জল দিতে লাগিলেন—গায়ে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন "ও বাবা গা যে পুড়ে যাচ্ছে, এ যে কাঠফাটা জ্বর হোয়েছে।"

মিত্রগৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "হাঁ জ্বর হবে কেন ? সব ভিরকুটি" মেজঠাকরুণ আজ আলুপটোলের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ছিঃ ছিঃ এই

দুধের মেয়ে—তাকে এত জ্বরে এমনি ক'রে খাটান ?" তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে মৃণালিনীর চেতনা হইল, ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া চারিদিকে দেখিল, মেজঠাকরুণ দেখিলেন চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ।

অতি যত্নে মেজঠাকরুণ মৃণালিনীকে শয্যাগৃহে শয়ন করাইয়া দ্রুতপদে পাড়ার প্রাচীন লোকনাথ কবিরাজকে ডাকিয়া আনিলেন। কবিরাজ দেখিয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন—পীড়া

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বধূর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী যে আদৌ চিন্তিত বা দুঃখিত হইলেন তাহা নহে, কারণ "বড়ঘরের" সহিত কুটুম্বিতা করিবার আশাটা তিনি তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মেজঠাকরুণের শুশ্রূষায় এবং লোকনাথ কবিরাজের চিকিৎসায় মৃণালিনী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন জনৈক প্যায়দা একখানা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি ইংরাজিতে লিখিত ; গ্রামের জয়কৃষ্ণ মুহুরি ইংরাজি জানেন। তাঁহার দ্বারা চিঠিখানা পড়ান হইল। চিঠির ভাবার্থ জানিয়া মিত্রগৃহিণী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চিঠিখানি কোনও উকীলের প্রেরিত—তাহার ভাবার্থ এই যে, বৈকুণ্ঠ বাবু জীবিতাবস্থায় একটা কোম্পানীর অধীনে ৫০০০ হাজার টাকার একটা কনণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। কিন্তু টাকা আদায় করিয়া কোম্পানীর নিকট তাহা জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ এতদিন পরে তাঁহার চাতুরী ধরা পড়িয়াছে, অতএব যদি তাঁহার পুত্র অথবা অপর কেহ এক মাসের মধ্যে উক্ত টাকা না পরিশোধ করেন, তবে প্রকাশ্য আদালতে মোকদ্দমা আনীত হইবে।

মিত্রগৃহিণী বিশেষ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে প্রবোধের নিকট সংবাদ প্রেরণ করাই স্থির হইল। ঘটনাটি বিবৃত করিয়া তাহাকে অবিলম্বে আসিতে বলা হইল, এবং তাহার সহিত লেখাও হইল যে, বধূমাতার গুরুতর পীড়া। আজ রোগ হইবার দেড় মাস পরে প্রবোধের নিকট মৃণালিনীর পীড়ার সংবাদ প্রথম প্রেরিত হইল। মিত্রগৃহিণী চিঠি লেখাইবার সময় নাকি বলিয়াছিলেন "বৌমার অসুখের কথাটা লিখিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি জানি আজকালকার ছেলে বাপমাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করে না, বৌই হোল সৰ্ব্বস্ব।"

প্রবোধ যথা সময়ে পত্র পাইয়া ছুটির জন্য আবেদন করিল, কিন্তু ছুটি না পাওয়াতে অগত্যা কার্য্যে জবাব দিয়া বাড়ি আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির! মৃণালিনীকে দেখিলে আর চিনিতে পারা যায় না। মেজঠাকরুণ গোপনে প্রবোধকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, কষ্টে ও অভিমানে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

এত যে বড় হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত প্রবোধ মাতার কথায় বা কার্য্যে কখনও প্রতি

বাদ করে নাই। আজ কিন্তু সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গম্ভীরভাবে কম্পান্বিত কণ্ঠে বলিল "মা, এতদূর হোয়েছে? বাবা যাবার আগে কি ব'লে গেছলেন মনে পড়ে না? ছিঃ—ছিঃ এত কর কার জন্যে?"

প্রবোধের মাতা এতটা প্রতিবাদ ও তিরস্কার পুত্রের মুখ হইতে কখনও শুনেন নাই, অথচ নিজের দোষ বুঝিয়া কিছু বলিতেও সাহস করিলেন না।

মেজঠাকরুণ গ্রামসম্পর্কে প্রবোধের "দিদিমা" হয়েন সুতরাং তিনি যে সেই দিন রাত্রে প্রবোধের ঘরে "আড়ি পাতিয়াছিলেন" তজ্জন্য কোনও সুরুচিপ্রিয়া মহিলা দোষ দিতে পারেন না। তাহার ফলে মেজঠাকরুণ পরদিন ঘোষণা করিলেন যে প্রবোধচন্দ্র সমস্ত রাত্রি মৃণালিনীকে জাগ্রত রাখিয়া এবং আরব্যোপন্যাসের ন্যায় সুদীর্ঘ গল্প করিয়া বধূর পীড়া বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবং মার্জ্জনাভিক্ষার উপযোগী যেন কতকগুলি অস্পষ্ট কথাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে।

অনেক আপত্তি ও পরামর্শের পর মাতাপুত্রে স্থির করিলেন যে, মোকদ্দমা হইবার পূর্ব্বেই দাবী অনুযায়ী টাকা শোধ করিয়া দেওয়া উচিত। প্রবোধ পিতাকে চিনিতেন সুতরাং তাঁহার দ্বারা যে এ অন্যায়াচরণ হয় নাই, তাহা তাহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে অপরে তাঁহার স্কন্ধে যে দোষ দিতেছে, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু ইহার জন্য মোকদ্দমা করিতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না—তাহাতে অধিক অর্থব্যয় হইতে পারে এবং তাহার সহিত দেশময় কলঙ্কও রটিবে।

ইতিমধ্যেই স্বগ্রামে যে কলঙ্ক রটিতে বাকি ছিল, তাহা নহে। বৃদ্ধগণ দ্বিপ্রহের গাছের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় বসিয়া "কচেবারোর দান" ফেলিতে ফেলিতে বলাবলি করিতেন, "তখনই বলেছিলাম, বৈকুণ্ঠ মিত্রের এতটাকা হোল কোথা থেকে?"

মিত্রগৃহিণী যে কোথা হইতে ৫০০০ হাজার টাকা জোগাড় করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। নিজের যে কয়খানি গহনা আছে এবং নগত টাকা যাহাও বা আছে, সমুদয় একত্রিত করিলে ৩০০০ হাজার টাকারও অধিক হইবে না। বাকি দুইহাজার আসে কোথা হইতে? অগত্যা বাড়ীখানি বিক্রয় করাই স্থির হইল। মিত্রগৃহিণী দেখিলেন আজ এত কালের "বড় মানুষি" বুঝি ধরা পড়ে।

তাহারও বড় বিলম্ব হইল না। এক মাসের মধ্যে দশদিন আছে মাত্র, সুতরাং ইহারই মধ্যে যাহা হউক একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রবোধ একদিন সকালবেলায় পাড়ার জনকয়েক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির নিকট গিয়া বাড়ী বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। একজন বাড়ী ক্রয় করিতেও স্বীকৃত হইলেন।

সেইদিন বৈকালেই পাড়ায় পাড়ায়, পুষ্করিণীতে পুষ্করিণীতে, মাঠে হাটে রমণীকমিটির অধিবেশন হইয়া গেল; সেগুলি হইতে যে সমস্ত শ্লেষ ও বিদ্রূপের প্রস্তাব "পাশ" হইল, তাহা সমস্তই যথাযথরূপে মিত্রগৃহিণীর কর্ণে উঠিল। মিত্রগৃহিণী লজ্জায় মরিয়া গেলেন, এক

একবার ভাবিতেছিলেন, এত অপমান সহ্য করার অপেক্ষা গলায় দড়ি দিয়া মরিলে সব যন্ত্রণার শেষ হয়।

পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইবার আর উপায় নাই;—একদিন স্নান করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু যখন তিনি ঘাটে পৌঁছিলেন, দেখিলেন তাঁহার পরিচিতা সকল মহিলাই কি আলোচনা করিতেছিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চুপ করিয়া গেল। যাহারা প্রত্যহ তাঁহাকে ডাকিয়া কথা কহিত, আজ তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইল না।

একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে শুনাইয়া বলিল, "ওমা এত অহঙ্কার—এত ঠেকার, কেবল বাহিরে শুনতেই এত এত—কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার দেনা শুধতে বাড়ী ঘর গয়নাপত্তর বিকিয়ে যায়? গলায় দড়ি।"

অপর একজন বলিল, "গলায় দড়ি ব'লে দড়ি। তখন যে গরবে ভুঁয়ে পা পড়্‌তো না, এখন যে পথের ভিখিরি"—আর একজন বলিল, "তা বৈকি জুচ্চুরির পয়সা কি ভোগে হয়? ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্ম আছে।"

যুবতী মহলে বলাবলি হইতেছে, "আমরা ত তখনই বলেছিলাম ওর বড়মানুষি সব ভুয়ো, গরীবের মেয়ে—গরীবের মেয়ে ব'লে অমন সোনার চাঁদ বৌকে কি না যন্ত্রনাটা দিয়েছে! এখন?"

মিত্রগৃহিণী সমস্ত শুনিলেন। ক্ষোভে ও অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া বাড়ী আসিলেন, আসিবার সময় পথে যাহার সহিত দেখা হইল, সেই মুখ ফিরাইয়া দশ হাত দূর দিয়া চলিয়া গেল। যাহারা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লইত, মেজঠাকরুন ছাড়া অপর সকলেই আসা বন্ধ করিয়াছে।

আজ এতদিন পরে লজ্জায় ও অপমানে মিত্রগৃহিণীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। যে মস্তক উন্নত করিয়া তিনি সগর্ব্বে বেড়াইতেন, দেখিলেন আজ বজ্রাঘাত হইয়া সে মস্তক অবনত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, আজ তাহারাই এই মহাসুযোগ পাইয়া প্রকাশ্য বিদ্রূপের দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দিতেছে, অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অহঙ্কারের উপযুক্ত প্রতিশোধ হইয়াছে; তিনি এতদিন যে সকলকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছিলেন, লোকে তজ্জন্য তাঁহাকে রীতিমত শাস্তি দিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ হরকালী দের মৃত্যুর কথা স্মরণ হইল। তিনি যে কতবার তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, তত্ত্বের নিমিত্ত উৎপীড়ন করিয়াছেন, গরীবের কন্যা বলিয়া অকারণ বধূকে যন্ত্রণা দিয়াছেন সে সব কথা একে একে মনে হইল। মনে হইল তিনি এই অর্থের জন্যই বধূকে ইহসংসার ত্যাগ করাইতেছিলেন। এই অর্থের জন্যই পিতার মৃত্যুর সময় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও দেন নাই। শেষ কথা স্মরণ হওয়ায় ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল যেন হরকালী মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিতেছেন!

কোনও গুরুতর মানসিক পীড়া না হইলে মানুষ অনেক সময় নিজের দোষ দেখিতে পায় না। আজ নিজের দারিদ্র্যের কথার সহিত পূর্ব্ব অত্যাচার ও অহঙ্কারের কথা স্মরণ হওয়ায় মিত্রগৃহিণীর ভীষণ অনুতাপ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বধূর নিকট গেলেন।

মৃণালিনী আরোগ্যলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বড় রুগ্ন। সে ঘরের দরজার কাছে বসিয়া একমনে সিকা বুনিতেছিল। মিত্রগৃহিণী তাহার নিকট গিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "মা তোকে বড় কষ্ট দিয়েছি।" আর বলিতে পারিলেন না।

মৃণালিনী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল শাশুড়ির চক্ষে জল। এমন দৃশ্য সে কখনও দেখে নাই। কতক বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে দুই হাত ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ির পায়ে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইল। মিত্রগৃহিণী সস্নেহে বধূর গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী এতদিন তোমায় চিন্‌তে পারি নি।"

ঠিক এই সময়ে প্রবোধ বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ব্যাপারটা যে কি তাহা অনুমান করিল। প্রবোধকে দেখিয়া মৃণালিনী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে পলায়ন করিল।

প্রবোধের মাতা অল্প হাসিয়া বলিলেন "চল্ বাবা, এখন রাস্তায় ভিক্ষে ক'রতেও আমার কষ্ট হবে না। তবে এই কয়দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে বৌমাকে একবার অমরপুরে রেখে আস্‌তে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উক্ত ঘটনার তিনদিন পরে সকাল বেলায় বৈকুণ্ঠ মিত্রের বাড়ির দরজা হইতেই একটি বামাকণ্ঠ বাড়ী কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কৈ গো, বাড়ির লোকেরা কোথায়?"

মিত্রগৃহিণী ঘর হইতে বলিলেন "কে গা?" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন ৪ জন চাকর ও ৩ জন ঝি ভারে ভারে আম, সন্দেশ, মাছ, দধি, ক্ষির ইত্যাদি নাবাইতেছে। গৃহিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী ভুল হোয়েছে, বাছা এ বাড়ী নয়।"

এমন সময় কোথা হইতে বিন্দির মা কাপড়ে ঢাকা রেকাবখানা হাতে করিয়া আসিয়া বলিল "হাঁ হাঁ এই বাড়ী; হরকালী দের বেহানের বাড়ী কি ভুল হবার যো আছে?"

প্রবোধের মাতা লজ্জিত হইলেন, সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু আজ তত্ত্ব লইবার আকাঙ্ক্ষা আর তাঁহার নাই। তিনি সযত্নে বিন্দির মাকে বসিতে বলিলেন।

যখন অবিরাম ক্রন্দনে উত্যক্ত হইয়া বিন্দির মা মৃণালিনীকে যে করিয়া হউক মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন তাহার মনে মনে একটা মতলব ছিল। যদি কখনও "মেনাদিদির" কাছে যাইতে হয়, তাহা হইলে রিক্ত হস্তে যাইবে না—ইহা তাহার স্থির ছিল। অবশেষে সে নিজের সিন্দুক খুলিয়া বহুকালের ও বহুযত্নের সঞ্চিত

৪০ টাকা বাহির করিল ;—এবং মৃণালিনীকে আনিতে যাইতেছে ইহা ভিন্ন আর কিছু না বলিয়া সে গোপনে গ্রামের সাতজন লোক সংগ্রহ করিয়া এবং সেই ৪০ টাকা লইয়া হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখান হইতে ৪০ টাকার আম, সন্দেশ, মৎস্য, দধি, ক্ষীর, কাপড় কিনিয়া সাতজনের স্কন্ধে চাপাইয়া মৃণালিনীর শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। পথে ভাবিতে ভাবিতে গেল "এবার এই তত্ত্ব নাকের উপর ধরব, মাগীকে আচ্ছা ক'রে গালাগালি দেব, আর ঢাক ঢোল নহবৎ বাজিয়ে পাল্কী কোরে মেনাদিদিকে নিয়ে আসব।"

শ্বশুরালয়ে আসিতে আসিতে পথে মৃণালিনীর শাশুড়ির ভাবী দুরবস্থা এবং মৃণালিনীর গত পীড়ার কথা শুনিয়া বিন্দির মা চমকিত হইল। মৃণালিনীর অসুখের কথা শোনে নাই, তাহার কারণ যে, কেহ সংবাদ পাঠায় নাই।

বিশেষতঃ মৃণালিনীর শাশুড়ির দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া সে আন্তরিক দুঃখিত হইল। একবার ভাবিল এরকম সময় আর এ তত্ত্ব লইয়া গিয়া কাজ নাই। আর একবার ভাবিল দেখি গিয়া মাগীর অহঙ্কার এখনও আছে কি না। অবশেষে যাওয়াই স্থির হইল।

গিয়া দেখিল মৃণালিনীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী আর সে "লোক" নাই। উভয়পক্ষেই অনেক ক্রন্দন অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা হইল, মৃণালিনীর ক্রন্দনের অনেক কারণ ছিল সুতরাং সে অনেকক্ষণ চক্ষের জল ফেলিল।

অবশেষে একদিন থাকিয়া বিন্দির মা পাল্কী করিয়া মৃণালিনীকে দিনকয়েকের জন্য অমর-পুরে লইয়া গেল।

যাইবার সময় মনে মনে বলিল "দর্পহারী মধুসূদন আছেন। ঠিক তার শাস্তি পেয়েছে" এবং চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিয়া গেল, "দুজন ভাল গণকে হাত দেখে বোলে গেছেন আমার মেনা যে ঘরে প'ড়বে সে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাক্‌বে ; আমি এই ব'লে গেলাম আবার যদি তোমাদের ভাঙ্গা ঘরে লক্ষ্মী না ফেরে, তবে যেন আমার গলায় দড়ী দিয়ে ম'র্‌তে হয়।"

* * * *

দুই দিন পরেই বিন্দির মার কথা সত্যে পরিণত হইল।

প্রবোধ পুনরায় এই মর্ম্মে একখানি উকীলের পত্র পাইল যে, পরে অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গেল, যে, বৈকুণ্ঠ বাবুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা, এবং এ প্রকার অপবাদের জন্য কোম্পানী দুঃখিত।

প্রবোধ প্রথম কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দিনকয়েক পরে বর্দ্ধমান মিউ-নিসিপালিটির অধীনে ১০০ শত টাকা বেতনের একটা ওভারসিয়ারি প্রাপ্ত হইল, সুতরাং প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া বাড়ী আসিত।

প্রবোধের মাতা বধূর গুণে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং দিবারাত্র স্নেহসম্ভাষণে তাহার যত্ন করিতেন।

বিন্দির মা যখন তখন "মেনাদিদি"কে অমরপুরে লইয়া যাইত, কিন্তু সে বহুদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বের কথা ভুলিতে পারে নাই। যখনই সে কথা ভাবিত, তখনই যেন সে হরকালী দের মৃত্যুর শেষাবস্থার সহিত জামাইষষ্ঠী, পূজার ও শীতের তত্ত্বের কি একটা নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইত।

এখন সে বিষণ্ণবদনে গলার সোনার দানাটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, তত্ত্বের ও তত্ত্বাভিলাষিণী শ্বশ্রূঠাকুরাণীবর্গের বদনে কাল্পনিক অঙ্গারের ব্যবস্থা করিয়া, মানসিক সন্তোষলাভ করে।

কদম্ব-সুন্দরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হে পান্থ, একান্তে এই যমুনা-পুলিনে,
চারিধারে প্রকৃতির গরিমা-ঐশ্বর্য্য,
কি আশ্চর্য্য, হের এই কদম্ব-তরুটি
কি বিশাল!—অশ্বত্থের অন্তরের বন্ধু!
ভীম কান্ত সৌন্দর্য্যের একি সমাবেশ!
কাননলক্ষ্মীর যেন বিরাট স্বপন!
সৌখিন, সৌন্দর্য্য প্রিয় যেন কোন দৈত্য
পালিয়াছে নিজহস্তে এ যাদু-দুলালে!
কেলি কদম্বের কুঞ্জ যমুনার ধারে
কি সুন্দর! মনোহর দেব-ব্যূহ যেন!
চারিধারে উচ্চশির সেনার মণ্ডলি;
তারি মাঝে রাজে এই কদম্ব তরুটি,
মদনমোহন-কান্তি দেবসেনাপতি!
তরুটির পাদমূলে, ধবল মর্ম্মরে,
দেখিছ না? দেবেন্দ্রের অপ্সরা-স্বপন!
বিচিত্র পাষাণ-মূর্ত্তি! সীমন্তে সিন্দুর
পাষাণীর, পা দুখানি অলক্তে রঞ্জিত!
গলে বরগুঞ্জমালা!—কদম্বের কুঞ্জ
হয় যবে কুসুমিত, পাণ্ডারা সোহাগে,
শ্রীঅঙ্গে মাখায়ে মরি পুষ্পরেণু কণা,
করে এই অঙ্গনারে পুষ্প-আভরণা!
দুই কর্ণে দেয় মরি কদম্ব-ঝুমুকা
দোলাইয়া; গলে দেয় কদম্বের মালা;
বিরচিত কদম্বের পেলব পল্লবে
সর্ব্বাঙ্গে পরায়ে দেয় কদম্বের শাড়ি!
আহা মরি, ফুল-কঙ্কণে, ফুল-নূপুরে
পুষ্পময়ী, চির-আনন্দে আনন্দময়ী,
কে গো এ বসন্ত-লক্ষ্মী বাসন্তী বসনে
এ ব্রজ-ভবনে?
ব্রজের এ মৌন-বধূ;
এত' নহে কিশোরী বালিকা, মুকুলিতা
রূপের কলিকা, বাল-রাধিকার সখী!
এ নহে রাধিকা; পাষাণ প্রতিমা মাঝে
কোথা সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি? হেরি
যাহা, সারা ব্রজ করে পূজা, "জয় রাধা"
"জয় রাধা" বলি!—প্রৌঢ়ার এ সাজ নহে,
এ নহে যশোদা!—বিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে
হের, যুবতী-লাবণ্য, যুবতীর ভূষা!
দেখিছ না? কি উচ্ছ্বাস কনক-কলসে
উরসের, কি উচ্ছ্বাস বদন-মণ্ডলে!
হের কিবা গ্রীবা-ভঙ্গী! তরঙ্গ উথলে
লাবণ্যের, রাজ-হংসী যমুনার জলে!

ইহারি নাম কদম্ব-সুন্দরী! গোপীর
এ মূর্ত্তি! রাধার সখী! শুনিতে কি চাহ
তাঁর এ প্রতিমা কেন? শোন মন দিয়া
শ্রবণ-ললাম সেই সুন্দর কাহিনী!

* * *

বহুদিন, বহুদিন গত; এক দিন
এই বৃন্দাবনে, বঙ্গের মৈথিল কবি
বিদ্যাপতি, এসেছিলা তীর্থ-দরশনে!
আদরে যতনে তাঁরে সুচতুর পাণ্ডা
দেখাইল কুঞ্জে কুঞ্জে, বিপিনে বিপিনে,
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি, ভক্তের বাসনা!
একি সেই নব বৃন্দাবন? আহা মরি
চির সাধের স্বপন, কবির!—নবীন
তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল!
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
আকুল নব অলিকুল! নব শোভন
নিকুঞ্জে, মরি, নব নব প্রেম-বিভোর
একি সেই বৃন্দাবন? নব যুবরাজ
নবীন নব নাগরী সহ, নিতি নিতি
মিলিয়ে নবীন ভাতি, যথা বিহরিত
নবীন কিশোর?
একি সেই বৃন্দাবন?
যথা, রসময়-রাস-রভস্-রস-মাঝে
মরি-, ঋতুপতি রাতি রসিক-বর রাজে!
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই,
রাস-রসিক সহ রস অবগাই;
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গ হি নটই,
রণরণি কঙ্কণকিঙ্কিণী রটই*
বিদ্যাপতি কবি আনন্দ-সায়রে মগ্ন,
মুখে নাহি বাণী!—তাঁর চির জীবনের
স্বপ্ন, হইল সফল! কবির উজ্জ্বল
আঁখি, হইল আরো উজ্জ্বল! প্রীতি-মুগ্ধ
কবি, হইয়ে অজ্ঞান (প্রাণের মধুর
কনক কটোরা ভরি) করিলেন পান
ব্রজের অমিয়া! তুই সুচির-যৌবনা
অয়ি ব্রজভূমি! তোর রূপ পানে ভোর
বহিল কবির নেত্রে পুলকের লোর!

* * *

অয়ি ব্রজ ভূমি, চিরদিন, চিরদিন,
তুই, প্রেম-পিপাসিতা! বাহু-আলিঙ্গনে
বাঁধিলি কবিরে তাই নিবিড় বন্ধনে!
দোঁহার তুলহ দুহুঁ দরশন ভেল,
বিরহজনিত দুঃখ সব দূরে গেল!
চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল,
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল!
নয়ন ঢুলাঢুলি, লহু লহু হাস,
অঙ্গ হেলাহেলি, গদগদ ভাষ!

* * *

হেরিলা স্বচক্ষে কবি, সেই বৃন্দাবন,
গোবিন্দের লীলা-নিকেতন, আহা যথা
গোবর্দ্ধন গিরি হ'তে প্রেমের ঝরণা
ঝর্ ঝর্ ঝরে, কি নিদাঘে, কি বসন্তে;
মরি আদি অন্তহারা মন্দাকিনী-পারা!
আহা সেই পূতবারি, দারুণ ঝঞ্ঝনা,
সর্ব্ব দারুণ যন্ত্রণা, ভয়-দুঃখ-হারী!
ব্রজ-নর-নারী, প্রেম-ঝরণার তটে,
মন্দিরের সন্নিকটে, নয়ন মুদিয়া,
"জয় জয় রাধাবিনোদিয়া" বলি, পিয়ে
সেই বারি, রাত্রি দিবা, আপনা বিসারি,
কবিও করিলা পান অঞ্জলি পূরিয়া!
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি হেরিয়া হেরিয়া,
কুঞ্জে কুঞ্জে চলিলা ছুটিয়া! সারাদিন

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

চিত্তহারিণী ব্রজকাহিনী, পাণ্ডা-মুখে
শুনিয়া শুনিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে বঙ্গকবি
চলিলা ছুটিয়া, হর্ষে উধাও অস্থির !
রঙ্গে ভঙ্গে গাহিতে গাহিতে গোষ্ঠগীতি
বালগোবিন্দের, কভু যশোদামাতার
প্রীতির গীতি, হাসির কথা, রঙ্গ-গাথা
ক্ষীর-সর-নবনী-চোরের !
কভু কবি
গীত গাহি বলে, কোন্ ছলে, শ্রাবণের
নব জলধর (রঙ্গিণী দামিনী ধনী,
ক্রোড়ে বসি, পরামর্শ দেয় তার কাণে !)
ছেয়ে ফেলে কুঞ্জবনে ঘোর অন্ধকার
বিতানে বিতানে—অবিরল বৃষ্টিধারা
পাতে, অবিরল ঝঞ্ঝা-বাতে, গোপ গোপী
বৃন্দে, করিয়া অস্থির, খেদায় নিকুঞ্জ
বন হ'তে !—শুধু আহা দুষ্ট জলধর
(দামিনীর নর্ম্ম-সখা, শঠ শিরোমণি !)
ফেলে না জলের কণা সে নিকুঞ্জবনে,
যথা মরি শ্রীরাধিকা, সখী ছাড়া হয়ে,
দাঁড়াইয়া বিনোদিনী, একা, একাকিনী
গুরু গুরু গরজনে দুরু দুরু করি
কাঁপে হিয়া, ত্রস্ত বাস, আকুল-কুন্তলা,
বিপদ-বিহ্বলা !—হাস্যমুখে, বনমালী,
সুযোগ পাইয়া, তথা মিলিলা আসিয়া !
মোহন মালিকা হয়ে, বাহু আবেষ্টিয়া,
কণ্ঠ তাঁর বেড়িল রাধিকা, মরি মরি
তমালে বেড়িল যেন সুবর্ণ লতিকা !
রসবতী রসিক শিরোমণি পাশে
মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে।
চন্দ্রবদনী ধনী, কানু চকোর,
নব বারিদে জনু চাতক ভোর।
হির মিলনে প্রিয় অতি উতরোল,
ধক্ ধক্ অন্তর, গদ গদ বোল !*

কভু কবি গীত গাহি বলে "কালিন্দীর
কালো জলে নামিয়াছে উলঙ্গিনী বেশে
গোপিনীরা মহোল্লাসে ! (বিবিক্ত প্রদেশে,
যমুনা-পুলিনে, 'নারী-ঘাট" সেই !—যথা
পুরুষের যাইবার নাহি অধিকার)
কি মধুর জলক্রীড়া ! এ উহার গাত্রে
ফেলিতেছে জল। কলকণ্ঠে, হাস্যালাপে,
সুখ কথা, প্রেম কথা, মিলনের কথা,
দম্পতি-বিবাদ, মানের সংবাদ, কত
কথা, কত কথা বলে ! এ উহার অঙ্গে
পড়ে ঢলে ; নিত্য নব রঙ্গের রঙ্গিণী,
যমুনা-তরঙ্গে কেশের তরঙ্গ ঢালি,
বন হরিণীর মত জলের নিকুঞ্জে
বেড়ায় ছুটিয়া !—কম্বু-বিনিন্দিত গ্রীবা
নানাছন্দে, জলে কাঁপাইয়া, শ্রেণী বাঁধি
যমুনাজলহংসিনীর মত, ভাসিতে
ভাসিতে, কতই রঙ্গে যায় সাঁতারিয়া !
কুমুদিনী, কমলিনী, নলিনীর মত
নারী-মুখ-শতদল দেহের মৃণালে
যমুনার জলে, কি সুন্দর !—হে স্বর্গের
অপ্সরারা, আয় তোরা, আয় দেখে যারে,
অপরাজিতার সাথে, সন্ধ্যা মায়াবিনী
গেঁথেছে চম্পকমালা এক পুষ্পহারে !
* * *
হৃদয়ে ধরে না ধৈর্য্য ! একি এ অসহ্য
যৌবন-আবেগ ! আজি নীবীবন্ধ সাথে
খুলিয়া গিয়াছে যেন সমস্ত বন্ধন !
চঞ্চল ও বাহুমূলে, তপ্ত বক্ষতলে,

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

অস্থির চরণে, অঙ্গের লাবণ্যরাশি
কোন্ মন্ত্রবলে, আজি হইয়ে তরল
মিশি গেল, এই চির ঢল ঢল নীল
কান্তি, চঞ্চল তরল যমুনার জলে !
মধুর দৌরাত্ম্য হেরি, কক্ষের কলসী
ভাসিয়া চলিয়া যায়, উধাও, অস্থির !
ধনী তারে কঙ্কণের মৃদু কিনি কিনি
করি, টানি আনে ; আহা পাইয়া আঘাত,
অভিযোগে কলসী কাঁদিয়া বলে "উঠ
সখি, চল , ছিছি আলি, একি নাগরালি !"

* * *

স্নানান্তে পুলিনে উঠি মগনা নগনা
গোপাঙ্গনা, দাঁড়াইল বস্ত্র পরিবারে !
একি লীলা ! শূন্য ঘাট ! কোথায় বসন ?
হের, হের, খোঁজ খোঁজ ! কোথায় চুনরি ?
কোথায় ঘাঘরি ? কোথা গেল শাড়ি ? কোথা
রূপালি আঙ্গিয়া ? কোথা সোণার কাঁচলি ?
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল যেন রে
ব্রজে, গোপীদের মাথে !—ছি ছি কি লাঞ্ছনা !

* * *

কে গো ওই বাজায় মুরলী ? তরুতলে
ত্রিভঙ্গমূরতি ! শ্যামল জলদ কান্তি !
একি রূপ ! পীতাম্বর, মদন মোহন !
হেরি তারে গোপিনীরা যে যেথানে ছিল
পলাইল রড়ে জলের ভিতরে ! লাজে
আকণ্ঠমগ্ন হয়ে, বিহ্বলা গোপাঙ্গনা
ঢাকিল সুতনু ! একমাত্র নারী তথা
দাঁড়ায়ে রহিল ! যমুনা-পুলিন হ'তে
নাহি সে সরিল !

সে কি লাজহীনা ?

তুমি কি জান না, পাপ-গন্ধর্ব্বের কন্যা
অবলজ্জা ! সদা সে গো সাজসজ্জাময়ী
বসন ভূষণ প্রিয়া !—বসন হারালে
তিলমাত্র, গাত্র তার দহে ! অঙ্গ তার
কাঁপে শিহরি শিহরি ; চক্ষে হায় হেরে
অন্ধকার ! কাঁদি কহে, গুমরি গুমরি,
"কি হইল ! হায় কি হইল ! হে ধরিত্রি
হও গো বিদীর্ণা , পশিব তুহার মাঝে,
আমি উলঙ্গিনী !"

উলঙ্গিনী শ্রীরাধিকা

নয়ন মুদিয়া রহিলা দাঁড়ায়ে ; জলে
নাহি গো পশিলা ! বংশীধর পীতাম্বর
পানে, জোড় হস্ত করি, কহিলা "হে হরি,
একি এ লীলা আজি তব ? তোমার নাম
দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ! আজি কিন্তু
কেন নাথ, ভুলে গেলে পূর্ব্ব-আচরণ ?
বস্ত্র হরি নিলে ; এবে তাকাইতে তব
পানে, হবে লজ্জা !—নাথ এই কি বুঝেছ
আমি আর, নয়ন খুলিয়া, তব পানে
চাহিতে নারিব ? তব পদে হ'ল দীক্ষা,
এতকাল করিলাম প্রেমশিক্ষা ; বল
তার, দয়াময় হরি, এই কি পরীক্ষা ?
জান না কি এই দীনা রাধা
ভুবন ঈপ্সিত রূপ শ্যামেরি হৃদয় আধা ?
মুদিলেও এ নয়ান
জ্বলে আঁখে ও বয়ান
ও মূর্ত্তি-দর্শনে তবে কেমনে গো দিবে বাধা ?*
লাজে মরি, ছি ছি, একি রীতি !—বস্ত্রচোর !
থাক তুমি বস্ত্র লয়ে। আমি মনোচোরে
লয়ে, এই ভাবে, উলঙ্গিনী নারী-বেশে
পশিব নগরীমাঝে ! হে ব্রজরঞ্জন
থাকে যদি ধর্ম্ম, আর আমার সুকর্ম্ম

* পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী "দেবীর কবিতা ও গান" কাব্যের "বলি শোন্ খুলে" কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

থাকে যদি ; বিশ্বনাথ, অগতির গতি,
থাকে যদি মতি, তব পদে, ব্রজমাঝে
অদৃশ্য হইয়া পশিব, হেরিব চক্ষে
সবারে! আমারে কিন্তু কেহ না হেরিবে!
ওহে নিখিলের স্বামী, তুমি মম স্বামী,
আমি কি গো হেথা, দীনা ভিখারিণী হয়ে,
থাকিব দাঁড়ায়ে—তুচ্ছ বসন-অর্থিনী?
নয়নে গরল রাখি, অধরেতে মধু,
নাহি কি ভকতি বঁধু হৃদয়-সরোজে?"
এত বলি প্রেমময়ী রাধা বিনোদিনী
চলিলা নগর-পথ দিয়া, উলঙ্গিনী
সাজে! আহা চরণের, নূপুর-শিঞ্জিনী
ঝিমরি ঝিমরি বাজে! আহা শ্রীঅঙ্গের
কঙ্কণকিঙ্কিণী করে কলরোল, তারা
উতলা পাগল, গৃহে গেলে যেন বাঁচে!
তারা বলে বার বার "ওগো সহচরি,
লাজে হানি বাজ, চল চল গৃহকাজে!"

* * *

প্রেম আহা বিশ্বজয়ী! স্বভক্ত-বৎসল
শ্রীহরি, তাঁহার চিত্তে জাগিল করুণা!
কে বুঝে তাঁহার মায়া? মায়াময় তিনি!
সন্ধ্যাকাল! হতেছিল মন্দিরে আরতি,
বাজাইতেছিল শঙ্খ পৌরনারী সবে,
ঘরে ঘরে পথে পথে বিপণি দোকানে
জ্বালাইতেছিল বাতি! ব্রজের মালিনী
যোগাইতেছিল মালা ; ব্রজগোয়ালিনী
কলসে বেচিতেছিল দুগ্ধ ; মহাহর্ষে
নাচিতেছিল ব্রজবালবৃন্দ! সর্ব্বত্র
চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল পথে ঘাটে মাঠে!
হেনকালে অকস্মাৎ, একি লীলাখেলা,
ব্রজমাঝে নিশুতি আইল! নর নারী
পাষাণপ্রতিমা সম যে যেখানে ছিল
দাঁড়ায়ে রহিল! প্রাণ আছে, জ্ঞান নাই
বুঝিবার! দুইচক্ষু আছে, শক্তি নাই
হেরিবার! ব্রজে আজি পাষাণমূরতি
চারি ধারে, সারা ব্রজ পাষাণের পুরী!

* * *

নগ্নমহিমার মরি সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে
দীপ্তিময়ী ব্রজেশ্বরী, রূপে আলো করি
নগরী, অকুতোভয়ে পশিলা মন্দিরে!
ব্রজের পাষাণ-আঁখি পাষাণ-দৃষ্টিতে
চাহিল, সে নগনারে নারিল লখিতে!
কেবল একটি পক্ষী, পক্ষীকুল-গ্লানি,
বৃক্ষে বসি নেহারিল নগ্না রাধিকারে!
অমনি যুগল চক্ষু দুষ্ট বায়সের
মুদিল, ডুবিয়া গেল চির অন্ধকারে!
দেবাঙ্গনা বরষিল লাজমুষ্টি ; মরি
স্বর্গ-বিদ্যাধরী বরষিল পুষ্প-বৃষ্টি
বিজয়িনী রাধিকার শিরে! শ্রীরাধিকা
পরিলেন লাজবস্ত্র ; মায়াগ্রস্ত ব্রজ
জাগিল ; জাগিল পুনঃ হর্ষ-কলরবে—
যেন কোন মোহময় স্বপ্ন-অবসানে!

* * *

বুঝিলা রাধিকা—কার বলে, এ অকূল
সিন্ধু, তরিলা ; ডাকিলা "দীনবন্ধু" বলে ;
কৃপাসিন্ধু দেখা দিলা হাসিয়া হাসিয়া!
বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ, গোপবধূ
ধুইলা চরণধুলা অর্ঘ্যজল দিয়া!
সুকেশিনী, মরি, নয়ন-জলে ভাসিয়া,
মুছাইলা ধৌতপদ কেশরাশি দিয়া!
যোড়হস্তে প্রেমময়ী কহিলা সুস্বরে!—
"বঁধু কি আর বলিব আমি *

* কবি চণ্ডিদাস হইতে উদ্ধৃত।

মরণে জীবনে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে,
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
এ কুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
হৃদয়ের নিধি, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

* *

মঙ্গল।

অবর গ্রহ হইতে প্রবর গ্রহের ভেদ। প্রবর গ্রহগণের কক্ষা ভূকক্ষার বহির্ভাগে, তজ্জন্য প্রবর গ্রহগণ ভূকক্ষা ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কখন আসেন না অর্থাৎ তাঁহাদের অধঃ সমাগম কখনই হয় না, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীর বহির্ভাগে যেদিকে সূর্য্য তাহার বিপরীত দিকে থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের কেবল ঊর্দ্ধ সমাগম ঘটে। ঊর্দ্ধ সমাগমকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে শীঘ্রোচ্চ বলে। চন্দ্র বুধ বা শুক্রের ন্যায় তাহাদের বিম্বের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। মঙ্গল যখন রবি হইতে পাদান্তরে থাকেন, তখন তাঁহার বিম্ব স্পষ্ট অর্দ্ধাধিক দেখায় কিন্তু অপর প্রবর গ্রহগণ এতদূরে আছেন যে, তাঁহাদের আলোকিত পূর্ণ বিম্ব প্রায় সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে এবং অর্দ্ধাধিক বিম্ব কখন হইলেও জানিতে পারা যায় না।

মঙ্গলের দূরত্ব ও ভগণাদি। প্রবর গ্রহগণের মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ, এবং রবি হইতে দূরত্ব হিসাবে, প্রধান গ্রহগণের মধ্যে ইনি চতুর্থ, পৃথ্বী ও চন্দ্রকে এক ধরিয়া লও। পঞ্চকুটুম্ব বিশিষ্ট পার্থিব গ্রহপরিবারের মধ্যে আকার পরিমাণে মঙ্গল তৃতীয়। প্রধান গ্রহগণের মধ্যে কেবল বুধ মঙ্গল অপেক্ষা ছোট।

মঙ্গল রবি পরিতঃ ৬৮৬ দি, ২৩ ঘ, ৩১ মি, ১২ সেকণ্ডে একবার ভ্রমণ করেন; সিদ্ধান্ত মতে এই ভগণকাল ৬৮৬ দি, ২৩ ঘ, ৫৬ মি, ২·৩৭ সে।

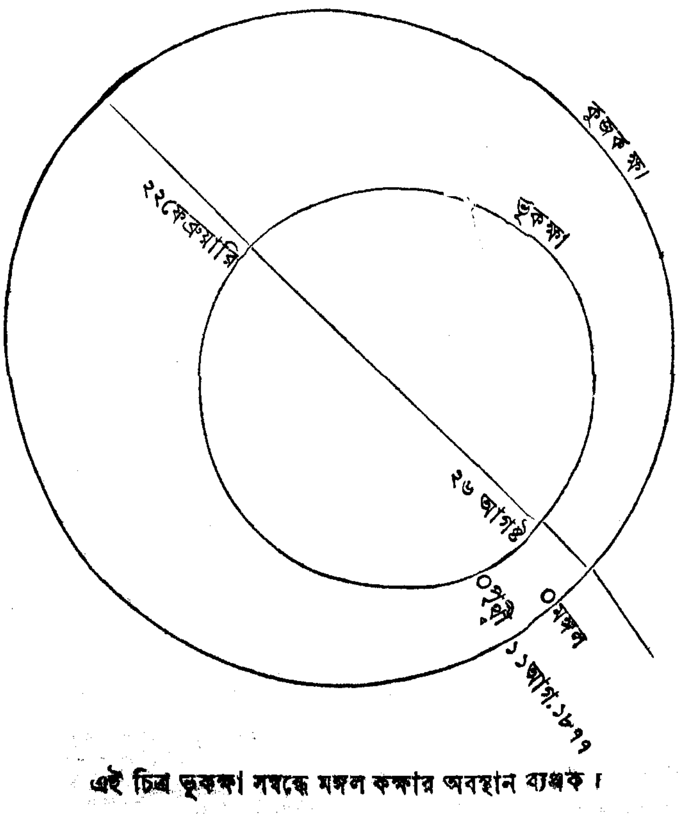
দস্রত্র্যষ্টরসাঙ্কাক্ষিলোচনানি কুজস্য তু। ৩০॥১। সূ, সি।

অর্থাৎ ৪৩, ২০, ০০০ বৎসরে মঙ্গলের ২২, ৯৬৮৩২ ভ্রমণ হয়। এই হিসাবে এক ভ্রমণে ৬৮৬ দি, ৫১ দ, ৫০ প, ৫·৮৭ বিপ, পড়ে।

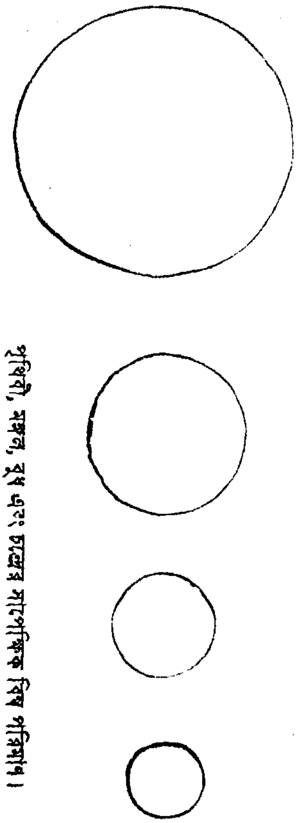
সূর্য্য হইতে মঙ্গল হারাহারি ১৪, ১৩, ৬৮০০০ মাইল অন্তরে থাকেন। মঙ্গলের কক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্র ; বুধের ভিন্ন অপর কোন প্রধান গ্রহের কক্ষা এত উৎকেন্দ্র নহে। মঙ্গল-কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব ০·০৯৩১৬ রবিমণ্ডলের মধ্য হইতে কুজকক্ষার মধ্য ১, ৩১, ৮৪, ০০০ মাইল। এই উৎকেন্দ্রত্ব নিবন্ধন সূর্য্য হইতে মঙ্গলের দূরত্ব যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন ১৫, ৪৫, ৫২, ০০০ মাইল হয়, আর দূরত্ব যখন অত্যল্প হয়, তখন ১২, ৮১, ৮৪ ০০০ মাইল হয়। সিদ্ধান্ত মতে উৎকেন্দ্রত্ব ০·১ এবং কক্ষা পরিমাণ ৮১, ৪৬, ৯০৯ যোজন।

যুগ্মান্তেঽর্থাদ্রয়ঃ খাগ্নী সুরা সূর্য্যা নবার্ণবাঃ।
ওজে দ্ব্যগা বসুযমা রদা রুদ্রা গজাব্ধয়ঃ॥
কুজাদিনামতঃ শৈঘ্র্যা যুগ্মান্তেঽর্থাগ্নিদস্রকাঃ।
গুণাগ্নিচন্দ্রাঃ খনগাদ্বিরসাক্ষীণিগোঽগ্নয়ঃ॥ ২।৩৫।৩৬।সূ॥
কুজস্যাপ্যঙ্কশূন্যাঙ্কষড় বেদৈক ভূজঙ্গমাঃ। ১২।৮৩।সূ॥

অর্থাৎ যুগ্মপাদে মঙ্গলের মন্দপরি ৭৫° এবং অযুগ্ম পাদে ৭২° ; অতএব উক্ত পরিধিদ্বয়ের ব্যাসার্দ্ধ যথাক্রমে ৭১৬·২৫ এবং ৬৮৭·৮০ বিকলা। এই অঙ্কদ্বয় অবলম্বন করিলে উৎকেন্দ্রত্ব লাভ হইবে। সূর্য্য সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে কক্ষা পরিমাণের নিয়ম পাইবেন।



এই চিত্র ভূকক্ষা সম্বন্ধে মঙ্গল কক্ষার অবস্থান ব্যঞ্জক।



পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ এবং চন্দ্রের সাপেক্ষিক বিম্ব পরিমাণ।

মঙ্গল যখন পৃথিবীর খুব নিকটে আসেন, তখন পৃথিবী হইতে তাঁহার দুরত্ব প্রায় ৪,৭৮,৮২,০০০ মাইল আর যখন খুব দূরে থাকেন, তখন ৬,২৩,৮৮ ০০০ মাইল হয়। মঙ্গল বিম্বের চাপাত্মক ব্যাস গড়ে ৯"·২৪, মাইল হিসাবে ৪২১১। নিরক্ষ প্রদেশীয় ব্যাস ৯·৪"২ কেন্দ্রগত ব্যাস ৯"·৩৬। ২৭ আগষ্ট তারিখে মঙ্গলের অনুহৈলিক এবং পৃথিবী একরাশিস্থ হন ; ঐ দিবসের আসন্ন সময়ে যদি পৃথ্বী ও মঙ্গলের সমাগম হয়, তবে তখন তাঁহাদের ব্যবধান ৩,৩৩, ৭৫,০০০ মাইল হয়, এতদ্দয়ের ব্যবধান ইহা অপেক্ষা ন্যূন হয় না। যখন ফেব্রুয়ারি কিম্বা মার্চ্চ মাসে সমাগম হয় তখন ঐ ব্যবধান ৬,২০,০০,০০০ মাইল হইয়া উঠে; এই সময়ে পৃথিবী ও মঙ্গল যদি স্বর্য্যের বিপরীত দিকে থাকেন, তবে উভয়ের অন্তর ২৪, ৫২, ০০ ০০০ মাইলের অধিক হয়। মাঙ্গল্য বিম্ব যখন খুব ছোট দেখায় তখন চাপাত্মক পরিমাণ ৪·১", আর যখন খুব বড় দেখায় তখন ৩০"৪। সিদ্ধান্ত মতে দৃশ্যমান বিম্ব ২ কলা, যোজন পরিমাণে ৩০। *

কুজাদিত্য যোগ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মঙ্গল ৬৮৬·৯৮ দিনে অর্থাৎ ১ বৎসর ১০½ মাসের কিঞ্চিৎ অধিক সময়ে রবিপরিত: এক ভভ্রম সম্পন্ন করেন। কোন সমাগমরেখা হইতে পৃথিবী এবং মঙ্গল, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে মঙ্গল পুনঃ কক্ষার সেই স্থানে যখন উপনীত হন পৃথিবীর তখন দুই ভভ্রমের কিছু বাকি থাকে অর্থাৎ পৃথিবী আরও ৪৩½ দিন ভ্রমণ করিলে তাহার দুই ভভ্রম পূর্ণ হয়। মঙ্গল যে বেগে চলেন, পৃথিবী তাহার দ্বিগুণ বেগে চলেন ; অতএব ৪৩½ দিনের পর অর্থাৎ পূর্ণ দুই বৎসরের অন্তে পৃথিবী যে স্থানে আসেন সে স্থান মঙ্গল হইতে পূর্ব্বঅন্তরের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ। আর ৪৯½ দিন চলিলেই পৃথিবী মঙ্গলের সহিত সমাগম লাভ করেন ; তবেই কুজাদিত্য যোগ হারাহারি দুই বৎসর পঞ্চাশ দিন অন্তর হয়। কিন্তু মঙ্গল কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব জন্য মঙ্গলের কাক্ষ্যাগতির বিষমতা ঘটে সুতরাং ঠিক ৭৮০ দিন অন্তর কুজাদিত্যের ষড়্ভান্তর হয় না। নিম্নলিখিত কতিপয় বৎসরের কুজাদিত্যের ষড়্ভান্তর দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কতদিন অন্তর উক্ত ব্যাপার ঘটে।

		ব্যবধান				দি	ঘ
১৮৭১ মার্চ্চ	২০, ৪ ঘ. পূ.	দি.	ঘ.	১৮৮৪ ফেব	১\ ১১ পূ.	৭৬৬	৬
১৮৭৩ এপ্রেল	২৭, ৩ „ অ.	৭৬৯	১১	১৮৮৬ মার্চ্চ	৬ মধ্যাহ্ন.	৭৬৫	২

				ব্যবধান।					দিঃ	ঘ
১৮৭৫ জুন	২০, ৮ „ পূ.	৭৮৩	১৩	১৮৮৮ এপ্রেল	১১	৬ পূ.	৭৬৭			৬
১৮৭৭ সেপ.	৫, ১২ „ মধ্যরাত্রি	৮০৮	১৬	১৮৯০ মে	২৭	৭ অ,	৭৭৬			১৩
১৮৭৯ নবে.	১২, ৮ „ অ.	৭৯৭	২০	১৮৯২ অগ.	৩	১০ অ.	৭৯৯			৩
১৮৮১ ডিসে.	২৭, ৫ „ পূ.	৭৭৫	৯	১৮৯৪ অক.	২০	১৮ অ.	৮০৮			১৪
				১৮৯৬ ডিসে.	১০	১৮ পূ.	৭৮২			১২

সূর্য্য হইতে মঙ্গল কতদিনে যড়ভান্তরিত হন, তাহার গণিত।

পৃথিবীর দৈনিক গতি $\frac{৩৬০^{\circ}}{৩৬৫\cdot২৬}$,

মঙ্গলের দৈনিক গতি $\frac{৩৬০}{৬৮৬\cdot৯৮}$;

পৃথিবী প্রতিদিন মঙ্গল অপেক্ষা $\frac{৩৬০^{\circ}}{৩৬৫\cdot২৫} - \frac{৩৬০}{৬৮৬\cdot৯৮}$ পরিমাণে অগ্রসর হন; অতএব যদি একদিনে এতাবৎ চাপাত্মক গতি হয়, তবে পূর্ণ কক্ষাভ্রমন কত দিনে হইবে?

অর্থাৎ $\frac{৩৬০^{\circ}}{৩৬৫\cdot২৬} - \frac{৩৬০^{\circ}}{৬৮৫\cdot৯৫}$: ৩৬০° : : ১ দিন : কতদিন

$$ইষ্টরাশি = \frac{৩৬০}{\frac{৩৬০}{৩৬৫\cdot২৬} - \frac{৩৬০}{৬৮৬\cdot৯৮}} = \frac{৬৮৬\cdot৯৮ \times ৩৬৫\cdot২৬}{৩২১\cdot৭২} = ৭৭৯\cdot৯$$

অর্থাৎ হারাহারি প্রায় ৭৮০ দিন অন্তর কুজ্যাদিত্য যোগ হয়।

কক্ষার অবনতি, মণ্ডলের পৃষ্ঠফল ইত্যাদিক — মঙ্গল কক্ষার ক্রান্তিবৃত্তে অবনতির পরিমাণ ১° ৫১′ ৬″। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে এই অ একদি৩০′ মপে

ভচক্রলিপ্তাশীত্যংশ পরমং দক্ষিণোত্তরং
বিক্ষিপ্যতে স্বপাতেন স্বক্রান্ত্যন্তাদনুষ্ণগুঃ। ১।৬৮
তন্নবাংশ দ্বিগুণিতং জীবস্ত্রিগুণিতংকুজঃ। ১।৬৯

অর্থাৎ $\frac{৩৬০ \times ৬০}{৮০} \times \frac{৩}{৯} = ৯০' = ১'' ৩০'$

মঙ্গলের কক্ষার অক্ষে তদীয় মণ্ডলের অক্ষের অবনতি ২৮°,৪২′। মঙ্গলের বর্ষমান ৬৬৮ দিন ১৬ ঘণ্টা। আমাদের দিনমান অপেক্ষা মঙ্গলের দিনমান কিঞ্চিৎ অধিক যেমন ১০০তে ৯৭এ। মঙ্গল মণ্ডলের উত্তরার্দ্ধে গ্রীষ্ম ৩৭২ শীত ২৯৬ দিন; সুতরাং তদীয় দক্ষিণ গোলে গ্রীষ্ম ২৯৬ এবং শীত ৩৭২ দিন মাঙ্গল্য দিনমানের হিসাবে উত্তর গোলে বসন্ত ১৯১, গ্রীষ্ম ১৮১, বর্ষা ১৪৯, শীত ১৮৭ দিন। দক্ষিণ গোলে ঋতু চতুষ্টয়ের বিপর্য্যাস ঘটে।

দৌরবীক্ষণিক রূপ। যথাযোগ্য দৃষ্টিযন্ত্র সহকারে দর্শন করিলে মঙ্গল মণ্ডলে স্থানে স্থানে অমুজ্জল পীতলোহিত বর্ণ দেখিয়া সেগুলিকে পার্থিব মহাদ্বীপ সদৃশ বোধ হয়। আবার

স্থানে স্থানে আনীলাভা দৃষ্ট হয়, এগুলি সাগরবৎ জলরাশি বলিয়া বিশ্বাস। নিখিল মঙ্গল-মণ্ডলে কৌসম্ভ বর্ণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনুমিত হয় যে, তত্রত্য ভূমি সাধারণতঃ সুবর্ণ-গৌরিক। শুধু চক্ষে মঙ্গলকে যত আরক্তিম দেখায়, দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে তত লাল দেখায় না, এবং দূরবীক্ষণের তেজ যত বেশী বর্ণ তত ফিকে দেখায়। উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া মঙ্গল-মণ্ডলের চিত্র অঙ্কিত করিলে চিত্রদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে জলস্থল দেখিলাম বলিয়া বোধ হইবে। উজ্জ্বলাংশ কৌসুম্ভবর্ণ, তাহার মধ্যে মধ্যে লোহিত তাম্র বা হরিতবিন্দু দৃষ্ট হয়। অনুজ্জ্বলাংশ সর্ব্বত্র সমশ্যাম নহে; শ্যামত্বের তারতম্য আছে; এ অংশ মলিন শুক্ল হরিত বা আনীল দেখিতে যেন নিপীতসৌরালোক-দ্রববিশেষ। যদি মঙ্গলে জলের ও স্থলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে তথা পৃথিবীর মত ৷৷৵০ আনা জল, ।৵০ আনা স্থল নহে, তথা জল ও স্থলের ভাগ সমান। তথা মহাসাগরবৎ জলের অবস্থান অল্পই। তথা প্রায়ই সুদীর্ঘ, আয়ত প্রণালী আকারে জলের অবস্থিতি। মঙ্গল মণ্ডলের উভয় কেন্দ্র পরিসরে যে সমুজ্জ্বল শুভ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা অধুনাতন জ্যোতিষীগণ তুষাররাশি বলিয়া থাকেন এবং তুষার বলিবার কারণ এই যে, মঙ্গল লোকে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উক্ত তুষারবৎ শুক্লরাশি সূর্য্যের উত্তাপে অপচিত হয় এবং শীতাগমে উহার উপচিতি ঘটে।

মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব বিচার। মঙ্গলমণ্ডলের মানচিত্রে কলঙ্কবৎ যে সকল শ্যাম-ভূমি দৃষ্ট হয় এবং যেগুলি সাগর নামে অভিহিত হয়, সেগুলি বস্তুতঃ জলরাশি কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। চন্দ্রমণ্ডলে জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমাভিভূত ছিলেন, মঙ্গলম[illegible] সাগর দর্শন তদ্বৎ প্রমাদ মাত্র হইলেও হইতে পারে। শ্যামস্থল সকল যে জলরাশি [illegible] সুনিশ্চিত নহে; পরন্তু সেগুলি জলময় হইলেও হইতে পারে। জলদ্বারা আলো[illegible]ত হয়, স্থলদ্বারা আলোক প্রতিফলিত হয়; কিন্তু কোন কোন শুষ্ক খনিজ-পদার্থের [illegible]মরাগ দ্বারা এবং উদ্ভিদ-আবরিত প্রান্তর দ্বারাও আলোক নিগীর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপ আধিভৌতিক ব্যাপার জন্য চন্দ্রমণ্ডলে যেগুলিকে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত জল বলিয়া ভ্রম ছিল, সেগুলি এখন যথাযত পর্য্যবেক্ষণ বশতঃ বহ্বায়ত প্রান্ত-রোপরি শুষ্ক বন্ধুর ভূমিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মঙ্গলমণ্ডলের শ্যাম প্রদেশ সমূহ প্রকৃত সমুদ্র না হইলেও সমুদ্রের সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত সেগুলিকে জলধি ব্যঞ্জক শব্দদ্বারা উল্লেখ করা অসাম্প্রত নহে; কারণ যাবৎ না প্রমাণ হইতেছে যে উক্ত প্রদেশ সকল জলপূর্ণ নহে, তাবৎ তাহাদের নামান্তর করিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু অদ্যাপি কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই যে ভৌমসাগর ভূমিসাগর হইতে বিষদৃশ; বরং সাদৃশ্য পক্ষেই সম্ভাবনা অধিক।

বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব বিচার। মঙ্গল যে বায়ুমণ্ডল-পরিবেষ্টিত তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণী-কৃত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে যে, এই বিম্বের মধ্য অপেক্ষা উপান্ত উজ্জ্বল-তর, মধ্য হইতে উপান্ত পর্য্যন্ত প্রতিফলিত আলোকের ক্রমবৃদ্ধি দেখা যায়। এ তথ্যের নিদ্‌মান কেবল বায়ুমণ্ডল। নিপীত আলোকের বৃদ্ধি বায়ুকোষের বেধের অনুলোম অনুযায়ী,

সুতরাং মধ্যস্থলে আলোকের পরিমাণ অল্পিষ্ঠ, উপকণ্ঠে ভূয়িষ্ঠ। অপিচ বেধলব্ধ অন্যতথ্য দ্বারা এ তথ্যের প্রমাণ দৃঢ়ীভূত করা যায়। অক্ষাবর্ত্তনজনিত পরিচ্ছিন্ন শ্যাম চিহ্ন সকল মধ্য হইতে বিম্বান্তে যাইতে যাইতে অস্পষ্ট হয় এবং পরিণামে মধ্যরেখা হইতে ৫০°, ৬০° অন্তরে আসিলে অদৃষ্ট হইয়া পড়ে, এবং তত্রত্য বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছতা অনুসারে লাঞ্ছনের অস্পষ্টতার ন্যূনাধিক্য ঘটে। চন্দ্রমণ্ডলে এরূপ ঘটনা ঘটে না। বায়ুর অস্তিত্ব পক্ষে তৃতীয় প্রমাণ এই যে মঙ্গলের কেন্দ্রদ্বয়ে যে শুক্ল চিহ্ন আছে, তাহা শীতকালে বাড়ে এবং গ্রীষ্মে ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। বায়ুদ্বারা তুষার বা মেঘরাশি ঘনীভূত না হইলে শুক্লচিহ্ন দুইটির এবম্ভূত পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

যে বায়ু সেবন করিয়া আমরা প্রাণধারণ করি, মঙ্গলমণ্ডলে ঠিক তদ্বৎ বায়ু না থাকিতে পারে; ভৌম সাগরের আলোক নিপায়ী দ্রব্যময় পদার্থ ঠিক জল না হইতে পারে, তত্রত্য তুষার রাসায়ণিক ক্রিয়া যোগে অধঃপাতিত, এবং পার্থিব তুষার হইতে ভিন্ন ধর্ম্মশীল তুষার হইতে পারে।

বর্ণপট্টিকার ব্যাকৃতি প্রভাবে ঈদৃশ সংশয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। মঙ্গলের আলোক প্রতিফলিত সৌরালোক মাত্র, সুতরাং আপাততঃ বিশ্বাস হয় যে, মঙ্গলের বর্ণপট্টিকা সৌরালোকের বর্ণপট্টিকার প্রত্যুৎপত্তি মাত্র; কিন্তু পার্থিব বায়ুকোষের বর্ণপট্টিকায় নিপীত আলোকের যদ্রূপ রেখা দৃষ্ট হয়, ঠিক তদ্রূপ রেখা ভৌমপট্টিকায় পাওয়া যায়। কোন কোন হৈতুক বলিতে পারেন যে এ কোন বিস্ময়োদ্রেক ব্যাপার নহে এবং এতদ্দ্বারা প্রমাণই বা কি হইল? তাঁহারা বলেন যে মঙ্গল হইতে আমরা যে আলোক প্রাপ্ত হই, তাহা ভূবায়ু দিয়া আইসে অতএব উহাতে যে ভূবায়ুর লক্ষণজ্ঞাপক রেখা থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এ আপত্তির জবাব পরীক্ষকেরাই দিয়াছেন। তাঁহারা একদিনে একক্ষণে চন্দ্রালোকের ও ভৌমালোকের বর্ণপট্টিকা লইয়াছিলেন, তৎকালে চন্দ্র অপেক্ষা মঙ্গল আকাশের অধোভাগে ছিলেন। উভয় আলোকই অবশ্য ভূবায়ু দিয়া আসিয়াছিল। ভূবায়ুজনিত চন্দ্রালোকে যে বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা, মঙ্গলের অপেক্ষাকৃত ক্ষিতিজের সামীপ্য প্রযুক্ত তদীয় আলোকে অধিকতর বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু চন্দ্রালোকের বর্ণপট্টিকায় কতিপয় ধ্রুবরেখা ভিন্ন মঙ্গল আলোকের রেখাচয়ের কোন চিহ্নও দৃষ্ট হয় নাই। অতএব এই দুই আলোকের ভেদ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল নাই, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আছে। এ বায়ু পার্থিব বায়ু সদৃশ এবং ইহার অধিকাংশ জলীয় বাষ্প বিশিষ্ট। মঙ্গল বায়ুর সান্দ্রত্ব এ পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে; ইহা আমাদের প্রাণবায়ুর অনুরূপ।

অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, তত্রত্য সাগর, মেঘ, তুষার যথাক্রমে পার্থিব সাগর আদির ন্যায়। পরন্তু এবম্ভূত কতিপয় খণ্ড সারূপ্য দর্শন করিয়া উভয়গ্রহের ভৌগলিক ও আন্তরিক্ষিক ব্যবস্থার পূর্ণ সাদৃশ্যে সহসা উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মঙ্গল মণ্ডলে ও মহীমণ্ডলে সবিশেষ বিষমতা আছে। ভূগোলের ॥৶০ আনা জলময়, বৃহৎ বর্ষ-

কতিপয় বৃহদ্ দ্বীপবৎ, প্রকাণ্ড আটলাণ্টিক অসীম প্রশান্ত সাগর উভয়ই অগাধ জলপূর্ণ। মঙ্গলে জলের ও স্থলের পরিমাণে অনেক সমতা আছে, জলাপেক্ষা তথা স্থলভাগ ৩ং অধিক। তথা সার্থক নামধেয় অনেক ভূমধ্য সাগর আছে, অনেক স্থলান্তর্গত হ্রদ আছে, তথা লোহিত সাগরোপম অনেক জল-সঙ্কট আছে, এবং তথা সরল সমান্তর কূলশালিনী নালী প্রণালী সকল নানা ভঙ্গীক্রমে পরস্পর ছেদকরায় মণ্ডল যেন জলজালে আবরিত রহিয়াছে। মঙ্গল সাগরের বর্ণের গাঢ়তায়ও সবিশেষ ভেদ অনুভূত হয়। নিরক্ষ প্রদেশের সাগর তৎপার্শ্বস্থ সাগর অপেক্ষা শ্যামতর। কতিপয় জলরাশি অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। মঙ্গলের প্রাচীন মানচিত্রের সহিত এখনকার চিত্র মিলাইলে দেখা যায় যে, দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। বর্ণের বরিবর্ত্তন ঘটে, এ পরিবর্ত্তনের বিশিষ্ট কারণ জলের গভীরতা।

বেলুনে আরোহণ পূর্ব্বক নদী হ্রদ বা সাগরের উপর দিয়া গমন কালে জল যদি স্থির এবং স্বচ্ছ থাকে, তবে নদী প্রভৃতির তলা পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায়, বোধ হয় যেন জল নাই। সাগরোপকূল হইতে শত শত ফুট অন্তরে আলোক ও জলের অবস্থা অনুসারে ৪০।৫০ ফুট জল ভেদ করিয়া তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়। এই যুক্তি অবলম্বন করিলে অনুমিত হইবে যে, মঙ্গল মণ্ডলের শুক্লাভ জলরাশির গভীরতা কতিপয় ব্যামমাত্র, ধূসর সাগরগুলি অপেক্ষাকৃত গভীরতর এবং কৃষ্ণসাগর সমূহের গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জলের বর্ণের কারণ কেবল গভীরতা নহে, দেশভেদে জলের বর্ণভেদ ঘটিতে পারে; আবার জল যত লোনা হয়, তত গাঢ়-শ্যাম দেখায়। আবার ভূতলে পীত লোহিত শুক্ল এবং কৃষ্ণসাগর আছে। যদিও এ সকল জলরাশির বর্ণ নামানুরূপ নহে তথাপি তত্তৎ জলের কিয়ৎপরিমাণে পীতাদিবর্ণ দৃষ্ট হয়। ভাগীরথীর মোহানের হরিদ্বর্ণ ভূমধ্য সাগরের অসিশ্যাম, সিনের পীত এবং গঙ্গা যমুনার জলের ভেদ প্রসিদ্ধই আছে। জলের বর্ণের যে ত্রিবিধ কারণ দেখান গেল, তাহা ভূমিসাগরে ও ভৌমসাগরে উভয়এ খাটে। যে স্থানের জলের বর্ণ অসান্দ্র, সে স্থান অনুপদেশ বা জলমগ্ন ভূখণ্ড। সেখানে সমুদ্রের আয়তন এবং বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। বিপুল জলপ্লাবনে বহ্বায়ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া যায়, ভূমণ্ডলেও সদৃশ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। ভারি বৃষ্টির পর যেমন অত্রত্য নদীতে আলোহিত বা আপিত পঙ্কিল জল প্রবাহিত হয়, তেমনই ঋতু অনুসারে মঙ্গলজলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থলবর্ণনা। মঙ্গল মণ্ডলের মহাদেশ সকল পীতবর্ণ; তজ্জন্য অঙ্গারকের বহ্নিবৎ পীতকৌসুম্ভ বর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে শুধুচক্ষে তারাগণ হইতে নির্ব্বাচন করা যায়। কিন্তু যাঁহাদিগের তারাগণের সহিত সবিশেষ পরিচয় নাই, তাহাদিগের রোহিণী জ্যেষ্ঠা বা বট্‌-জ্যোতীতে অঙ্গারক ভ্রম হইতে পারে; বর্ণ সম্বন্ধে ভূমি ও ভৌমতে বিশিষ্টভেদ দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলে পৃথিবী ঈষৎ হরিদবর্ণা বলিয়া প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনা, কারণ অত্রত্য জল ও স্থল উভয়ই হরিদ্বর্ণ; কিন্তু বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব প্রযুক্ত এই হরিদ্বর্ণে নীলাভ ধারণ করে। বুধ এবং শুক্রলোকের জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ সহকারে আমাদের সাগরকে গাঢ়

হরিৎ, মহাদ্বীপকে ঈষদ্ হরিৎ, মধ্যভূমিকে পীত, কেন্দ্রস্থ তুষাররাশি শুভ্র, মেঘ ধবল, এবং হিমকূট শৈলাবলিকে সিতরেখাবৎ দেখেন। মঙ্গলমণ্ডলের সাগর, মেঘ, তুষার অস্মৎসম্বন্ধে উক্তরূপেই অবভাসিত হয়। কেবল স্থলভাগ সকল যব, গোধূম, কলায়াদির ক্ষেত্রময়ত্বাৎ আপীত দেখায়।

মঙ্গলের সরাগত্ব শুধুচক্ষে যত দেখায় তত দূরবীক্ষণে দেখায় না। দৃষ্টিযন্ত্রের শক্তি অনুসারে রাগের তারতম্য ঘটে। ইহার কারণ কি? বায়ুমণ্ডল ইহার কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না; কেন না তাহা হইলে অখিল মণ্ডল সমবর্ণাত্মক হইত এবং মধ্যস্থলের রাগ অপেক্ষা পরিসরের রাগ গাঢ়তর দেখাইত কারণ মধ্যস্থল অপেক্ষা উপান্তের বায়ুকোষের বেধ অধিকতর সুতরাং গ্রহ হইতে প্রতিফলিত রশ্মিজাল মধ্য অপেক্ষা সীমাসমীপে তীব্রতর হইত। তবেই কারণ স্থলে বলিতে হইবে যে মঙ্গল হয় মরুভূমিময়, অথবা বালুকা বা রঞ্জিত মৃণ্ময়, নচেৎ তত্রত্য তরুলতাদি পীতবর্ণ।

প্রথম অনুমান মঙ্গলমণ্ডলের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যদি বলি যে মণ্ডল কেবল খনিজ পদার্থময়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে তদুপরি কোনরূপ উদ্ভিদ নাই,—শৈবাল নাই, অরণ্য, বনস্থলি, ক্ষেত্র, কিছুই নাই; কারণ যদি উদ্ভিদ থাকে তবে আমরা কেবল উদ্ভিদ্ই দেখিতে পাই, প্রকৃত স্থলভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যে অনির্বচনীয় ভৌতিক পদার্থময় অন্তরীক্ষের প্রবাহ লক্ষ লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত ভূতলের ন্যায় মঙ্গলমণ্ডলে শীত, গ্রীষ্ম, তুষার, আসার, কুহ, রস, তাপ, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ উৎপন্ন করিতেছে তাহার একটি তৃণাঙ্কুর প্রসব করিবার শক্তি হইল না? প্রকৃতি নাম্নী জগদ্ধাত্রীর অচিন্ত্যাপ্রসবিনী শক্তি প্রভাবে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে অবনীপৃষ্ঠে সাগরগর্ভে শৈলশিখরে কোটি কোটি জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবম্ভূতা বহুপ্রজা প্রকৃতি দ্বিতীয় ভূলোকতুল্য মঙ্গলমণ্ডলে চিরবন্ধ্যা রহিলেন! এ মত নিতান্ত অমূলক, অসমর্থনীয়। অন্ততঃ মঙ্গলমণ্ডলের বর্ণ সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের উদ্ভিদতত্ত্বের জ্ঞানসীমা পরিবর্দ্ধিত করা বিধেয়; এবং স্বীকর্ত্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে উদ্ভিদ সকল কেবল হরিৎ না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাত্মক হওয়া অসম্ভব নহে। বনস্পতি, ওষধি, তৃণ ইত্যাদি যাহা কিছু আমরা এখানে দেখি, তাহা অন্যত্র শত শত, সহস্র সহস্র প্রকারের হইতে পারে। এখান হইতে তত্রত্য তরুগুল্ম অনুভূত হয় না, কিন্তু সিদ্ধ হইতেছে যে সালবৎ বৃহৎ বৃক্ষ হইতে শৈবালবৎ আণুবীক্ষনিক উদ্ভিদ্ সমূহের প্রায় পীত বা পীতকৌসুম্ভ বর্ণ। হয় তত্রত্য ফল, পুষ্পের অধিকাংশ লোহিতবর্ণ, নয় বনস্পতি বা ওষধি কেহই হরিৎ নহে সকলই পীত। আমরা মল্লিকা গাছে নীলফুল দেখিলে পার্থিব সংস্কারবশতঃ অবশ্যই চমকিত হইব; কিন্তু রাসায়ণিক সংযোগাধীন বা শুদ্ধ পরমাণুর বিন্যাস নিবন্ধন অন্যান্য লোকে বর্ণবিপর্য্যাস ঘটিতে পারে।

মঙ্গল মণ্ডলে পরিবর্ত্তন। তথা তরু লতাদি কি ভূতলস্থ যবস, পনস, তাল, ঝাউ প্রভৃতির ন্যায় সম্বৎসর সমভাবাপন্ন থাকে,—না অশ্বত্থ মন্দার, পলাশ, পারুল, শিমূলের

ন্যায় শীতাত্যয়ে জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসন্তাগমে নব-কিশলয় ধারণ করে? এ প্রশ্নের উত্তর অদ্যাপি কেহ দিতে সমর্থ নহেন। মঙ্গলের নিরক্ষ প্রদেশ এবং অয়নান্তবৃত্ত হইতে ২৩২° চাপাত্মক বিস্তৃতি বিশিষ্ট প্রদেশদ্বয় স্পষ্ট দেখা যায়; ভূগোলে এতাবতী মেখলায় উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন হয় না। অবশিষ্ট ভূভাগের অবস্থা জানা না থাকায় প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশে উদ্ভিদের সবিশেষ বর্ণভেদের অভাব দেখিয়া বোধ হয় যে তথা উদ্ভিদরাজ্যে সেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না যেমন অত্রত্য উত্তর প্রদেশে ঘটে। যাহা হউক কতিপয় পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে।

মঙ্গলের কোন কোন খণ্ডের সীমা ও আকারগত পরিবর্ত্তন সময়ে সময়ে দেখা যায়। দ্বিতীয় হর্সেলের নামানুসারে যে জলসঙ্কট অভিহিত হইয়া থাকে, সেটির ১৮৩০ অব্দের নক্সা একরূপ, ১৮৬২র নক্সা আর একরূপ এবং ১৮৭৭এ উহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল। টর্বি নামক একটি গোলাকার সমুদ্রে কালে কালে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ১৮৬৪ অব্দে মঙ্গল সাগরে তুষারধবলিত দ্বীপপ্রায় একটি উজ্জ্বল বিন্দু দেখা গিয়াছিল, তাহা আর এখন কেহ দেখিতে পান না।

এই সকল পরিবর্ত্তন বাস্তব কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দূরস্থ পদার্থের স্বল্পাংশের আকারাদি দর্শন সম্বন্ধে সকলের চক্ষু সমান নহে, একজনের দুই চক্ষু সমান নহে; যাহা হউক উক্তরূপ পরিবর্ত্তনের বাস্তবত্ব পক্ষে সম্ভাবনা অধিক। পরন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি যে কিরূপ তাহা বলা ভবিষ্যতের কার্য্য। এ বিষয়ে এক্ষণে যাহা কিছু বলা যায় তাহা কেবল অসিদ্ধ অনুমান। পরিবর্ত্তন যদ্রূপ হউক, মঙ্গলমণ্ডলে জলস্থলের ভঙ্গির ও সাপেক্ষিক অবস্থানের স্থায়িত্বে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না।

মাঙ্গলিক গগণের আধিভৌতিক ব্যাপার। ভূতলে এবং মঙ্গলে উভয় লোকে তাপাদির কার্য্যের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয়ত্র একা সাবিত্রী শক্তি সমস্ত গতির ও সমস্ত জীবিতের মূলকারণ। সাগর সলিল তাপ কর্ত্তৃক বাষ্পীভূত হইয়া আন্তরীক্ষে উত্থিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জলীয়বাষ্প পর্থিব নভোমণ্ডলে মেঘে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়া (ঘণীকরণ ও সেক) সহকারে মঙ্গলের গগণে সেই বাষ্প দৃশ্যমান আকার প্রাপ্ত হয়; এবং সমীরণ কর্ত্তৃক উক্ত মেঘের জল-স্থল-উপরি সঞ্চলন প্রত্যক্ষীভূত হয়। যদিও মঙ্গল-ক্ষেত্রে অদ্যাপি বৃষ্টিপাত নয়নগোচর হয় নাই তথাপি জলদজালের লয় ও পুনরুদয় দেখিয়া আসারপাত অনুমিত হইতে পারে। আবার উত্তরায়ণান্তে মেদিনী-পৃষ্ঠে তুষারাবণ দর্শন করিয়া লোহিতাঙ্গে প্রালেয় পতন কল্পনাসিদ্ধ।

ভৌমের ভূগোল। এই গ্রহমণ্ডলে সাগর ও বর্ষসমূহ দর্শন করিয়া প্রতীতি হয় যে, ভূমণ্ডলের ন্যায় এখানেও ভূস্তরগত আভ্যন্তরিক উপপ্লব জন্য ভূমির উত্তুঙ্গতা এবং গভীরতা ঘটিয়াছে। তথা ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত প্রযুক্ত মণ্ডলের আদিপৃষ্ট নানারূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠোপরি গিরি উপত্যকা, অধিত্যকা, দ্রোণী, কন্দর, ভৃগু,

নানারূপ পর্য্যবেক্ষণ কর। কোথাও নদী, প্রস্রবণ, প্রণালী যোগে বৃষ্টিবারি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও সুখভেদ্য কেদার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোথাও ভূমির কাঠিন্যপ্রযুক্ত তদুপরি মন্দ মন্দ ভাবে চলিতেছে, কোথাও বা স্ফটিকাভ নির্ঝরমুখে সকৌতুকে আলোক পান পূর্ব্বক নানা ভঙ্গিভাবে ক্রীড়া করিতেছে, আবার কোথাও বা কল কলধ্বনি পূর্ব্বক সরোবরে পতিত হইতেছে বা স্রোতস্বিনী সহায়ে সাগরসঙ্গম লাভ করিতেছে।

মঙ্গলের উপগ্রহ। পৃথিবীর এক চন্দ্র, মঙ্গলের চারি চন্দ্র। মঙ্গল পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যস্থ আকাশে ভ্রমণ করেন। এ গ্রহ উক্ত গ্রহদ্বয়ের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটিই সৌরজগতের অঙ্গীভূত, এবং তিনটিই একা সাবিত্রী-শক্তির আয়ত্তাধীন। যখন পৃথিবীর এক চন্দ্র বৃহস্পতির চারি, তখন মধ্যবর্ত্তী মঙ্গল কেন চন্দ্রবিহীন হইবেন? যদি বল যে মঙ্গল অল্পকায়, পৃথিবী অপেক্ষা অল্প, বৃহস্পতি অপেক্ষা স্বল্প। ভাল মঙ্গল ছোট, ইঁহার চাঁদ তবে তেমনই ছোট হউক। ছোট গ্রহের বড় চাঁদ সাজে না, আশাও করা যায় না, হইতেও পারে না; মঙ্গলের মূলে চাঁদ থাকিবে না এ বড় অসম্ভব। এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। দুইশতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত অনেকে মঙ্গলের উপগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে ভূয়োভূয়ঃ শ্রমবৈফল্য দেখিয়া স্থির করিলেন যে, মঙ্গলের চন্দ্র নাই; আর শুক্রের ঊর্দ্ধ আকাশস্থিত প্রত্যেক গ্রহের চন্দ্র আছে এ সিদ্ধান্ত মঙ্গলপক্ষে অপ্রযুজ্য।

কালসহকারে দৃষ্টি-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হইল, দৃষ্টিযন্ত্র উৎকর্ষতা লাভ করিল, মঙ্গলমণ্ডল নরলোকের ব্যাকৃতির বিষয়ীভূত হইল, এবং পরিশেষে মঙ্গলের অধিকৃত নভোভাগের আলোচনার ফলরূপ দুই অনুপম উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। এখন জানা গেল প্রসূতি একচন্দ্রা, সুত দ্বিচন্দ্রক।

১৮৭৭ অব্দে ওয়াসিংটন বেধালয়ে অধ্যাপক হল্ তদানীন্তন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রসহায়ে এই চন্দ্রদ্বয় প্রকটিত করেন। এ আবিষ্কার যথাবিধি পর্য্যবেক্ষণের ফল; ইহা ধূমকেতু বা ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহের উপলব্ধির ন্যায় আকস্মিক নহে। ১৮৭৭ অব্দে অগষ্টের প্রারম্ভে যখন ভৌম ভূমির পরম সন্নিকর্ষে উপনীত ছিলেন, তখন এই লব্ধ প্রতিষ্ঠ আমেরিক জ্যোতির্ব্বিদ যৎপরোনাস্তি যত্নসহকারে গ্রহের সন্নিহিত প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় দীর্ঘযামিনী যাপনান্তর হতাশ হইয়া আফলোদয় পর্য্যবেক্ষণে নিরস্ত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে পত্নীর সানুনয় অনুরোধে পুনরুৎসাহিত হইয়া অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১১ তারিখের সুপ্রসন্না রজনীযোগে এক উপগ্রহ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল এবং সপ্তমী নিশা যন্ত্রক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপগ্রহ উপনীত করিলেন।

বাহিরের চন্দ্র মঙ্গলবিম্বের মধ্য হইতে ১৪৬৫০ মাইল অন্তরে
উপান্ত হইতে ১২৫০০

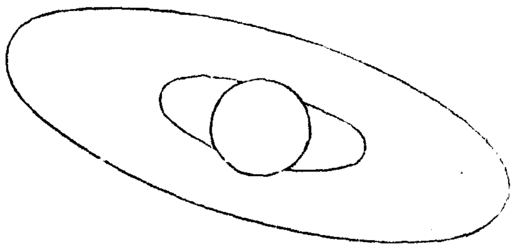
ভিতরের চন্দ্র মঙ্গল বিম্বের মধ্য হইতে ৫৮৩০ „

„ „ „ উপান্ত হইতে ৩৭০০ „ „

বাহিরের চন্দ্রমণ্ডল পরিতঃ ৩০ ঘ ১৮ মিনিটে পরিভ্রমণকরেন।

ভিতরের চন্দ্র „ ৭ ঘ ৩৯ মিনিটে „

উভয়ে পূর্ব্বমুখে এবং মঙ্গলের নিরক্ষবৃত্তের ক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। উপগ্রহদ্বয়ের পরিমাণ স্থির করা অসাধ্য। আলোক দৃষ্টে অনুমিত হয় ভিতরের উপগ্রহের ৬ হইতে ১২ মাইল এবং বাহিরেরটির ব্যাস ১২ হইতে ২৫ মাইল।



মঙ্গল এবং তদীয় উপগ্রহদ্বয়ের কক্ষা।

মঙ্গলের চন্দ্রদ্বয়ের অনন্য সাধারণ লক্ষণ এই যে অন্তরস্থ চন্দ্রগ্রহের অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট এবং উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত। শনির অন্তরস্থ উপগ্রহের ভগনকাল এত যে অল্প, তবু তাহা ২২ ঘ, ২৭ মি। এই দুইটির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গলের যতক্ষণে এক অক্ষাবর্ত্তন হয়, তদীয় অন্তরস্থ উপগ্রহ সেইকাল মধ্যে তাঁহাকে তিনবার পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতে, সৌরজগতে কেন নিখিল বিশ্বমধ্যে এ একটি অনুপম ব্যাপার। চন্দ্রের এক ভভ্রমকাল মধ্যে পৃথিবীর ২/৭ বার আবর্ত্তন হয়। বৃহস্পতি এবং শনিপক্ষে প্রায় এই-রূপই ঘটে। গ্রহগণের কক্ষাবর্ত্তন কালমধ্যে স্বয়ং রবি কতবার আবর্ত্তিত হন।

এই স্থলে একটি কৌতুকের কথা বলা যাইতেছে। গলিবর্স্ ট্রাবেল্স্ নামক পুস্তক যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে যে, ডীয়মান লাপুটাদ্বীপস্থ জ্যোতিষীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং উত্তম দূরবীক্ষণ সহায়ে মঙ্গলের দুই উপগ্রহ দেখিয়াছিলেন এবং সেই উপগ্রহদ্বয় ১০ ঘণ্টায় মঙ্গলকে পরিভ্রমণ করে। গ্রন্থকর্ত্তার এই উভয়বিধ সত্যাসন্ন অনুমান কেমন করিয়া হইল!

আর এক কথা। অনেক স্থলে মঙ্গলকে ভৌম বলিয়াছি। ভৌম অর্থাৎ ভূমির পুত্র। এ দেশের জ্যোতিষে মঙ্গলের ভূমিসুত কুজ ইত্যাদি পৃথ্বী ও মঙ্গলের সম্বন্ধসূচক অনেক নাম দেখা যায়। এ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পৃথ্বীকে মঙ্গল অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা বলিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; তবেই বলিতে হইল যে, মঙ্গলে পৃথিবীতে সুত-প্রসূতী সম্বন্ধ নহে, এ কেবল পৌরাণিকী কথামাত্র।

সংক্ষেপতঃ অত্রত্য ভূপ্রদেশের সহিত মাঙ্গলিক ভূপ্রদেশের সাদৃশ্যের অভাব নাই। কত

সরিৎ সূর্য্যকিরণে সুবর্ণিত হইয়া শর্করিলরয়পথাবলম্বন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে; কত পয়স্বিনী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নির্ঝররূপে দ্রোণীতলে প্রপতিত হইতেছে, কত প্রণালী সাগরসঙ্গতা সবিদ্বরা সকলকে জলকর প্রদান করিতেছে। মহোদধি কখন অবাতবিক্ষুদ্ধ হইয়া মুকরবৎ প্রতিভাত হইতেছে, কখন বা প্রভঞ্জন-বিলোড়িত হইয়া উত্তাল তরঙ্গ মালা বিস্তার করিতেছে; অধিকন্তু পৃথ্বীর ন্যায় মঙ্গল সূর্য্যের ও স্বীয় চন্দ্রদ্বয়ের আকর্ষণ জনিত অর্কৈন্দব জলোচ্ছাসের সমসাময়িকী গতি দ্বারা আন্দোলিত হয়। মঙ্গলের মহাদেশ সকল পৃথিবীর মহাদেশ সকল অপেক্ষা সপাট; সমস্ত ভূমিই যেন বিস্তৃত সমতল প্রান্তর। জলরাশি সমূহ ভূমির বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট! সকল স্থানই ৩, ৪ হাজার মাইল লম্বা ৫০, ৬০ মাইল চওড়া প্রণালীময়, যেন প্রণালীজালে আবরিত। প্রণালী সকলের তটরেখা সরল ও সমান্তর। অনুপম ভূগোল বৃত্তান্ত। ভবিষ্যতে আরও কত কি জানা যাবে।

মঙ্গলে জীবের বাস। এই খানেই ভূমি ভৌমের সাদৃশ্যের পর্য্যবসান হইল না। উভয়ত্র জীবরাজ্যের অপূর্ব্ব সমতা। মাঙ্গলিক ও ভৌমিকদিগের আকারগত সাম্যের আসন্নতা অনুমিত হয়। সেকালের কথা নহে, গত শতাব্দে বিজ্ঞানবিদ্ কাণ্ট অনুমান করিয়াছিলেন যে, মাঙ্গলিকেরা মানসিক শক্তি সম্বন্ধে মনুষ্যের সহিত সমশ্রেণী হইতে পারেন। অবর গ্রহদ্বয়ের অর্থাৎ বুধ শুক্রের অধিবাসীরা জড়ত্বাধিক্যবশতঃ বিবেকবিরহিত, সুতরাং স্বকর্ম্মের শুভাশুভ ফলানুভাবে অসমর্থ। আমাদের ন্যায় তাঁহারা আধিভৌতিক ও অধ্যাত্মিক অবস্থাদ্বয়ের মধ্যগত সুখকর সদ্ ভাবাপন্ন। ষষ্ঠ তারাগ্রহের (পৃথ্বী একটী তারা গ্রহ) মধ্যবর্ত্তী এই ভূমি ও ভৌম; অতএব অনুমিত হয় এতদ্বয়ের অধিবাসীদিগের দৈহিক ও মানসিক ভাব নাতি জড় নাতি সূক্ষ্ম; এবং বৃহস্পতি আদি উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধগত লোকসকল যথাক্রমে আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করেন। এক এক তারা, এক এক পবিত্রধাম পুন্যাত্মাদিগের আবাস। গ্রহবাসী মনুষ্যের জ্ঞান, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশতঃ কোন কথারই মীমাংসা হইতে পারে না। এইমাত্র অনুমান হয় যে যখন আধ্যাত্মিক ভাব ভৌতিক ভাবের সম্বন্ধাধীন, তখন গ্রহের কঠোরতার অনুরূপ অধিবাসীর জড়তা সম্ভব। সুতরাং ভৌমিক অপেক্ষা বৌধিক ও শৌক্রিক অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট। পুনঃ দেখুন কালসহকারে মনুষ্যের উন্নতি লাভ হয়, মঙ্গল আমাদের পৃথ্বী অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ; ইনি পৃথিবীর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন এবং পৃথিবী শীতল হইবার পূর্ব্বে শীতল হইয়াছেন সুতরাং মঙ্গল পৃথ্বী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উন্নত, পৃথিবী হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা এখনও শিশু, রাজনীতি রাইফেল, কামান, টরপেড়ো আমাদের ক্রীড়নক।

অধুনাতন শরীর-তত্ত্ববিদ্ যথাশাস্ত্র উপপন্ন করিয়াছেন যে, এই গ্রহরূপা ভূতধাত্রীই নরদেহের প্রসবিনী। এ দেহের গুরুত্ব, পরিমাণ, স্নায়ুর সান্দ্রত্ব; কঙ্কালের মান, ভার; পরমায়ু; শ্রমের বিশ্রামের কাল; শ্বাসবায়ুর,—পাচ্যান্নের, পরিমাণ; এ দেহের ইন্দ্রিয় সাধ্য কার্য্য সমূহ; এ যন্ত্রের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই গ্রহকর্তৃক সংবিহিত,—ব্যবস্থাপিত। ফুসফুসের

ধারণশক্তি, বক্ষের গঠন, পাকপ্রণালীর দৈর্ঘ্য, পদদ্বয়ের কার্য্য ও বল, দৃষ্টি, চক্ষের রচনা, সর্ব্বাবয়বের সর্ব্ব কাজের সহিত জীবধাণীর সম্পূর্ণ প্রগাঢ় চির-সম্বন্ধ,—সামঞ্জস্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভূমণ্ডলের অপেক্ষা মঙ্গলমণ্ডলের উপকরণীভূত সমগ্রীসমূহের সান্দ্রত্ব কম—যেমন ১০০এ ৭১। আর তদুপরে দ্রব্যের ভার অত্যল্প। পৃথিবীর আকর্ষণ যদি ১০০ হয়, তবে মঙ্গলের আকর্ষণ ৩৭ মাত্র। সৌর-জগতের অন্তর্গত কোন গ্রহের আকর্ষণ শক্তি এত কম নহে। এখানকার ১ মোন সেখানে গেলে ১৫ সের হইবে। যিনি এখানে ওজনে ২ মোন তিনি সেখানে গেলে ৩০ সের হইবেন সুতরাং এখানে তাঁহার ২০ মাইল বেড়াইতে যে শ্রম হয়, সেখানে তাঁহার ৫০ মাইল বেড়াইতে সেই শ্রম হইবে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, অত্রত্য এবং তত্রত্য মানুষে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু এই পৃথ্বীতলেই কোন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার জীব সর্ব্বতোভাবে স্বজাতীয় ভাবাপন্ন। কোন কোন দেশীয় তরু গুল্ম জীবজন্তু অস্মদ্দেশীয় জীবজন্তু হইতে পৃথকবিধ। একা অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক আমাদিগের উদ্ভিদ বা জন্তু সম্বন্ধীয় প্রাক্‌সংস্কার রূপান্তরিত হইয়াছে।

মঙ্গল এবং মাঙ্গলিক ভূমি এবং ভৌমিক অপেক্ষা উন্নত সুতরাং পরিণত ভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। যদি স্বীকার কর যে, আদৌ ব্যোমকোষে বিকীর্ণ পরমাণু সমূহ উপর্য্যুপরি সংশ্লিষ্ট ও ঘনীভূত হইয়া দিব্য বিগ্রহরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তবে তাপবিষয়ক যন্ত্রবাদের মূলতত্ত্ব অনুসারে উপপন্ন করা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলের তাপমান ২ কোটি ৮০ লক্ষ, পৃথিবীর ৯ হাজার এবং মঙ্গলের ২ হাজার। আবার যদি নীহারিকাবাদ স্বীকার করা যায়, তবে সৌরনীহারিকা হইতে পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল বহুকাল পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। মঙ্গলের গর্ভ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এতদিন শীতল হইয়াছে এবং পৃথিবীর মত ইহার পৃষ্ঠদেশ আভ্যন্তরিক উপদ্রব জন্য ভূমির উত্তুঙ্গতা এবং সাগরকূলের বিষমতা না ঘটিতে পারে। সেখানে যাইতে পারিলে কতই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা যায়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অক্ষাবর্ত্তন,	Axial Rotution.	নীহারিকা,	Nabula.
অধঃসমাগম,	Inferior Conjunction.	পরিচ্ছিন্ন,	Well defined.
অনুলোম অনুযায়ী,	Direct Ratio.	পার্থিব,	Terrestrial.
অনুহেলিক,	Perihelion.	প্রবর,	Superior.
অবর,	Inferior.	পুট,	Crust.
অবনতি,	Inclination.	প্রতিফলিত,	Reflected.
অয়নান্তবৃত্ত,	Solstitial colure.	প্রত্যুৎপত্তি,	Reproduction.
আধিভৌতিক,	Physical.	প্রালেয়,	Ice.
উৎকেন্দ্রত্ব,	Eccentricity.	ভগন,	Time of revolution.
উপগ্রহ,	Satellite.	ভভ্রম,	Revolution.
ঊর্দ্ধসমাগম,	Superior Conjunction.	রোহিণী,	Aldeberan.
কক্ষা,	Orbit.	বটুজ্যু়ী	Betelgeux.
কুটুম্ব,	Member (of family).	বর্ণপট্টিকা,	Spectrum.
কৌসুম্ভ বর্ণ,	Orange Colour.	বিম্ব,	Disk.
ক্ষেদিষ্ট গ্রহ,	Minor planets.	বেধ,	Thickness.
চাপাত্মক,	Angular.	ব্যাকৃতি,	Analysis.
জ্যেষ্ঠা,	Antares.	ব্যাম,	Fathom.
টরপেডো,	Torpedo.	শীর্ষোচ্চ,	Snperior conjunction.
তীব্রতর,	More intensely.	সপাট,	Flat.
নিপীত,	Absorbed.	সান্দ্রত্ব,	Density.

চকোর।

(১)
সুনীল আকাশ-তলে,
বেষ্টিত তারকাদলে,
সুধাংশুরতন,
রজত-চন্দ্রিকা রাশি
ছড়াইয়া হাসি হাসি
করেন গমন।

(২)
সুনীল আকাশ-কূলে,
বায়ুভরে হেলে দুলে,
একটি চকোর,
পিয়িছে চাঁদের সুধা
নিবারিছে চিরক্ষুধা
হরষে বিভোর!

(৩)
আবার বসন্তানিলে
হেলিয়া দুলিয়া,
উন্মুক্ত বাতায়নে,
পশি মম গৃহাঙ্গনে,
মুহূর্ত্তের তরে থাকি
চলিল ছুটিয়া।

(৪)
শূন্য হ'তে এসেছিল,
শূন্যে পুনঃ লুকাইল,
অনন্তে ডুবিল,
মহান্ অনন্ত-তলে,
(যথা রবিশশী জ্বলে)
ছুটিয়া চলিল।

(৫)
ঠিক ও বিহঙ্গ সম
মানব-আত্মন্,
সম্মুখে অনন্ত তার,
পশ্চাতে অনন্ত তার,
মুহূর্ত্তের তরে এই,
জাগ্রত স্বপন!

(৬)
এই ক্ষুদ্র দেহগৃহে,
মুহূর্ত্তের তরে থাকি,
যায় সে চলিয়া,
উধাও উধাও ধায়,
(রবিশশী লুটে পায়)
শূন্যে মিলাইয়া।

(৭)
হায় ও চকোর সম,
প্রিয় আত্মা ধন মম,
কবে বা ছুটিবে।
এ মোহ-শৃঙ্খল কাটি,
আমার সোণার পাখী
কবে বা উড়িবে!

(৮)
পিয়িবে তাঁহার সুধা,
শতকোটি চাঁদ যার
চরণে লুটায়,
গায়িবে তাঁহার নাম,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যাঁর
কটাক্ষে লুকায়!

ছেলে মানুষ করা।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক সদ্‌গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে বটে, কিন্তু কি প্রণালীতে সন্তানের নীতি-শিক্ষার সূত্রপাত করিতে হইবে সে সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচনায় এ পর্য্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ের আলোচনা একান্ত প্রার্থনীয়। "মান্দ্রাজ ক্রিশ্চান্ ভর্ণাক্যুলার এডুকেশন্ সোসাইটি" নানা ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া এ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক* প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবটি তাহাই অবলম্বন করিয়া রচিত হইল। আশাকরি ইহা আমাদের জননী-পাঠিকাবর্গের কিছু উপকারে লাগিবে।

বাৎসল্য স্নেহের মত এমন প্রবল মনোবৃত্তি আর কিছুই নাই। সর্ব্বজয়ী দাম্পত্যপ্রণয় কেবল ইহারই নিকট পরাস্ত। অতি পুরাকাল হইতে জগতের সাহিত্যে এই বাৎসল্যরসের যেরূপ প্রচুরতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ অন্য কিছুরই নহে। কেহ কেহ বলেন, সাহিত্যে প্রেমের অধিকার ইহার অপেক্ষা প্রবলতর। কিন্তু আমরা যে ভাবকে প্রেম বলি, তাহাত সম্পূর্ণ একালের জিনিষ! প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমচিত্র নির্দ্দেশ করিবার জন্য সচরাচর সকলে রামসীতা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইয়াছেন, তখন রামচন্দ্রের বিরহবর্ণনা আরম্ভ করিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে "কামশোকাভিপীড়িতঃ" এই বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। কপোত কপোতীর, ময়ূর ময়ূরীর কামোল্লাসনৃত্য দেখিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শরৎকালে জ্যোৎস্নারজনীতে যখন সুগ্রীব তাঁহাকে "গুড্‌নাইট্" ইচ্ছা করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহা দেখিয়া পত্নীহারা রামচন্দ্র বিরহে আর বাঁচেন না। সেকালে মানুষের হৃদয়ে প্রেম যে ছিল না একথা বলি না; তবে বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন প্রেমের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু বাৎসল্যস্নেহের মাহাত্ম্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমানভাবে কীর্ত্তিত। কবি যে বলিয়াছেন ঃ—

> আমার আকাঙ্ক্ষা সম এমন আকুল,
> এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
> এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আর ?

একথা বাৎসল্যস্নেহের প্রতি যেমন প্রযুজ্য, তেমন আর অন্য কোনও মনোবৃত্তির প্রতি নহে। সন্তানকে যে স্নেহ করিতে হইবে বা কতখানি করিতে হইবে তাহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না;—কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, সন্তানের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক, পিতামাতা তাহার ঠিকই অনুষ্ঠান করিবেন। যত প্রকার শিল্পকর্ম্ম আছে, সকলের অপেক্ষা এই শিল্পটিই কঠিন—সন্তানের চরিত্রগঠন করিয়া দেওয়া।

প্রকৃতি মানুষে অনুকরণপ্রিয়তার চূড়ান্ত নমুনা দেখাইয়াছেন! শিশুর জ্ঞানচক্ষু একটু একটু করিয়া ফুটিতে থাকে, সে তাহার পিতামাতা প্রভৃতির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন শিক্ষালাভ করে। সুতরাং জনকজননীর বলিলে চলিবে না

* The Training of Children for Indian Parents.

—"ও পথে যাও" ;—"এই পথে এস" বলিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। "এই পথে এস" এটা কবে হইতে বলিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া অনেকে পাঁচ ছয় বৎসর অলস ভাবে কাটাইয়া দেন ; ইতিমধ্যে শিশুর মনে কত প্রকার কুশিক্ষার বীজ পড়িয়া, সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যখন হইতে শিশু মাতার আদর, স্নেহদৃষ্টি পাইলে হাস্য করিয়া থাকে, তখন হইতেই তাহার শিক্ষার আরম্ভ। এই সময়ে তাহাকে প্রফুল্লতা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বাড়ীতে সর্ব্বদা হাসি খুসী, সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ, সে বাড়ীর শিশুরাও খুব হাসে। যে বাড়ীতে কলহ কচ্‌কচি, মনান্তর, ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা,—সে বাড়ীর শিশুরা ঠাকুরদাদার মত গম্ভীর হইয়া থাকে। গাছপালা বসন্তের বাতাসে বিকসিত হইয়া উঠে—সেইরূপ সকল পরিবারে আনন্দের বায়ুহিল্লোল সর্ব্বদা সঞ্চালিত রাখা উচিত। এইরূপ "জলহাওয়া"তে যে শিশু পরিবর্দ্ধিত হইবে, ভবিষ্যতে বিপদের সময়, দুঃখকষ্টের দিনে সংসারটাকে নিতান্ত মরুভূমি বলিয়া তাহার মনে হইবে না—ইহা অল্প সৌভাগ্য নহে। শিশু চলিতে শিখিলে, খেলিতে শিখিলে, একটি অতি সহজ উপায়ে তাহাকে নিষিদ্ধ স্থানে গমন, নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি হইতে বিরত করা হয়—সেটি কোন মিথ্যা ভয় দেখাইয়া। কিন্তু শিশুরা প্রায়ই সেটা কোন না কোন মতে ধরিয়া ফেলে। যে দিন প্রথম এইরূপ হয়, সেইদিন তাহার মনে মিথ্যার বিষবীজ রোপিত হইয়া যায়। অনেক পিতামাতা স্নেহের পুতলির হস্তে শৈশবে রাজক্ষমতা দিয়া রাখেন। ইহাতে তাহারা ক্রমে অত্যন্ত একগুঁয়ে হইয়া দাঁড়ায়! ছেলে বলে —"দাও ওটা,"—"পারিনে"—"না দিতেই হবে"—"না পারিনে; তোর কথাতেই কথা না কি ?"—"দি—তেই—হ—বে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ" করিয়া ছেলে যাই চীৎকার আরম্ভ করে তখন মাতা বলেন—"নে বাবু যা—আর পারিনে।" এইরূপ কয়েকবার হইলেই শিশু শিখিয়া লইল, যখন কোনও জিনিষ সহজে পাইব না তখন এমনি করিয়া গোঁ ধরিব। অভ্যাসক্রমে এত পাকা হইয়া যায় যে, তাহা সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জিনিষটা না দিলেই তাহার এ শিক্ষাটা হইতে পাইত না, হয় ত সে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে থাকিত ; তাহাতে পিতামাতার মনে ব্যথা লাগে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতাকে এ সমস্তই সহিতে হইবে।

শিশুকে প্রথমেই কি শিক্ষা দিতে হয় ?—সুবাধ্যতা। যেমন মানব-শরীরে জ্বর হইতে উৎপন্ন না হইতে পারে এমন ব্যাধিই নাই, সেইরূপ শিশুদের অবাধ্যতা হইতে জন্মিতে পারে এমন দোষই নাই। বালকের যত কিছু ভাল গুণ থাকা সম্ভব, সকলের মূল সুবাধ্যতা। অনেক পিতামাতাকে এই নালিশ করিতে শুনিতে পাই—"ছেলেটা ভারি অবাধ্য, কিছুতেই বাগ মানাতে পারি নে।" কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে একমাত্র তাঁহারাই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দোষী। শিশুকে যাহা শিখান হইবে সে তাহাই শিখিবে—তাহার আর দোষ কি ? পিতা মাতা কেমন করিয়া সন্তানকে অবাধ্য হইতে শিক্ষা দেন, তাহার উদাহরণ এই :—"গোপাল চলে আয় বল্‌ছি, নইলে মার খাবি।" গোপাল সে কথা গ্রাহ্যও করিল না। খেলা

শেষ হইলে যখন বাড়ী আসিল, তখন কিঞ্চিৎ বকুনি খাইল মাত্র ;—মার খাইল না। সে শিখিল মাতার কথা না শুনিলে কিছু ক্ষতি নাই এবং "মার খাবি" প্রভৃতি, ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। আর একটি উদাহরণ এই :—দুইটি মহিলায় কথোপকথন হইতেছে—তিন বৎসরের শিশুটি কাছে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।

"খোকা কেমন আছে গা ?"

"আছে ভাল ; কিন্তু এমন দুষ্টু, দিদি, দেখনি। ওকে নিয়ে আমি ত আর পারিনে।"

"কেন ভাই ছেলেকে দেখ্‌লে ত দুষ্ট বলে বোধ হয় না ?''

''না, স্বভাব নিতান্ত খারাপ নয় ;—কিন্তু (হাসিতে হাসিতে) যা বল্‌ব করিস্‌নে, তা করেছে বলে কথা! আমি ওকে বলে দিয়েছি, খবরদার তুই কাঁচের ভাল গেলাস্‌টাতে হাত দিবিনে—পড়্‌লেই ঠুং করে ভেঙ্গে যাবে। এই তুমি আস্‌বার একটু আগে, গেলাসের ভিতর একটু আঙ্গুল দিয়ে, আমার পানে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল। আমি বল্‌লাম—'তুলে নে হাত'—অমনি আরও একটা আঙ্গুল দিলে। আমি চোখ রাঙাবার চেষ্টা কর্‌লাম, আঙ্গুল তুলে নেওয়া চুলোয় যাক্‌, দুটো হাতই গেলাসের ভিতর দিয়ে তার পর হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পালিয়ে গেল। আর কিছু নয়—কেবল আমাকে জ্বালাবার জন্য এইটে করলে গো—এমন পাজি দেখনি!'' ছেলে সব শুনিল, এবং যাহা শিখিল তাহা শীঘ্র ভুলিবে না। একে ত ছেলেদের প্রকৃতি স্বভাবতঃই একটু অবাধ্য, তাহার উপর তাহাদের অবাধ্যতার দরুণ শাস্তি বিধান না করিয়া, সে বিষয়ে লোকের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে গল্প করিয়া তাহাদের অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই একটু কড়া শাসন করিলে আর এ ব্যাধি জন্মিবার অবসর পায় না। যাহা বালককে একবার করিতে বলিবে তাহা যেন তাহাকে কোন মতেই লঙ্ঘন করিতে না দেওয়া হয়। হইতে পারে তুমি মুখের কথায় তাহাকে একটা কিছু বলিয়াছ, সেটা সে না করিলে কোনই ক্ষতি নাই—কিন্তু "পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি" এই যে একটা ধারণা, ইহা বিলক্ষণ ক্ষতি করিবে। সুতরাং আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—এটা যদি সে করিতে না চায়, তবে তাহাকে করিতে বাধ্য করা উচিত কি না ; তাহার পক্ষে এটা সুসাধ্য কি না। যে কোন কারণেই হউক, বালককে যদি আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে দেওয়া হয়, তবে তাহাকে শিখান হয়—আজ্ঞার কোন একটা মূল্য মর্য্যাদা বা গুরুত্ব নাই। ওটা কিছুই নয়, মুখের কথা মাত্র, শুনিলেও চলে না শুনিলেও চলে। আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া করিয়া ক্রমে ছেলে এমন "ঢীট্‌" হইয়া পড়ে যে, শেষে আর কিছুতেই তাহাকে বাগাইতে পারা যায় না। এক একটা বিশেষ অবস্থায় ছেলের সহিত পিতামাতার যুদ্ধ চলিতে থাকে, কা'র জিদ বজায় থাকিবে। এই যুদ্ধে যে পক্ষের একবার জয়লাভ হয়, ভবিষ্যতে সব যুদ্ধে সেই পক্ষই জয়ী থাকে। একটা উদাহরণ দিতেছি :—সন্ধ্যাবেলায় পিতা সুরেন্‌কে বলিলেন—"এস, পড়।" সুরেন বেশ অক্ষর চিনিত, কিন্তু এ সময়ে তাহার মেজাজটা ভাল ছিল না। পিতা বর্ণমালার প্রথম অক্ষরে অঙ্গুলি রাখিয়া

বলিনেন—"এটা কি ?" সুরেন কিছুই বলিল না, বিরক্তভাবে বহিপানে চাহিয়া রহিল। পিতা আদর করিয়া বলিলেন "কেন, তুমি ত চেন ক !" "আমি ক বল্‌তে পারি নে।" পিতা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বল্‌তেই হবে তোকে।" সুরেন বলিল না। সে গোঁ ধরিল, বলিব না। অন্য পিতা হইলে এ অবস্থায় ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু ইনি বুঝিলেন, যদি ছেলের জিদ্ বজায় থাকিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে তাহাকে বাধ্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া দণ্ডিত করিলেন। আবার তাহাকে পড়িবার ঘরে আনিয়া বলিলেন—"এটা কি বল।" সুরেন, বলিবে না। তখন পিতা তাহাকে দ্বিতীয়বার অধিক করিয়া দণ্ড দিলেন। তাহার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি বল।" সুরেন তথাপি বলিল "আমি জানি না।" "জানিস্‌নে এটা কি ?" "আমি ক বল্‌তে জানিনে।" এবার, পিতা তাহাকে যতটা প্রহার করিতে সাহস করিলেন, ততটা করিলেন। কিন্তু তথাপি বালক জিদ ছাড়িল না। আপনার সন্তানকে স্বহস্তে এমন করিয়া আঘাত করিতে হইতেছে ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। জননী সেখানে বসিয়া কাঁদিতেছেন, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলিলেন না। তিনি জানিতেন ইহা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্যই হইতেছে। পিতা, পুত্রকে অধিকতর দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার জন্য পুনর্ব্বার প্রস্তুত হইলেন ; কিন্তু এবার আর তাঁহাকে যাইতে হইল না। সুরেন বলিল—"বাবা, আমি বল্‌ব।" পিতার তখন আর আনন্দের সীমা নাই। সুরেন ক বলিল। পিতা বলিলেন—"এবার যাও, তোমার মাকে বলগে' এটা কি !" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি বাবা ?" সুরেন বলিল—ক। কাছে যে সকল ছেলে পিলে বসিয়াছিল, তাহারা সসম্ভ্রমে দেখিল, কোন্ পক্ষের জয়। সুরেন বুঝিল,—কথা শুনাই মঙ্গল।—এক সময়ে একটি পীড়িত বালক ঔষধ পান করিতে আপত্তি করে। অনেক বাবা বাছা, অনেক বলা কহা—কিছুতেই সে শুনিল না। তখন তাহার পিতা পীড়িত অবস্থাতেই তাহাকে দণ্ডিত করিলেন। সে নিজে বুঝিল, পরিবারস্থ অন্যান্য বালকে দেখিল, পীড়িত থাকিলেও নিস্তার নাই, কথা শুনিতেই হইবে। নিতান্ত শিশু কিম্বা পীড়িত, এ সব ওজরে অবাধ্যতা কখনও ক্ষমা না করা হয়—খুব সাবধান। সুবাধ্যতার লক্ষণগুলি এই ঃ—১—একবারের বেশী বলিতে হইবে না। যাহা করিতে বলা হইবে, তাহা অবিলম্বে করা চাই। ২—কেন, কি বৃত্তান্ত, এ সব কৈফিয়তের আবশ্যক হইবে না। একটু বয়স্ক বালকদিগকে কিন্তু এ সব বলা প্রয়োজন ; আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে—পরে নহে। ৩—কিছু দিবার প্রলোভন বা ভয়প্রদর্শন প্রয়োজন হইবে না। নির্ব্বোধ পিতামাতা এটা দিব ওটা দিব বলিয়া ছেলেকে কথা শুনাইয়া থাকেন, কিন্তু এটা ভারি দোষের। ছেলে আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, পিতা বা মাতার আজ্ঞা বলিয়া ;—কিছু পাইবার প্রত্যাশায় নহে। ৪—কথা শুনাটা বেশ ভাল মনে চাই ;—মুখখানা হাঁড়ি করিয়া কথাশুনা সুবাধ্যতার লক্ষণ নহে। ৫—পিতামাতার আদেশ তাঁহাদের অসাক্ষাতেও সমানভাবে রক্ষিত হইবে। "বামুণ গেল ঘর ত লাঙল তুলে ধর" না হয়।

সন্তানের দোষগুণের জন্য যথাযথ দণ্ডপুরস্কারের বিধান অতি কঠিন কার্য্য। ইহাতে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। অমুক দোষ করিলে অমুক সেক্‌সনের মতে এই দণ্ড, এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকার দরুণ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর্ত্তব্য তত কঠিন নহে; কিন্তু যেখানে কোন আইন বিধিবদ্ধ করা নাই, সেখানে যথার্থ শাসনকার্য্য অধিক দুরূহ, তাহার আর সন্দেহ কি? এস্রাজ বাজান অপেক্ষা বেহালা বাজান শক্ত, কারণ বেহালায় এস্রাজের মত পর্দ্দা বাঁধা থাকে না।

নিন্দা বা প্রশংসা অতি সহজ ও সাধারণ দণ্ড-পুরস্কার। কথায় কথায় নিন্দা বা প্রশংসার প্রয়োগ করিলে বড় হানি হয়। তাহাতে নিন্দার তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হইয়া যায়, প্রশংসার মূল্য কমিয়া যায়। যে প্রত্যহ লুচি কচুরি খাইতে পায়, তাহার পক্ষে এটা আর "লক্‌সরি" থাকে না। সেইরূপ প্রতি সামান্য কাযে যে বাহবা পাইয়া থাকে, সে বাহবামাত্র পাইবার জন্য একটা কিছু করিতে সহসা প্রস্তুত হইবে না। পক্ষান্তরে, যে প্রতি ক্ষুদ্র অন্যায় কাযে লাঞ্ছনা সহিয়াছে, লাঞ্ছনা আর তাহার গায়ে লাগে না। আনাড়ির হস্তে অল্পমূল্য-ঘড়ির মত যখন কিছুদিন পরে নিন্দাপ্রশংসার কল বিকল হইয়া যায়, অজ্ঞ পিতামাতা তখন লোভ বা ভয়-প্রদর্শন আরম্ভ করেন "নাইবে এস লক্ষ্মী ছেলে—একটা সন্দেশ দিব এখন" নয় ত "নাইবিনে, পাজি হতভাগা—মার খেলি—আয় বল্‌ছি।" মনে কর, একবার সন্দেশ পাইবার লোভে বালক স্নান করিল; আবার যে দিন তাহাকে স্নান করাইবার প্রয়োজন হইবে, সে দিন সে খুব সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসা করিবে—"কি দেবে বল?" অথবা যদি দেখে স্নান না করিয়াও মার খাইতে হইল না, তবে ভবিষ্যতে "মার খাবি" এই ভয়প্রদর্শন করায় আর কোন ফলই হইবে না।

প্রতি কথায় দোষ বাহির করা অতি মন্দ। দিবা রাত্রি "আঃ কি করিস্" "ওতে হাত কেন?" "চুপ্ কর্‌না, কি বালাই!" ইত্যাদি চীৎকার বড় অনিষ্ট করে। ছোট ছেলেদের এক আজ্ঞা দুই চারিবার ফিরিয়া বলিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা এমন ভাবে বলা চাই যে ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ না পায়, অথচ দৃঢ় ভাবে বলা হয়।

দণ্ড পুরস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য, ছেলেকে হাতে কলমে শিখাইয়া দেওয়া, এটা ভাল, এটা মন্দ,—সুতরাং ইহার বিধান খুব নিরপেক্ষ ভাবে হওয়া চাই। একজন যে কাজ করিয়া তিরস্কৃত হইলমাত্র, অন্যে ঠিক সেই কাজ করিয়া প্রহার না খায়। অপিচ—কেহ আজ যে কাজ করিয়া শাস্তি পাইল, কাল সেই কাজ করিয়া পার পাইয়া না যায়। এটা অতি সচরাচর ঘটিয়া থাকে। যখন পিতামাতার মন বেশ প্রফুল্ল থাকে, তখন গুরুপাপে লঘুদণ্ড হয়, বা কোন দণ্ডই হয় না; কিন্তু মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া থাকিলেই সর্ব্বনাশ! তখন লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়া থাকে। ইহাতে ছেলেরা বড় মুস্কিলে পড়ে। কোন্ কাজটা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় স্থির করিতে পারে না। শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—আমরা যে দণ্ডিত হই, তাহা দোষ করি বলিয়া নহে—মা বাপের মন ভাল থাকে না বলিয়া। ইহাতে কত অনিষ্ট বলাই বাহুল্য।

বালক পুরস্কারের যথার্থ উপযুক্ত হইলে, টাকা পয়সা বা সন্দেশ মণ্ডা পুরস্কার দেওয়ার রীতি ভাল নহে। সন্দেশ পুরস্কারের লোভ দেখাইলে ছেলেরা ঔদরিক হইয়া পড়ে। আর সন্দেশ দিব সন্দেশ দিব বলিলে, ছেলেরা মনে করে সন্দেশই বুঝি পৃথিবীর সার পদার্থ। কোনরূপ খাবার জিনিষ পুরস্কার স্বরূপ না দিলেই ভাল হয়। সন্দেশ প্রভৃতিকে পুরস্কারের "লিষ্টে" রাখিলে তাহাদের মর্য্যাদা অযথা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ছোট বালকবালিকাদের জন্য খেলানা—যাহা শীঘ্র না ভাঙ্গে এবং ব্যবহার করিতে কিছু কারিগরির আবশ্যক, এক বাক্স কাঠের রঙ্গীন ইট ; একটু বয়স হইলে আতসী কাচ, খেলার দূরবীণ, ষ্টিরিয়োস্কপিক্ ছবির বাক্স, লালনীল পেন্‌সিল, ভাল দোয়াত, নূতন রুল, রঙের বাক্স ইত্যাদি উপযুক্ত পুরস্কার। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিবার স্থানে লইয়া যাওয়া, তাহাদের বন্ধুবান্ধব দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ করিতে ছুটি দেওয়া, অবস্থানুসারে রেলপথে কিছু দূর বেড়াইয়া আনা, উত্তম পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কার্য্য করাইতে নাই ; কার্য্য করিবার পরে মধ্যে মধ্যে পুরস্কৃত করা ভাল। বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক যাহাতে বালক দণ্ডপুরস্কারের প্রতি সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যায়।

দণ্ডবিধান সম্বন্ধে এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ১—দণ্ডভয়ের সুফল তাহার নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে। বালকের যেন ইহা স্থির জানা থাকে, যদি দণ্ড পাইবার মত কাজ করি, তবে আমাকে দণ্ড পাইতেই হইবে ;—সুতরাং দণ্ডার্হ কার্য্য যেন কখনও কোনও অবস্থায় মার্জ্জনা না করা হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। দুইটি ভিন্ন সৈন্যদল একপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল। এক দলের নেতা একজন প্রিন্স্, অপর দলের নেতা এক ড্যাক্। প্রিন্সের কোনও সেনার চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ড্যাক্ আসিয়া প্রিন্স্‌কে অনুরোধ করিলেন, যাইতে দি'ন। প্রিন্স্ বলিলেন—"এরূপ অবস্থায় আমি কখনও কাহাকেও ক্ষমা করি নাই।" ড্যাক্ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ, এরূপ করিলে ত আমার অর্দ্ধেক লোকের এতদিন ফাঁসি হইয়া যাইত।" প্রিন্স্ বলিলেন—"এই জন্যই ত তোমার দলে এত বিভ্রাট। আমি কখনও কাহকেও ক্ষমা করি না সেই ভয়ে আমার দলে অতি অল্প লোকই অপরাধ করিয়া থাকে।" ২—দণ্ড যত অল্পে সারিলে চলে, তাহার অধিক ব্যবহার না করা হয়। চোখরাঙানি যদি যথেষ্ট হয়, তবে স্বরপ্রয়োগ করিবে না। সামান্য ধমক দিলে কাজ হাসিল হয় এমন বুঝিলে ঝাঁঝিয়া উঠিবে না। কথায় যদি না হয়, তবেই চাবুক ধরিতে হইবে। অনেকে এপর্য্যন্ত উঠিয়া চাবুক লইবার সময় রণে ভঙ্গ দিয়া থাকেন। কিন্তু সাবধান, তাহা করিলেই সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। পুরস্কার বন্ধ করা মন্দ দণ্ড নহে। ৩—দোষের পরিমাণ বুঝিয়া দণ্ডের মাত্রা স্থির করা উচিত। বালক যদি বল্ ছুড়িয়া ভাই কি বোন্‌কে মারিয়া থাকে, বল্‌টা কাড়িয়া লইলেই যথেষ্ট। অসাবধানতার দরুণ যদি নিজের কিছু ভাঙ্গিয়া বা হারাইয়া ফেলিয়া থাকে, নূতন একটা শীঘ্র আর না দিলেই হইবে। যদি কেহ অপরের একটি খেলানা লোকসান করিয়া দেয়, তবে তাহার নিজেরটি

দিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করিবে। ৪—যদি বালক ইচ্ছা করিয়া দোষ না করিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য কোন দণ্ড দিতে নাই। যাহা দৈবাৎ ঘটে, তাহার জন্য ছেলেকে দণ্ডিত করিলে শুধু যে তাহার প্রতি অবিচার করা হয় এমন নহে, সে যখন প্রকৃত দোষ করিয়া দণ্ডিত হয়, সে দণ্ডের তেমন গুরুত্ব থাকে না। সাধারণতঃ কুফলের পরিমাণে দোষের সুতরাং দণ্ডের মাত্রা স্থির করা হয়, কিন্তু এটা নিতান্ত অন্যায়। কয় বৎসর হইল এক ব্যক্তি রেলগাড়ীতে আসিতে আসিতে তামাক খাইবার জন্য টিকা ধরাইয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় দেশলাইটি গাড়ীর মেঝেতে ফেলিয়া দিয়াছিল। অন্য লোকের দুই তিন বস্তা বাজি বারূদ সেইখানে রাখা ছিল তাহা সে জানিত না। গাড়ী যখন মধ্যপথে মহাবেগে ছুটিতেছে, তখন সেই তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র কক্ষে ভয়ানক তুবড়ী, হাযুই, বমা ছুটতে লাগিল! অচিরে গাড়ীতে আগুন ধরিল, এবং গাড়ীশুদ্ধ লোকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় সে গাড়ীতে অধিক লোক ছিল না; যাহারা ছিল, তাহারা দাঁড়াইয়া পুড়িতে লাগিল। জামালপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তাহাদের বাহির করা হইল;—সে কি ভয়ানক দৃশ্য! তাহাদের দেহের চর্ম্ম শাদাবর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ মরিয়াছে; যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের আর্ত্তনাদে ষ্টেশন্ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তাহারা রেলওয়ে-হাঁসপাতালে নীত হইল; যাহার জন্য এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল সে, এবং আর দুই তিন জন ভিন্ন কাহাকেও বাঁচান গেল না!—অপর পক্ষে এক ব্যক্তি একজনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল; গুলিটা দৈবাৎ মানুষকে না লাগিয়া একটা গাভীকে ধরাশায়ী করিল! এখন, ফলের পরিমাণে অপরাধের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, প্রথম ব্যক্তিকে সবান্ধবে ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইতে হয়; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, দশ বিশ টাকা গাভীর মূল্য স্বরূপ আদায় করিয়া অধিকারীকে দিলেই চলে। ৫—ছেলেকে সর্ব্বদা পাজি, হতভাগা, গাধা বলিয়া ভর্ৎসনা করা উচিত নহে। তাহার দোষগুলি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে নাই। এরূপ করিলে ক্রমে লজ্জার প্রাণবিয়োগ ঘটে, ছেলে "দুকাণকাটা" হইয়া দাঁড়ায়। কথিত আছে "এক কাণ কাটা" লজ্জায় গ্রামের বাহির দিয়া বাহির দিয়া পথ চলিত; কিন্তু "দুকাণকাটা" অসঙ্কোচে গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইত। ৬—ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ছেলেকে শাস্তি দিবে না। ইহাতে মাত্রা ঠিক রাখিতে পারা যায় না, পরন্তু দেখায় যেন শাস্তিবিধানটা প্রতিশোধ লইবার জন্য—সংশোধনের জন্য নহে। শাস্তি দিবার সময় যদি তুমি অত্যন্ত দুঃখিত এরূপ ভাব দেখাও, তবে সেটা বালকের মনে বড় আঘাত করিবে। একবার এক পিতা তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন দেখিয়া মনোকষ্টে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে ছেলেটির এতদূর মনে লাগিয়াছিল যে সে বলিল—"বাবা, আমাকে শাস্তি দাও, কাঁদিয়ো না।"

কেহ কেহ মনে করেন, বেত্রই অশিষ্ট বালকের একমাত্র ঔষধ। কিন্তু তাহা ঠিক নহে;—একমাত্র নহে—চরম বটে। বেত্র ব্যবহার যত কম করা হয় ততই ভাল। প্রথম

হইতে সাবধান হইলে ইহার প্রয়োজন আদৌ হইবে না। কিন্তু যদি বিগড়াইয়া থাকে, তবে লক্ষণ বুঝিয়া সময়মত এ মহৌষধ প্রয়োগ করিতে কোনমতেই কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। বালক একটু বয়স্ক হইলে, বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলা, মৃদু ভর্ৎসনা ইত্যাদিতে অধিক ফল হয়।

বালক যদি দোষস্বীকার করিয়া যথার্থই দুঃখিত হয়, তবে আর কোন শাস্তিবিধানেরই আবশ্যকতা থাকে না। বিশেষ চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বালকের মনে অন্যায় কর্ম্মের জন্য খাঁটি অনুতাপ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ ইহা না হইল, ততক্ষণ প্রায় কিছুই হইল না। ভবিষ্যতে সেই কর্ম্ম নিবারিত হওয়ার পক্ষে শতগুণ শাস্তিভয় অপেক্ষা ইহা সমধিক ফলপ্রদ। যখনি দেখিবে কুকর্ম্মের জন্য বালক আন্তরিক দুঃখিত ও অনুতপ্ত, তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সদয় সাদর ব্যবহার স্থাপন করিবে। ক্ষমা—ইহা সময়মত প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

বড় সহজে বালকেরা মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়া থাকে। আমাদের দেশে এখনও অনেকে মনে করেন, যে মিথ্যায় পরের কোনও অনিষ্ট না হয়, তাহা বলিতে কোনও দোষ নাই। যে লোক নিজের ক্ষতি করিয়াও সত্যকথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করে এমন লোক বিরল নহে! গ্রন্থকার বলিতেছেন—Lying is one of the crying sins of India.—বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার বিষয়, একথাটা নিতান্তই সত্য। চিরদিন কিন্তু হিন্দুর এ দুর্নাম ছিল না। এক সময়ে হিন্দুজাতি সত্যবাদিতার জন্য জগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। বহুবর্ষব্যাপী অধীনতা অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জর হইয়া আমরা সে মহামূল্য রত্ন হারাইয়াছি। ইংরাজ রাজের কল্যাণে আমরা এখন বড় সুখে আছি। বহু কাল আমাদের অদৃষ্টে এমন ঘটে নাই। এখন আবার সেই মহামূল্য রত্নটি ফিরিয়া পাইতে আমাদের প্রাণপণ যত্ন হউক। আমরা বঙ্গের লক্ষ লক্ষ জননীকে গলবস্ত্রে, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিতেছি।

এ দেশের অধিকাংশ হতভাগ্য শিশু শৈশবে পিতামাতার কাছেই মিথ্যা কথা শিক্ষা করে। মা জল আনিতে যাইবেন, ছেলে শুনিলে সঙ্গে যাইতে চাহিবে; মা বলিয়া যান,—"এই অমুকের বাড়ী যাচ্চি, তুমি খেলা কর বসে।" ছেলে দণ্ড দুই পরে জানিতে পারে, মা মিথ্যা কহিয়াছেন। পিতা নিমন্ত্রণে যাইবেন, সঙ্গে ছেলে যাইতে চায়। ফিরিতে রাত্রি হইবে, হিম লাগিবে, ছেলেকে লইয়া যাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। তাহাকে বলা হয়,—"তুমি ঘুমোও শুয়ে, আমি যাব না।" পরদিন প্রভাতে ছেলে জানিতে পারে বাবা মিথ্যা কহিয়াছেন। ছেলেকে ঔষধ পান করাইতে হইবে, সে খাইতে চাহে না। তাহাকে বলা হয়—"তেতো নয়, খাসা মিষ্টি, তুমি খেয়ে দেখ।" পরমুহূর্ত্তেই ছেলে জানিতে পারে, পিতা মিথ্যা কহিয়াছেন। যে হতভাগ্য শৈশব হইতে দেখিতেছে পিতা মিথ্যা কহেন, মাতা মিথ্যা কহেন, পরিজন, প্রতিবেশী, দাস দাসী সকলে অবাধে অসঙ্কোচে প্রতিদিন সহস্র সহস্র মিথ্যা

কথা কহে, সে পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং ওয়াসিংটন বা বিদ্যাসাগর হইলেও মিথ্যা কথা শিখিবে। আমরা কোন কোনও গৃহিণীকে এই বিষয়ে সাবধান করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া এই প্রকার উত্তর পাইয়াছি ঃ—"অত করিতে গেলে কি ছেলে ভুলান যায় বাছা ? সবাইকার মা বাপ ত এমনি করেই চিরকাল ছেলে মানুষ করে এসেছে, তারা কি সবাই বড় বড় মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে ?"—এ কথা সত্য বটে, আমাদের মধ্যে অনেকে যাঁহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা বলেন না, তাঁহারা শৈশবে এইরূপ করিয়াই "মানুষ" হইয়াছিলেন। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে মিথ্যার প্রতি যতদূর ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকা প্রয়োজন, ততটা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদিগকে সত্যবাদী করিতে সুশিক্ষার যতটা প্রয়াস আবশ্যক হইয়াছে, অন্যথা ততটা হইত না। মিথ্যা বলা অন্যায়, এ জ্ঞান অতিবড় মিথ্যাবাদীরও আছে। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকিলেই হইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা থাকা চাই। অনেক লোক বলেন, অমুক-মাংসটা খাইলে কোনই হানি নাই, তাহা এখন জ্ঞানে বুঝিতে পারি, কিন্তু খাইবার কথা মনে করিতেও বমনোদ্রেক হয়! ইহার কারণ কি ? শৈশব হইতে পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধুর মুখে, প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে এত বক্তৃতা শুনিয়াছেন এবং পাঠ করিয়াছেন, যে সেই যে একটা সংস্কার, তাহা কিছুতেই উন্মূলিত হয় না। হিন্দু সন্তানের হাম্বারবকারী চতুষ্পদ বিশেষের মাংস খাইবার বিরুদ্ধে যে একটা অতি অতি প্রবল সংস্কার আছে, মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে সেইরূপ একটা প্রবল সংস্কার মনে জন্মিতে পায় ; তবেই আর কোন ভাবনা থাকে না। জগতে এমন পণ্ডিতের অভাব নাই যাঁহাদের মতে মিথ্যা বলা অন্যায় নহে যদি তদ্দারায় কাহারও অপকার না হইয়া নিজের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। যদি ঘটনাবশতঃ কেহ এইরূপ গুরুর শিষ্য হইয়া পড়েন, তথাপি তিনি শৈশবের সেই সংস্কার-দুর্গের মধ্যে থাকিয়া রক্ষা পাইয়া যাইবেন।

বালকবালিকারা সচরাচর কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকে। তাঁহারা অনেক সময়ে আলস্য বা অনবসরবশতঃ সুদীর্ঘ যথার্থ উত্তরের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত মিথ্যা উত্তর দিয়া ছেলেকে থামাইয়া থাকেন। যাহা বলিলে সে বুঝিবে না, তাহার পরিবর্ত্তেও এইরূপ মিথ্যা উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে যথা—"বাবা, এঞ্জিন্ কি করে অত দৌড়ায় ?" "ওর ভিতর একটা মোষ পোরা আছে।" তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে ইহা বলা ভাল—"এখন না অন্য সময় বলিব" বা এখন বুঝিবে না ; বড় হইলে, লেখাপড়া শিখিলে বুঝিতে পারিবে।"

সময়ে সময়ে দাস দাসীরা বালকবালিকাদিগকে মিথ্যা কথা শিখাইয়া দেয়। একটি বালক কাচের ফুলদানী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, চাকর শিখাইয়া দিল—"বলিয়ো বেরালে ফেলিয়া দিয়াছে।" দাসদাসীগণকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের বলিয়া রাখা ভাল, এরূপ ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।

বালককে কখনও এরূপ অবস্থায় ফেলিয়ো না, যাহাতে তাহার মিথ্যা বলিবার প্রলোভন হইতে পারে। কোনও বহুমূল্য দ্রব্য ভাঙ্গিয়া বা পড়িয়া লোকসান হইলে ছেলেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়, "কে করেছেরে?" যদি সে করিয়া থাকে, তবে হয়ত ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিবে। এইরূপ বারকতক "কারে" পড়িয়া মিথ্যা বলিতে বলিতে, মিথ্যা বলিবার পূর্ব্বে যে একটা সঙ্কোচ হয় তাহা, ঘুচিয়া যাইবে। তাহার অপেক্ষা কে করিয়াছে গোপনে সংবাদ লওয়া ভাল। যদি কখনও ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করা ভিন্ন অন্য উপায় না থাকে, তবে তাহাকে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অভয়দান করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। সত্য বলিলে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ দোষ ক্ষমা করা অতি উত্তম। কেহ আপত্তি করিতে পারেন, তবে ত ছেলের অসাবধানতার সংশোধন হয় না! আমরা বলি, মিথ্যা কথায় নিজের সন্তানের কোমল মুখ কলুষিত হওয়া অপেক্ষা ভঙ্গপ্রবণ দুই চারিটা জিনিষ প্রত্যহ নষ্ট হওয়া শতগুণে ভাল।

বালককে কখনও চট্ করিয়া মিথ্যাবাদী অপবাদ দিও না। কারণ, বালক যদি প্রকৃত সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে তাহার উৎসাহভঙ্গ হইবে। সে ভাবিবে, যদি সত্য বলিলেও সেই মিথ্যাবাদী বদ্‌নাম থাকিয়া যায়, তবে মিথ্যা বলার দরুণ সুবিধাটুকু হইতে বৃথা বঞ্চিত হই কেন? তাহা ছাড়া, বাল্যকালে, ছেলেদের যাহা সন্দেহ করা যায়, তাহাই হইবার দিকে তাহাদের কেমন একটা ঝোঁক হয়। সুতরাং বিশেষ অবগত না হইয়া ছেলেকে মিথ্যাবাদী বলিবে না।

মুখে মিথ্যা না বলিলেও কাজে মিথ্যা বলা যায়, সেটিও সমান দোষের। ছেলে একটু তেঁতুলের আচার খাইতে চায়। মা বলিলেন—"নাওগে হাঁড়ি থেকে, একটুখানি নিয়ো, বেশী খেলে অসুখ কর্‌বে।" ছেলে অনেকটা লইয়া, অধিকাংশ বামহস্তে লুকাইয়া রাখিল, সামান্য একটু খাইতে খাইতে মার সম্মুখ দিয়া বাহিরে গেল। ইহাও মিথ্যা কথা;—ইহা বলার সমান:—"বেশী নিইনি গো, একটুখানি নিয়েছি।" আর এক প্রকার মিথ্যা আছে, কথাটা আসলে সত্য কিন্তু অন্যলোকে তাহা হইতেই ভিন্ন প্রকার বুঝিয়া লয়। ছেলে পড়া বলিতে না পারায় স্কুলে অতিরিক্ত একঘণ্টা কয়েদ ছিল। বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে এত দেরী?" ছেলে বলিল—"দেখ মা, আমরা যখন খেলি, তখন আর কিছু মনে থাকে না।" একথাটা খুব সত্য বটে, কিন্তু মা বুঝিলেন, ছেলেরও তাই বুঝাইবার উদ্দেশ্য,—খেলিবার জন্যই আজ বিলম্ব হইয়াছে। এ সমস্ত ধরা পড়িলে, মিথ্যা কথার মতই তাহার প্রতীকার আবশ্যক। মিথ্যা শুধু মুখের কতকগুলা কথা নহে; যাহা যথার্থ নহে অপরকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা। চাটুবাদ একপ্রকার মিথ্যা—বাড়াইয়া বলাও তাহাই।

বালকবালিকার মনে খুব শৈশব হইতে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া উচিত যে মিথ্যা, চাতুরী, কপটতা—নীচতার একশেষ। তাহারা যেন জানিতে পায়, তাহাদের এরূপ আচরণে পিতামাতা একান্ত ব্যথিত হন। কখনও যেন ছেলেদের সম্মুখে কোনও মিথ্যাবাদীর বুদ্ধিকৌশল বা সাহসের প্রশংসা না করা হয়। এ প্রসঙ্গ যখনি উপস্থিত হইবে, তখনি যেন

এটা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয় যে ইহা নীচতার কাপুরুষতার চূড়ান্ত এবং যার পর নাই অভদ্রোচিত। কেহ কাহাকেও পরিহাস করিয়া মিথ্যাবাদী বলিলে সেটা বিশেষ অপমান স্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; কারণ শ্যালক-সম্বন্ধ স্থাপন করা অপেক্ষা, মিথ্যাবাদী বলা লক্ষগুণ বড় গালি।

(বারান্তরে সমাপ্য।)

কার্ত্তিকের লড়াই।

'কার্ত্তিকের লড়াই'—কথাটা শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, সুর-সেনাপতি ষড়াননের দিগ্বিজয়-কাহিনী নূতন করিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্ক সঞ্চারের অবসর অন্বেষণ করিতেছি। সেই দেবসেনাপতির আখ্যায়িকা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় হইলেও উক্ত দেবশ্রেষ্ঠের বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার পূজা লইয়া ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে যে উৎসব হয়, আমরা এখানে তাহারই অবতারণা করিব। কার্ত্তিক পূজার পরদিন গ্রামস্থ সমস্ত কার্ত্তিক একত্র করিয়া তাহার যে আড়ম্বর হয়, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তাহাই কার্ত্তিকের লড়াই বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিজ নিজ কার্ত্তিক লইয়া সাধারণের মধ্যে যে আন্দোলন, কোলাহল, নৃত্য, তাহাকে 'কার্ত্তিকের লড়াই' নামক উৎকট নামটিতে অভিহিত করা হইয়াছে কেন, এ পক্ষ তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম, কিন্তু উক্ত উৎসবের এই নামটাই পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে।

কার্ত্তিক পূজার পাঁচ সাত দিন আগে হইতে গোবিন্দপুরের মালীরা মাটীর কার্ত্তিক গড়াইতে আরম্ভ করে। গ্রামে সত্তর পঁচাত্তরখানি কার্ত্তিক পূজা হয়, ইহার অধিকাংশ ঠাকুরই মালীবাড়ীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক সময় মালীরা বায়না না পাইলেও কতকগুলি ঠাকুর গড়াইতে আরম্ভ করে, শেষে গৃহস্থদিগের নিকট হইতে বায়না পাইলে তাহাই তাহাদিগকে গড়াইয়া দেয়; সকল ঠাকুরই একসাধারণ ছাঁচে নির্ম্মিত; কেবল পরাণ চৌধুরী এবং পীতাম্বর হালদারের বাড়ীতে কিছু ভিন্ন ধরণে ঠাকুর নির্ম্মিত হয়, ইহাদের কার্ত্তিক সাধারণ কার্ত্তিক হইতে স্বতন্ত্র—মালীরা তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া এই ঠাকুর গড়াইয়া যায়।

কার্ত্তিকমাস চিরকালই ত্রিশদিনে শেষ হয়। সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীবাড়ী পূজার ঢাক বাজিয়া উঠে। মালীবাড়ী হইতে সকলের চণ্ডীমণ্ডপেই ঠাকুর আসিয়া পৌছিয়াছে; চণ্ডীমণ্ডপে বেদীর সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া, বেদীতে কতকগুলি ধান ছড়াইয়া তাহার উপর কার্ত্তিকের অধিষ্ঠানের স্থান হইয়াছে। কার্ত্তিক মহাশয় ময়ূরের উপর পরম গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল, কালি দিয়া পাট ছোপাইয়া এই চুল প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কার্ত্তিকের গোঁফ কালি দিয়া আঁকানো, আবার কোন কোন কার্ত্তিকের গোঁফের রেখামাত্র নাই, অত্যন্ত নব্য যুবক; একহাতে ধনুক, অন্য হস্তে তীর, কাহারো বাড়ী সরের তীরে পাখীর পালক আঁটা এবং ইস্পাতের ফলা লাগান, কেহ বা কঞ্চী দিয়া তীর ধনুক গড়াইয়া কার্ত্তিকের হস্তে দিয়াছে। পায়ে মাটীর নাগরা জুতা, কালো রঙের উপর ঘামতেল মাখানতে ঠিক বার্ণিশের মত চিক্‌চিক্ করিতেছে। কার্ত্তিকের

পরিধানে পট্টবস্ত্র, কেহ শান্তিপুরে লাল কল্কাপেড়ে ধুতি পরাইয়া দিয়াছে, কেহ বা নিতান্ত ছেলেমানুষটি মনে করিয়া ঢাকাই বা নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। করতল হিঙ্গুলে লাল, ঘন হরিতালে সর্ব্বশরীর পীত, শরীরের পীত আভা পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে, কাহারো কোঁচা সম্মুখভাগে গোঁজা, কোন কার্ত্তিকের কোঁচা ময়ূরের পিঠের উপর দিয়া পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোঁচান চাদর কাঁধের উপর ঝুলিতেছে। ময়ূর ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দীর্ঘ ঠোঁটে একটা সাপের গলদেশ এবং দক্ষিণ পদে তাহার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে, সর্পের আহত মুখ হইতে ধারাল দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ময়ূরের লেজ প্রসারিত, বহুযত্নে মালীরা তাহার উপর নানারকম রঙ্গ ফলাইয়া কৃত্রিম চাঁদ আঁকাইয়া দিয়াছে, কেহ কেহ বা ময়ূরের পশ্চাভাগে গোটাকত সত্যকার ময়ূরপুচ্ছ আঁটিয়াছে। যেমন দেবতা, বাহনও তাঁহার উপযুক্ত বটে কিন্তু কলিকালে কার্ত্তিকের এই অভিনব সংস্করণে তাঁহার হাতে তীরধনু না দিয়া দুই একটা গোলাপফুল দিলেই ভাল দেখাইত, কারণ রণদেবতার পূজা করা বাঙ্গালীর পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, তবে একটা সান্ত্বনার কারণ আছে—কার্ত্তিক বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দেবসেনাপতিরূপে পূজিত হন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া পুত্রবর দান করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই অনেকে তাঁহার পূজা করে। যে জাতি পৃথিবীতে বংশরক্ষার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাকুল—তাহাদের মধ্যে হইতে বীরত্বের সম্মান সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইলেও তাহারা কায়মনোবাক্যে কার্ত্তিকের পূজা করিবে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা ছোট সামিয়ানা টাঙ্গান, ভাল করিয়া টান না হওয়াতে মধ্যভাগটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং একটা বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে উচু করিয়া তোলা হইয়াছে। গোটাদুই তিন লণ্ঠন দড়ী দিয়া ঝুলান রহিয়াছে, ভিতরে এক পয়সা দামের ছোট ছোট কেরোসিনের টিমি, ধূমে লণ্ঠনের ভিতর কালো হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকের সম্মুখে লম্বা লম্বা দুটি কাঠের দীপগাছায় মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে পূজার উপকরণ সজ্জিত, পাশে গোটাকত হাঁড়ি, তাহার মধ্যে আতপচাউল, বারকসে ডাল, কাঁচকলা, আলু, লবণ ইত্যাদি সামগ্রীপূর্ণ সিধা। পল্লীরমণীগণ আজ কার্ত্তিকের ব্রত পালনের জন্য উপবাস করিয়া আছে, অপরাহ্নকালে পুরোহিত আসিয়া তাঁহার বহুপুরাতন, তালপত্র-নির্ম্মিত, লম্বা, পৈত্রিক পুঁথিখানি খুলিয়া প্রত্যেক যজমানবাড়ীতে উপবাসনিরতা, সংযতহৃদয়া রমণীগণকে কার্ত্তিকের জন্মকথা শুনাইয়া বেড়াইতেছেন; দক্ষিণা অতি সামান্য, একটি পয়সা, বা দুই একটি সুপারী, কিন্তু তাহাতেই নির্লোভী পল্লীপুরোহিত সন্তুষ্ট, কারণ এই ব্রতকথা শুনান তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে। এই সকল গ্রাম্যপুরোহিতের ইচ্ছা যজমানের খুব উন্নতি হউক—তাহাদের মধ্যে সমারোহপূর্ব্বক ক্রিয়াকর্ম্ম চলুক; যজমানের সুখ ও ঐশ্বর্য্যকালে ইহারা নিজের প্রাপ্য যজমানের কাছে হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লন, কিন্তু যজমানের দুর্দ্দিনে ইহারা পারিশ্রমিকের কোন আশা না রাখিয়া নিরাপত্তিতে এবং পরম সহিষ্ণুভাবে যজমানের ক্রিয়াকর্ম্ম

নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, বরং আবশ্যক হইলে পূজার দুই একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া সাহায্য করেন, এই জন্যই পল্লীঅঞ্চলে একটা কথা চলিত আছে যে :—

"দেয় থোয় করে হিত
তারে বলি পুরোহিত।"

পরিবার বৃহৎ এবং সংসার অসচ্ছল বলিয়া দেওয়া থোয়ার ক্ষমতা না থাকিলেও পুরোহিত প্রমথ শিরোমণি যজমানমণ্ডলীর অত্যন্ত হিতৈষী। লোকটি অনতিদীর্ঘ, মাথায় খাট চুলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র টিকি, অধিকাংশ সময়ই সেখানে একটি ফুল গোঁজা দেখিতে পাওয়া যায়; দাড়ি গোঁফ কামান, ললাটে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা, গ্রীষ্মকালে তিনি 'রাধাকৃষ্ণ' নামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে দিয়াই সময় কাটান, কিন্তু একটু শীত পড়িবামাত্র তিনি তাঁহার পৈতৃক লাল বনাতখানি বাহির করেন, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহার করাতে পাছে তেল কি ময়লা লাগিয়া সেখানি বিবর্ণ হইয়া যায়, এই জন্য শিরোমণি মহাশয় তাঁহার মস্তক এবং সর্ব্বশরীর একখানি শাদা উড়ানিতে ঢাকিয়া তাহার উপর এই বনাত গায়ে দেন। তাঁহার বামহস্তে সর্ব্বদাই একটা সামুক দেখা যায়, সেই সামুকের মধ্যে তাঁহার স্বরচিত 'নস্য' বোঝাই করা থাকে। ছেলেরা 'হাডুডুডু' কি 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতে খেলিতে যেমন দেখিতে পায় পুরোহিত মহাশয় কোথাও যাইতেছেন, অমনি তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় এবং সকলেই একবাক্যে বলে "দাদাঠাকুর আমাকে একটু নস্যি।"—দাদাঠাকুর সামুকটি বাহির করিয়া প্রশান্তহাস্যে সকলের হস্তে একটু একটু 'নস্য' ঢালিয়া দেন, তাহারা মহাকলরবে তাহা টানিতে থাকে—এবং হাঁচিয়া কাশিয়া চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তুলে।

আজ ব্রতকথা শুনাইতে হইবে বলিয়া পুরোহিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যজমানবাড়ী চলিয়াছেন, পায়ে একজোড়া ঠনঠনের চটি, তাহার সর্ব্বত্র দুই তিন পুরু তালি দেওয়া; আজ তিন বৎসর হইল শিরোমণি ঠাকুরের এক যজমান কলিকাতা হইতে এই চটি আনাইয়া দিয়াছিলেন। পথের ধূলা সেই চটিজুতার আপাদ মস্তক এবং পুরোহিত ঠাকুরের জানু পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যজমান বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া একঘটি জলে পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক একখানি কুশাসনের উপর বসিয়া ঠাকুরমহাশয় তাঁহার পুঁথি খুলিয়া সুর করিয়া ব্রতকথা শুনাইতে লাগিলেন, রমণীগণ সর্ব্বশরীর গাত্রবস্ত্রে ঢাকিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন, সকলেই নিশ্চলভাবে বসিয়া কথা শুনিতেছেন, কেবল দুই এক জন বর্ষীয়সী রমণী হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া মোটা মালাগাছটি লইয়া ঘুরাইতেছেন, এবং একবার ঘুরান শেষ হইলে ঝোলাটি ধীরে ধীরে, ললাটস্পর্শ করিয়া আবার নূতন করিয়া জপ আরম্ভ করিতেছেন, পুরোহিত অনর্গল পুঁথি পড়িয়া যাইতেছেন।

যজমান বাড়ীতে ব্রতকথা শুনাইতে শুনাইতে রাত্রি হইয়া পড়িল। তখন তিনি পূজা করিবার জন্য ভিন্ন বাড়ীতে চলিলেন। পূজাবাড়ীর এবং প্রতিবাসী গৃহস্থদিগের অনেক বিধবা নূতন হাঁড়ি ও লিপ আনিয়া পূজার কাছে রাখিয়া দিয়াছে, ইহাই 'ব্রতের হাঁড়ি'।

পূজার দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া পরদিন তাঁহাদিগের এই হাঁড়িতে পাক করিয়া থাওয়ার নিয়ম। কার্ত্তিক পূজা করিতে অধিক সময় লাগে না, পুরোহিত তাড়াতাড়ি পূজাশেষ করিয়া মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই সকল যজমানের মনরক্ষা করিলেন।

পরাণ চৌধুরীর বাড়ীতে আজ ধূমধাম কিছু অতিরিক্ত। পরাণ চৌধুরী নিজে জমীদার, বৃদ্ধ হইয়াছেন, গৃহে একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান। কন্যার পুত্রাদি না হওয়াতে কয়েকবৎসর হইতে তিনি বিশেষ সমারোহের সহিত কার্ত্তিকপূজা করিয়া আসিতেছেন। যদিও এ পর্য্যন্ত ইহাতে কোন ফললাভ হয় নাই কিন্তু সেজন্য উক্ত দেবতার উপাসনাকার্য্যে কোন বৎসরই কিছু ত্রুটি দেখা যায় না, কারণ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বাস দেবতার অমোঘ বর কখন কিরূপে সংসারের মধ্যে সাফল্য এবং প্রসন্নতা বর্ষণ করিয়া যায়, তাহা নিরূপণ করা ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্য নহে; সুতরাং নিরাপত্তিতে ষড়ানন পূজা পান, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোক, ইস্কুলের মাষ্টার, ডাকঘরের বৃদ্ধ ডাকমুন্সী এবং তাঁহার কেরাণী, মুন্সেফী ও ফৌজদারী আদালতের হেড্ ক্লার্ক সেরেস্তাদার হইতে মুহুরী, এমন কি পেয়াদাগুলা পর্য্যন্ত কার্ত্তিক পূজায় তাঁহার বাড়ীতে পরিপূর্ণ মাত্রায় লুচি চিনি এবং ক্ষীর সন্দেশের সদ্ব্যবহার করে, কেবল থানার দারোগা গমেজউদ্দীন মিঞা মুসলমান বলিয়া নিমন্ত্রিত হন না, কিন্তু তাঁহার বাসায় প্রতিবৎসর কার্ত্তিক পূজার পরদিন একটা খাসি, পাঁচসের ময়দা, তিন সের ঘৃত এবং আরো বহুতর জিনিষের প্রকাণ্ড সিধা যায়। কোম্পানী বাহাদুরের চাকর হইলেও গমেজউদ্দীন মিঞা 'নিমকহারাম' নহেন, অপরাহ্ণে প্রতিমা বাহির হইলে তিনি সদলবলে সজ্জিত হইয়া চৌধুরীবাবুদের কার্ত্তিকের আগে আগে চলিয়া থাকেন, এবং কার্ত্তিকের আড়ং কোন সরু রাস্তায় আসিয়া বিভিন্ন পাড়ার কোন দলের সম্মুখে পড়িলে মহাগর্জ্জনপূর্ব্বক তিনি সেই দলকে তফাৎ করিয়া চৌধুরীদের কার্ত্তিকের জন্য পথ পরিস্কার করেন।

রাত্রি নয় দশটার সময় আমলা বাবুরা এবং গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা চৌধুরী মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতে উপস্থিত হইলেন; প্রায় সকলের মাথাতেই কম্ফর্টার জড়ান, গায়ে কালো সার্জ্জের চাদর, পায়ে ষ্টকিং, হাতে ছড়ি; কিন্তু এক টাকার নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া যে তিনটাকা সাড়েতিন টাকা দামের জুতাজোড়াটী খোয়াইয়া যাইবেন এমন ইচ্ছা কাহারো নহে, সুতরাং অনেকেই শত তালিবিশিষ্ট ছিন্ন পাদুকা বা চটি পরিয়া আসিয়াছেন, 'গোড়ালি' একেবারে ক্ষয় হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সম্মুখভাগটা বঙ্কিম আকার ধারণপূর্ব্বক মাথা উচু করিয়া রহিয়াছে।

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একটা সামিয়ানার নীচে গোটাকত ঝাড় ও লণ্ঠন ঝুলিতেছে, মাটিতে একটা বড় সতরঞ্চী পাতা, চারিপাশে আরো কয়েকখানা মাদুর বিছানো। আজ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে চপ হইবে; একটী বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোরী বালিকা চপ গাহিবে; আহারাদি শেষ হইলে গান আরম্ভ হইবার কথা আছে।

কিন্তু আহারাদির কিছু বিলম্ব আছে, তাই নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বাহিরের আটচালায় বসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলেন। দেওয়ালে কতকগুলি দেওয়ালগিরিতে বাতি জ্বলিতেছে, উপরে চাঁদোয়া ভেদ করিয়া তিনগাছি দড়িতে তিনটি বেল টাঙ্গান, দুইদিকের দুটি সবুজ, মধ্যেরটি লাল, নীচে সতরঞ্চীর উপর ফরাস করা, ফরাসের উপর বৈঠকে দুই তিনটি বাঁধা হুকা, চারিধারে অনেকগুলি তাকিয়া বালিশ। চৌধুরী মহাশয়, তাকিয়ায় হেলান দিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ফরসীর এক দীর্ঘ নল মুখে লাগাইয়া তামাক টানিতেছেন, কুণ্ডলীকৃত ধূম ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে। কাছে একটি রেকাবীতে এক রেকাবী পান, এক পাশে একটা পানের উপর খানিক চুণ; চৌধুরী মহাশয়কে ঘিরিয়া অনেকে বসিয়া আছে, কেহ পান চিবাইতেছে, কেহ বাঁধা হুকায় তামাক টানিতে টানিতে চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদার চাটুয্যেদের একটা ফৌজদারী মকদ্দমায় জব্দ হইবার গল্প বলিতেছে এবং তাহা চৌধুরী মহাশয়ের কর্ণে সুধা সিঞ্চন করিতেছে। গল্প করিতে করিতে তাম্রকূটপরায়ণ ভদ্রলোকটি বলিল "কল্‌কেটাতে কিছু নেই বোধহচ্ছে"—অমনি চৌধুরীবাবু তাকিয়া হইতে মাথা তুলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন "নীলু, তামাক দিয়ে যা, পাজি বেটারা সব থাকিস কোথা?"

নীলু ওরফে নীলমণি খানসামা তখন প্রাঙ্গণের পাশে যে জায়গায় একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছিল, সেখানে চৌধুরীবাড়ীর এবং অন্যান্য বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে বসিয়া হাস্যামোদে সময় কাটাইতেছিল। আগামী কল্য কে কিরূপ বাহার করিয়া কার্ত্তিকের লড়াই দেখিতে যাইবে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সেই বিষয়েই প্রসঙ্গ চলিতেছিল, এমন সময় কর্ত্তা মহাশয়ের হুঙ্কার নীলুর কর্ণে প্রবেশ করিল, তাড়াতাড়ী উঠিয়া তামাক সাজিয়া কলিকা ভরিয়া আগুন লইয়া গেল, এবং থামের আড়াল হইতে কলিকাতে দুই একটা টান দিয়া হুকার উপর তাহা বসাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে চণ্ডীমণ্ডপে আহারের স্থান হইল, সারি সারি কুশাসন ও মাটির গেলাশ এবং কলাপাতা পড়িয়া গেল। আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে সকলে একবার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক দেখিয়া লইলেন। চৌধুরীবাবুদের বাড়ীতে কার্ত্তিক বরাবর রাজবেশে দেখা দেন, গোবিন্দপুরের আর কোন বাড়ীতে রাজ-কার্ত্তিকের পূজা হয় না। রাজ-কার্ত্তিকের মস্তকে সুবর্ণপ্রভ কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, এক হস্তে শরাসন অন্য হস্তে তীর, পরিধানে সাটীনের ইজার চাপকান, তাহার উপর চুমকীবসান, পায়ে জরীর জুতা, একটি সুচিত্রিত সিংহাসনের উপর কার্ত্তিক উপবিষ্ট। ময়ূরযুগলের পৃষ্ঠদেশে এই সিংহাসন সংস্থাপিত, ময়ূরদুটি মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলেও তাহার সর্ব্বশরীর ময়ূর-পক্ষদ্বারা সুকৌশলে সমাচ্ছন্ন, গলদেশে জীবিত ময়ূরের ন্যায় ময়ূরকণ্ঠিপালক—পশ্চাতে দীর্ঘপুচ্ছ, কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ তার দিয়া একত্র করিয়া বাঁধা, ময়ূরযুগলের পশ্চাদ্ভাগে তাহা কৌশল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শতচন্দ্র সমন্বিত, পরম শোভাময়, সেই বিস্তারিত পুচ্ছ কার্ত্তিকের পৃষ্ঠদেশে সুন্দর চালির মত শোভা পাইতেছে; যেন ময়ূর দুটি আনন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পেখম ধরিয়াছে। কার্ত্তিকের ময়ূরা-

সন হইতে চারিটি ধাপ নামিয়া গিয়াছে ; এই সোপানশ্রেণীর প্রথমটির উভয়প্রান্তে দুইজন মৃণ্ময়-বরকন্দাজ—স্কন্ধে সঙ্গীনশোভিত বন্দুক, বামকোষে তরবারী, মস্তকে পাখীর পালক-খচিত জরীরটুপী, গালপাট্টা, ললাটে লোহিত ত্রিবলী-রেখা, অধর দংশনপূর্ব্বক কোন অনির্দ্দিষ্ট অনধিকার-প্রবেশাকাঙ্ক্ষীর দিকে ভ্রূকুটিকুটিল তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার উপরের সোপানের দুইদিকে দুইটি অশ্বারোহী সৈনিক, নীল অশ্বে আরূঢ়, অশ্বদ্বয় ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখস্থ পদদ্বয় শূন্যে তুলিয়া বীরগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। সৈনিকদ্বয়ের পরিচ্ছদ ঘোর লোহিতবর্ণ, কটিতলে কোমরবন্ধ ; রেকাবদলে ভর দিয়া বীরদ্বয় জীনের উপর বসিয়া আছে, বামহস্তে ধনুক, তাহার আকর্ণ বিস্তৃত জ্যার মধ্যে তীর সংলগ্ন, যেন প্রভুর ইঙ্গিতমাত্র সেই তীক্ষ্ণশর শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহার উপরের থাকে উভয় পার্শ্বে দুইটি রমণী-মূর্ত্তি—পরিধানে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে কালো চুড়ি, টানাটানা ভ্রূ—ভ্রূযুগলের মধ্যে ক্ষুদ্র কালো ফোঁটা, বর্ণ হরিতাভ, কেবল করতল ও ওষ্ঠ হিঙ্গুলের রঙ্গে ডগ্‌ডগ্ করিতেছে, উভয়ের হস্তে দুই গাছি ফুলের মালা, যেন তাহারা তাহাদের রমণীহৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ এবং যত্ন একত্র করিয়া এই মালা দুই গাছি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং দেব-সেনাপতির দিব্য চরণমূলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্যই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত তাহারা দুই সখীতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে, তাই তাহাদের লজ্জানম্র চক্ষুদুটি নাসাবিলম্বিত উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নলকের উপর বদ্ধদৃষ্টিতে অবনত হইয়া আছে। সর্ব্বোচ্চ সোপানে দুইটি ক্ষুদ্রকায়া অপ্সরী, দেবশিশুর মত সুন্দর দুইখানি প্রস্ফুটিত ওষ্ঠ, অতি মৃদু-স্পর্শে যেমন বীণার তার কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তেমনি বোধহয় ভাবের সামান্য স্পর্শমাত্র এই দিব্যলোক-বাসিনী রমণীদ্বয়ের ওষ্ঠে কোমল হাস্য ফুটিয়া উঠিবে ; সুগোল এবং পরিপূর্ণ গোলাপী গণ্ডস্থল এমন সুন্দর যে, কৃষ্ণনগরের এই পুতুলনির্ম্মাতাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বেগুনী রঙ্গের বস্ত্রের ভিতর দিয়া অঙ্গের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মস্তকে কৃত্রিম পুষ্পলতা-নির্ম্মিত সুদৃশ্য মুকুট, দক্ষিণ হস্তে বেণু এবং বামহস্তে লোহিত পতাকা ; যেন এই বেণুরবে তাহারা দেব-সেনাপতির গুণগ্রাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রবণ-বিবর পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এবং জয়পতাকা উড়াইয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এরূপভাবে এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকলের আহার শেষ হইলে প্রাঙ্গণতলে ঢপ আরম্ভ হইল। বৃদ্ধেরা মস্তকে চাদর জড়াইয়া আসরের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, যুবকেরা একটু দূরে বসিয়া সেকাল ও একালের ঢপের সমালোচনা আরম্ভ করিল ; ঢপ, কবি, কীর্ত্তন এবং পাঁচালী এগুলির মধ্যে কোন্ রকমের গান শ্রেষ্ঠ তাহাই তাহাদের আলোচনার বিষয়। কণ্ঠস্বর ক্রমে পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল, সকলেই আপন আপন মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল। মেয়েরা চিকের আড়ালে বসিয়া কেহ ঢুলিতেছে, কেহ গান আরম্ভ হইতে বিলম্ব দেখিয়া ঢপওয়ালীর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা সতরঞ্চীর শেষপ্রান্তে

বসিয়া বিষম জটলা বাধাইয়া দিয়াছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, কেহ কাহাকেও কিল মারিতেছে এবং কিলপ্রাপ্ত বালক প্রতিশোধস্বরূপ চিম্‌টি কাটিয়া সরিয়া বসিতেছে।

এমন সময় গান আরম্ভসূচক খোলে দুই একটি মৃদু আঘাত পড়িল, অমনি চারিদিকের গণ্ডগোল একটু মন্দীভূত হইল। যাহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহারা হাঁই তুলিয়া আলস্য ছাড়িয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ গৌর-চন্দ্রিকার পর বৃদ্ধা উঠিয়া গান আরম্ভ করিল, ফরমাইস হইল আজ কার্ত্তিকের জন্মকাহিনী গাহিতে হইবে।

বৃদ্ধেরা তামাক টানিতে টানিতে ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিল, যুবকগণের তর্কস্রোতে বাধা পড়িল, বালকগণের কিলোকিলি থামিয়া গেল। বৃদ্ধা কখন কথায়, কখন দ্রুত ছড়ায়, কখন তাললয়বদ্ধ অনুপ্রাস-ঝঙ্কারিত দীর্ঘ সুরে সেই দেবগাথা গাহিতে লাগিল; বলদর্পিত, দুরন্ত অসুরগণের অত্যাচারে ত্রিদিব অন্ধকারময়, আনন্দোদ্ভাসিত নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, দেবগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ, অপমানে নতশির; ইন্দ্রের শচী, কন্দর্পের রতি—সকলেই দানবহস্তে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। রোষে, ক্ষোভে দেবরাজের সহস্র নয়ন হইতে সহস্র ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে; বৃদ্ধার করুণকণ্ঠ হইতে দেবগণের দুঃখদৈন্যপ্লাবিত কোমল সঙ্গীতধারা নির্গত হইয়া শ্রোতাদিগের কর্ণপথে হৃদয়ের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। সকলে স্থানকাল ভুলিয়া বহুপ্রাচীন যুগের একটি পৌরাণিক দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িল, শুধু সকলের নয়ন সমক্ষে উন্নত, শুভ্র তুষারমণ্ডিত কৈলাসের পাদপ্রবাহিতা সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনীর উন্মত্ত প্রবাহ, বিজন শরবন, বিশ্ব-বিমোহিনী পার্ব্বতীর মাতৃরূপ এবং তুষারশুভ্র দেবাদিদেব মহাদেবের সমুন্নত দেহ মায়াচিত্রের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল, এবং অবশেষে সকল চিত্র মিলিয়া একটি অনিন্দ্যসুন্দর, পঙ্কজলোচন, গৌর-কান্তি শিশু দেবতার মূর্ত্তি সৃজন করিয়া তুলিল। তখনো সেজের উজ্জ্বল আলো চণ্ডীমণ্ডপবর্ত্তী ময়ূরাসনস্থিত কার্ত্তিকের সুন্দর মুখের উপর পড়িতেছিল, সকলে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে একবার সেই দেবমূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া চাহিল; বৃদ্ধগণ গায়িকাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল, ভক্তগণের বিষাদাশ্রু আনন্দাশ্রুতে ধৌত হইয়া গেল।

চপ হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল যে হালদারবাড়ীতে ছায়াবাজী পুতুলনাচ হইতেছে। খবর শুনিয়াই ছেলেরা উর্দ্ধশ্বাসে হালদারবাড়ীর দিকে ছুটিল, অনেক বুড়াও ছায়াবাজীর প্রলোভন ছাড়াইতে পারিল না।

বনের মধ্যে দিয়া হালদারবাড়ী যাইবার রাস্তা; পথের দুই ধারে আস্যাওড়া এবং কালকাসিন্দের গাছ, লাল ভেরান্দার জঙ্গল, চিতে এবং জামাল কোটার বেড়া দেওয়া গৃহস্থদের বাগান। কোথাও একপাশে একটা বাঁশঝাড়—আর একদিকে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। বাঁশ ও তেঁতুলের ঘনপাতার মধ্যে স্তূপীকৃত অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে; লতায়, পাতায় জোনাকি পোকা মিটমিট করিতেছে, দূর মাঠে শিয়াল ডাকিতেছে, গৃহস্থদের গৃহপ্রান্ত হইতে গ্রাম্যকুকুরগুলা তাহাদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিতেছে। ছেলেরা ত্রস্তপদে গ্রাম্য-

পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল, বটতলা দিয়া যাইতে যাইতে বাতাসে একবার গাছের পাতাগুলি নড়িয়া উঠিল, একটি শুষ্ক বটপত্র শাখাচ্যুত হইয়া একজনের গায়ে উড়িয়া পড়িল—আর ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হালদার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল পূজার দালানের সম্মুখে একটা জায়গা চাটাই দিয়া ঘিরিয়া সেখানে পুতুলনাচ আরম্ভ হইয়াছে, অনেক লোক চারিদিকে কাতার দিয়া বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া আছে।

হালদারবাড়ীতে কার্ত্তিকপূজার প্রকরণ কিছু স্বতন্ত্র; এক কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষে এক চালিতে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমা গড়াইয়া তাঁহাদের সকলেরই পূজা হয়। পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে—আহারাদির বিশেষ কোন আয়োজন নাই; ঠাকুরঘরে আলোর কোন রকম আড়ম্বর নাই, একটা উচু দীপগাছার উপর একটা মাটির ডেল্‌কো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, কয়েকথান নৈবেদ্য রেকাব দিয়া ঢাকা রহিয়াছে, ঘরের মধ্যে একটিও লোক নাই, শুধু একটা ক্ষুধার্ত্ত কালো বিড়াল সেখানে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সমস্ত লোক ছায়াবাজীর পুতুলনাচ দেখিতেই ব্যস্ত।

বাজনা বাজিতেছে, ছায়াবাজীর পুতুলেরা অদৃশ্যহস্ত-চালিত হইয়া নাচিতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াবাজীর দলের লোক তালে তালে পা ফেলিয়া নূপুর বাজাইতেছে, লোকে ভাবিতেছে বুঝি পুতুলের পায়ের নূপুরের শব্দ! কিন্তু পুতুলের বক্তৃতা স্বরূপ পটান্তরালবর্ত্তী লোকগুলো চাপা গলায় অনুনাসিক স্বরে যে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছে, সেগুলি শুনিতে কিছুমাত্র মনোরম নহে, এবং সেগুলি পুতুলের কণ্ঠস্বর বলিয়া নিতান্ত শিশুরও ভ্রম জন্মে না।

নানারকম দৃশ্য। একটা জেলে সমুদ্রের ধারে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছে, দৈবক্রমে একটা কুমীর আসিয়া বরসী গিলিল,—প্রকাণ্ড মাছ পড়িয়াছে আশা করিয়া জেলে ছিপ টানিতে টানিতে জলে গিয়া পড়িল, জলে পদস্পর্শ হইবামাত্র কুমীর আসিয়া জেলের পা চাপিয়া ধরিল, জেলের পো ছিপখানি ছাড়িয়া দিয়া হতভম্বভাবে দুই হাতে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, কুমীর তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া গেল। হঠাৎ সমুদ্রমধ্যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা আসিয়া লাগিল, গণেশকে কোলে লইয়া কমলেকামিনী কমলবনে বসিয়া গণেশের মুখচুম্বন করিতেছেন, রমণী হস্তী গিলিতেছে ভাবিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিতে দেখিতে পঞ্চবটী বনে জটাবাকলধারী রামলক্ষ্মণের আবির্ভাব হইল, সূর্পনখা আসিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল, লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ কাটিয়া দিলেন। সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে দশমুণ্ড রাবণের কাছে উপস্থিত হইয়া নাকিস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দাঁদাঁ গোঁ দাঁদাঁ, নর্খাঁ বেঁটা আমার নাক কাঁন কেঁটে নিয়েছেঁ"—দশানন দশটা মাথা নাড়িয়া রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। রামরাবণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল—ঘোরতর যুদ্ধ, হনুমান লাফাইয়া রাবণের মাথায়

উঠিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া পলাইতেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-শেষে ভীমের সহিত রাজগণের যুদ্ধ হইতেছে, ভীম এক এক জন রাজাকে জাপটাইয়া ধরিয়া অন্য একজনের গায়ে ছুড়িয়া মারিতেছে, আর তাহারা গড়াগড়ি যাইতেছে। অর্জ্জুন বাণে বাণে সম্মুখীন রাজাদের অস্থির করিয়া দিতেছেন, দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ভীমার্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাত মুখ নাড়িয়া এবং প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিয়া নানারকম ইঙ্গিত করিতেছে, দেখিয়া দর্শকগণ হাসিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে।

এইরূপে নানারকম দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় পুতুলনাচ বন্ধ হইয়া গেল, সকলে গোলমাল করিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল—উৎসবভবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল এবং দুই একবার ঢাক বাজাইয়া ঢাকিরা মাথার কাছে ঢাক রাখিয়া কাঁথায় সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া চাটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িল। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, কেবল দূরবর্ত্তী পাড়ায় চৌকীদারেরা এক একবার "এ-এ, গেরস্ত, জাগ হো" বলিয়া চীৎকার করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ও পল্লীবাসীগণের নিদ্রিত চেতনাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রির উৎসবকাহিনী নূতন করিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পূজাবাড়ীতে ঢাক বাজিয়া উঠিল। অপরাহ্নে তিনটার পূর্ব্বে বরণ হইয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ীতেই ঠাকুর বাহির করিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল; বাগচীবাড়ীতে তক্তারামা সাজান হইল, কার্ত্তিক তক্তারামার ভিতর প্রবেশ করিলেন। লাল কাপড়ে মোড়া তক্তারামার প্রত্যেক ফোকরে দড়ি দিয়া কাচের হাঁড়ি এবং বেল টাঙ্গান, হাঁড়িগুলির মধ্যে ছোট ছোট বাতি। কার্ত্তিকের সম্মুখে দুইদিকে দুই পরীর ছবি, হাতে বাতি ধরিবার এক একটা দণ্ড, তাহাতে বাতি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁশের আড় বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিককে চড়াইয়া বাহির করা হইল; কেহ কেহ জোড়া কার্ত্তিক পূজা করিয়াছে, দুই কার্ত্তিককে বাঁশের মাচার উপর মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া বাজারের দিকে লইয়া চলিল।

দুই প্রহরের পর হইতেই বাজার লোকে লোকারণ্য। আজ দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। পথের ধারে কেবল দুইখানা পানের দোকান বসিয়াছে, জলচৌকীর উপর ছোট ছোট বাটীতে নানারকম পানের মশলা, পাশে ছোট ঝোড়াতে পানের বিড়ে। মেছোবাজারে দুই এক ঝুড়ি মাছও বিক্রয় হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা আজ দর্শকের সংখ্যাই অধিক—তথাপি মেছোবাজারে লোকের ভিড় অসম্ভব বেশী। অনেক খদ্দের দেখিয়া মেছুনীরা অল্পসংখ্যক মাছ ডালার উপর তুলিয়া অনেক দাম হাঁকিতেছে, কিন্তু ক্রেতারাও অসম্ভব কম দাম বলিতেছে এবং সেটা পরিহাস মনে করিয়া মেছুনীরা যে দুই একটা নীচ রসিকতা করিতেছে তাহা তাহারা পরম স্মিতমুখে পরিপাক করিতেছে। আজ সকলের মুখেই কার্ত্তিকের লড়াইয়ের কথা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হইতে বৃদ্ধবৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ভাল

কাপড় পরিয়া রাস্তায়, বাজারের মধ্যে, ইঁদারার পাশে এবং বটগাছের নীচে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিকের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেলা চারিটার পর ঢাক বাজাইতে বাজাইতে গ্রামবাসীগণ একে একে নিজ নিজ কার্ত্তিক লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল। আট দশখানা বাঁশ আড়াআড়ি করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর কার্ত্তিকের পাট বসান হইয়াছে, পাট বাঁশের সঙ্গে এমন শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে যে কার্ত্তিকের নড়িবার সামর্থ্য নাই, কার্ত্তিকের আড় ঘাড়ে লইয়া আট দশজন লোক চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নাচনের বাজনা বাজিতেছে আর লোকগুলি তালে তালে পা ফেলিয়া কার্ত্তিককে নাচাইতেছে। ক্রমে এক দুই করিয়া অনেকগুলি কার্ত্তিক বাহকস্কন্ধে নাচিতে নাচিতে বাজারে প্রবেশ করিল। তাহার পর দত্তপাড়ার কার্ত্তিক, বক্সিপাড়ার কার্ত্তিক, কাঁশারীপাড়া, তাঁতিপাড়া, আচার্য্যপাড়া—সমস্ত পাড়ার কার্ত্তিক ভিন্ন ভিন্ন দলে বাদ্যভাণ্ড সঙ্গে লইয়া মহাধূমধামে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জোরে জোরে বাজনা বাজিতেছে আর বাহকেরা কার্ত্তিক ঘাড়ে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাজারের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ধূলা উড়িতেছে, ঢাক বাজিতেছে, মধ্যে মধ্যে চারিদিক হইতে হরিধ্বনি উঠিতেছে, হর্ষ কলরবের অন্ত নাই।

বেলা শেষ হইয়া আসিলে চৌধুরীবাবুদের রাজকার্ত্তিক সদলবলে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন বাহকে বাঁশ বাঁধিয়া তাঁহার সিংহাসন ঘাড়ে করিয়া লইয়া চলিয়াছে—একজন লোক কার্ত্তিকের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া দড়ী ধরিয়া ময়ূরপুচ্ছ টানিতেছে এবং ঢিল দিতেছে আর পুচ্ছগুলি একবার সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে আবার প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে; সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক আস, নিশান, ছাতি, আড়ানি লইয়া চলিয়াছে, অনেকের হাতে মশাল, রঙ্গমশাল এবং মহাতাপ। বড় লোকের চাকরেরা তাহাদের মনিবের ছোট ছোট ছেলেদের লাল সবুজ পোষাকে সাজাইয়া, টুপী এবং জুতা পরাইয়া কার্ত্তিকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া ফিরিতেছে। চৌধুরীবাড়ীর কার্ত্তিকের পর বাগচীবাড়ীর তক্তারামা—বাগচীদের মেজ বাবু টেরি কাটিয়া, ফ্লানেলের সার্টের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া, একহাতে কোঁচার অগ্রভাগ এবং অন্যহস্তে একখান সরু ছড়ি লইয়া তাঁহাদের কার্ত্তিকের আগে আগে চলিয়াছেন। মুখে বড় ব্যস্ত ভাব; চলিতে চলিতে এক একবার হটিয়া আসিয়া ঢুলিদিগকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সমানতালে বাজাইবার হুকুম দিতেছেন, কাহারো বা পিঠে ছড়ির দুই একটা গুঁতা মারিয়া সোজা করিয়া দিতেছেন, যেন এরূপ না করিলে তাঁহাদের কার্ত্তিক লড়াইয়ে হটিয়া যাইবে। এক এক পাড়ার ঠাকুর তাহাদের সমবেত বাদ্যভাণ্ড অগ্রবর্ত্তী করিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া চলিতে লাগিল, সকলের পশ্চাতে দর্শকবৃন্দ—পথের ধূলায় সকলের হাঁটু পর্য্যন্ত শাদা হইয়া গিয়াছে, ধূলা উড়িয়া নাকে মুখে প্রবেশ করিতেছে তথাপি সকলে পরম পুলকিত চিত্তে ভিড় ঠেলিয়া কার্ত্তিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলেই তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে

সঙ্গে করিয়া লইতেছে। কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীর কাছে আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে বেহারা এবং বাজন্দারগণ একমিনিট কাল পথের উপর দাঁড়াইয়া বাতায়ন অন্তরালবর্ত্তিনী অন্তঃপুরিকাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কার্ত্তিকের মুখখানি সেইদিকে ঘুরাইয়া ধরিতেছে এবং আপনাদিগের বাদ্যকুশলতা দেখাইবার জন্য ঢাকিরা মাথা নাড়িয়া ঘাড় ঘুরাইয়া লম্ফ ঝম্ফ সহকারে বিকট ঢক্কাধ্বনিতে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।

সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কার্ত্তিকের আড়ং বিশ্বেশ্বরী মন্দিরদ্বারে সমাগত হইল। তখন ঢং ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা বাজিতেছিল এবং পুরোহিত ঠাকুর ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ নাড়িয়া দেবীর আরতি করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরী-মন্দিরের নিকটে রাস্তার দুইধারে সমস্ত কার্ত্তিককে সারি সারি নামাইয়া বাহকেরা কয়েক মিনিটের জন্য বিশ্রাম করিতে বসিল। মন্দির-প্রাঙ্গণ, মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী তমালতলা দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল; মশাল জ্বালান হইল, চারিদিকে বাতি, রঙ্গমশাল প্রভৃতি জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একত্র তুমুলরবে সমস্ত ঢাক বাজিয়া উঠিল; বাহকেরা হরিধ্বনি করিয়া কার্ত্তিক ঘাড়ে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে পুনর্ব্বার আলোকমালাবেষ্টিত, জনপূর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া নদীর দিকে চলিল।

কিয়দ্দূর হইতে দর্শকগণ গৃহমুখে ফিরিয়া আসিল। নদীতীরে কার্ত্তিকের পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লওয়া হইল। চৌধুরীদের রাজকার্ত্তিকের তাজ, ময়ূরপুচ্ছ, বস্ত্রাদি সমস্ত খুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্রকায়া নদীর আবক্ষজলে তাহাকে বিসর্জ্জন দিল। ... কর আওয়াজ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ বাজনা বাজিতে লাগিল; বিসর্জ্জনের সেই ...-করুণ, কাতরতা মিশ্রিত বাদ্যধ্বনি শুনিয়া সকলে বুঝিতে পারিল 'কার্ত্তিকের লড়াই' ... হইয়াছে।

দেশবিদেশ।

"ভৃগুক্ষেত্রে"

বহুদিনের ক্ষুধাতুর ব্যক্তি, সুপক্ক সুপরিষ্কৃত অন্নরাশি ও নানাবিধ দুর্লভ রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্যবস্তু সম্মুখে দেখিলে যেরূপ ব্যাকুল হইয়া কোনটী অগ্রে ভক্ষণ করিবে ইহা ভাবিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়, চির-দরিদ্র আজন্ম-ভিখারীকে নানাবিধ দ্যুতিময় মণিমাণিক্যপূর্ণ রত্নভাণ্ডার দেখাইলে, কোন রত্নটী বাছিয়া লইয়া সে তাহার দারিদ্র্য দূর করিবে, এইরূপ ভাবিয়া যেমন আকুল হয়— চির-অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলে সে এই বিশালজগতের কোন অংশ অগ্রে দেখিয়া, দৃষ্টিশক্তির অতীত বিরহের ক্ষতিপূরণের অনন্ত সুখলাভ করিবে এই ভাবিয়া যেমন দিশাহারা হইয়া উঠে, আমরা পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তদ্রূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও

ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলাম। তুমি জান না—এ উদ্বেগ, এ আকাঙ্ক্ষা, এ আগ্রহের মূল্য কত? রুদ্ধ জগতের মধ্যে, চিরপরিচিত লীলাক্ষেত্রের মধ্যে, কোলাহল ও দুঃখকষ্টময় জীবন-পরিসরের মধ্যে, কখনও যাহা দেখি নাই ও দেখিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ভাবি নাই, আজ তাহা অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! এস্থলে প্রাণের ভিতর কি যে এক অব্যক্ত কাতরতা উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না।

এদিকে অনন্ত, অপরিবর্ত্তিত, ঘোর শব্দিত, মত্ত-জলোচ্ছ্বাসের দূর-প্রশমিত গম্ভীর আহ্বানে, মধুর সঙ্গীতে দিগন্ত ছাইয়া, সেই নির্জ্জন জনমানবশূন্য পঞ্চবটী পরিপূরিত করিয়া "নর্ম্মদা প্রপাত" আমাদের সাদর আহ্বান করিতেছে; ওদিকে আবার অনন্ত হইয়াও সান্ত, শ্যাম-কলেবর, সুদূর-প্রসারিত, উপলখণ্ডমণ্ডিত উপত্যকা ভূমি—দুইপার্শ্বে শ্যামল শাখাময় বৃক্ষরাজি লইয়া তাহার সুশীতল ছায়া ও মধুর মলয় সেবনের জন্য করসঞ্চালনে আমাদের যেন ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে—আবার অন্যতর দিকে—সুনীল, জ্যোতির্ম্ময়, আকাশের নীচে, স্বপ্নরাজ্যের উন্মুক্ত উপত্যকাপথে—বন্যপক্ষীর বিজন সঙ্গীত, মেঘরাশির মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া, জলপ্রপাতের মধুর গম্ভীর সঙ্গীতে অঙ্গ মিশাইয়া আমাদের হৃদয়কে সেইদিকে টানিতেছে। আবার পরোক্ষ দিকে গগণস্পর্শী, তুষার-ধবল, চঞ্চলবালার্ক কিরণদীপ্ত, সমুন্নত শৃঙ্গ আকাশের কোলে স্থাপন করিয়া, বিশালদর্শন মহোন্নতকায় মর্ম্মরপাহাড় আমাদের চিত্তকে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও তাহার স্রষ্টার অসামান্য কৌশল দেখাইবার জন্য আকর্ষিত করিতেছে—আর সম্মুখে ভৃগুক্ষেত্রের এক সর্ব্বোচ্চ ভূধরশিখরে উন্নত ত্রিশূল, একটু পার্ব্বত্য সমীরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত লোহিত পতাকা লইয়া—ভগবান গৌরীশঙ্করের মন্দির ও তাহার অবলম্বী সুদীর্ঘ পর্ব্বতগাত্রবাহী প্রস্তরবদ্ধ সোপানরাজি আমাদের মনকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা কোথায় যে আগে যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা করিতে পারিতেছি না। যাইহউক অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া আমরা সম্মুখে পর্ব্বতগাত্রবাহী সোপানশ্রেণীতে উঠিয়া গৌরী-শঙ্করের মন্দিরোদ্দেশে চলিলাম।

গৌরীশঙ্কর।

সোপানের পর সোপান। নীচে হইতে দেখিলে বোধহয়—যেন ইহারা পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কত উর্দ্ধে—কে জানে কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়া লীন হইয়াছে। অধঃস্থ উপত্যকায় দাঁড়াইলে উর্দ্ধদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না—সীমান্তভাগ চক্ষে পড়ে না। কত অতীতের স্মৃতিমধ্যে ডুবিয়া কত কালগর্ভগত—প্রমার, গোভিল, চেদি ও চন্দেলা রাজবংশীয়দের প্রভাতকমল সদৃশা, অসূর্য্যম্পশ্যা, রাজলক্ষ্মীরূপিণী রাজকামিনীগণের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া—কত ঝঞ্ঝাবাত, কত শিলাবৃষ্টি, কত বজ্রপাত উপেক্ষা করিয়া এই কঠিনহৃদয় পাষাণ-সোপান আজও দুর্দ্ধর্ষভাবে দণ্ডায়মান!

মৎসঙ্গী ও আমি অদম্য উৎসাহে সোপানশ্রেণীতে উঠিতে লাগিলাম। মনে মনে একটী একটী করিয়া গুণিয়া লইতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের সমভিব্যাহারী চস্‌মধারী বন্ধুটী আরও অগ্রসর হইতে বড়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক প্রলোভন দেখাইলাম—কিন্তু তিনি ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। এই সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলে, যদি স্বর্গের চির-উজ্জ্বল-স্বর্ণমণ্ডিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাতেও তিনি সম্পূর্ণ নারাজ। কাজেই আমাদের সেখানে অর্দ্ধেক পথে বিশ্রামলাভ জন্য বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিতে হইল।

ঘনস্রাবী স্বেদজলে শরীর ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সন্তানের কষ্ট মা'র প্রাণে সহিবে কেন? প্রকৃতির আদেশে শাখাগুলি দুলাইয়া পার্শ্বস্থ সমুন্নত বিটপীরাজি পার্ব্বত্য সমীরকে ইতস্ততঃ প্রবাহিত করিতে লাগিল। তৃষ্ণাবোধ হইতেছে—কিন্তু জল কোথায়? প্রস্রবণ-বারি সেখান হইতে অনেক দূরে। প্রসন্নসলিলা নর্ম্মদাও অনেক নিম্নে। কিন্তু প্রকৃতি অঙ্গুলি হেলাইয়া আশে পাশে অগণ্য ফলপূরিত পক্ক আম্‌লকী বৃক্ষ দেখাইয়া দিলেন।

সেই পর্ব্বত-বিহারিণী, অদৃষ্টা বনদেবীর অযাচিত আতিথ্যসৎকারে, আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইল। আমাদের সঙ্গে যে পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক ছিল—হুকুম প্রাপ্তিমাত্রেই সে গাছে উঠিয়া শত শত ফলপূর্ণ আম্‌লকীর ডাল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। আমরা বৃন্তচ্যুত নিম্নে নিক্ষিপ্ত, গুচ্ছভ্রষ্ট অযাচিত উপহারগুলি কুড়াইয়া লইয়া দুই চারিটীর আস্বাদ আরম্ভ করিলাম। তৃষ্ণায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছিল, কণ্ঠ রসহীন হইতেছিল—আম্‌লকীর অমৃত প্রবাহে সে তৃষ্ণা কোথায় গেল জানিতে পারিলাম না। সেই কষায় সাস্বাদে বন্ধুবর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, আরও ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আ[illegible] আপ্যায়িত করিলেন।

যখন দেশে ছিলাম, তখন একদিন আমার জনৈক আত্মী[illegible] ঔষধ প্রস্তুতের জন্য আমায় কতকগুলি পার্ব্বতীয় আম্‌লকী আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আজ সেই কথা মনে উঠিল। ভগ্নবৃক্ষশাখা হইতে, ফলগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই নির্জ্জন সোপানের উপর স্তূপাকারে রাখিয়া আমরা আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে পাহাড়ীর ঘাড়ে চাপাইব, এই সংকল্পে সেইগুলি তখন সেই প্রস্তরসোপানে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল।

আমাদের পদযুগল ক্রমশঃ শক্তিহীন হইতেছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শেষের কয়েকটী সোপান উত্তীর্ণ হইয়া আমরা প্রথম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে অগণ্য বিল্ব-বৃক্ষশ্রেণী, বামে দক্ষিণে অগণ্য আতা বৃক্ষের বন, নিম্নে পদপ্রান্তে অগণ্য প্রস্তরসোপান, আর একটু ঊর্দ্ধে গৌরীশঙ্করের মন্দিরের গোলাকার প্রাচীর এবং পার্শ্বে প্রাচীন ঋষিদিগের পরিত্যক্ত কয়েকটী অন্ধকারময় নির্জ্জন গুহা। আর সম্মুখে, লোহিত পতাকামণ্ডিত, জনমানব-সমাগম-পরিশূন্য পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত গৌরীশঙ্কর দেবের অতিনির্জ্জন মন্দির।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। সেই বৃত্তাকার দেয়ালের চারিদিক ব্যাপিয়া পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে ভগ্নপ্রস্তর প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোনটীর হাত

নাই, কোনটীর বা পা নাই, কোনটী বা মুণ্ডহীন, কোনটীর বা নাসিকা নাই। সবই ভগ্ন ও অঙ্গহীন। মন্দিরটীর প্রধান দেবতা গৌরীশঙ্কর হইলেও ইহাকে "চৌষট্টি যোগিনীর" মন্দির বলে। আশে পাশে জনমানব নাই। দু দশ মাইলের মধ্যেও কেহ নাই। মূর্ত্তি-গুলির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, এমন কেহও উপস্থিত নাই। পাহাড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে আধা-হিন্দী আধা-পাহাড়িতে কত কি বকিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে অন্য কোন বিশেষ তথ্য সংগ্রহ হইল না। বুঝিবার মধ্যে এইটুক বুঝিলাম, "পাৎসাসে এস্‌মাফিক্ হাল হুয়া।" যদি তাই ঠিক হয়, তবে বাদশাহকুলপ্রদীপ ঔরঙ্গজেব ভিন্ন এ সুকীর্ত্তির অধিকারী আর কেহই নহেন! সম্মুখেই উন্মুক্ত দ্বার—আমরা গৌরীশঙ্করের মন্দিরমধ্যে গেলাম। একটী ক্ষুদ্র নাটমন্দির পার হইয়া মন্দিরমধ্যে ঢুকিতে হয়। লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত—হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে বিরাজিত। প্রভাতে কে আসিয়া চারিটী বন্যপুষ্প সংগ্রহ করিয়া পূজা করিয়া গিয়াছে। ফুলগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া মন্দিরতলে পড়িয়া রহিয়াছে। পাহাড়ী বলিল—নর্ম্মদার উপত্যকায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, তাঁহারাই অন্য লোকের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন এইরূপে পূজা করিয়া যান। তৎপরে আমি চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক প্রতিমার নিম্নে দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃতে দেবতাদের নাম লেখা আছে। নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার সন তারিখ কিছু নাই। তাহা হইলে অনুসন্ধানের অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে কতকটা আলোক-জ্যোতি আসিয়া পড়িত।

আমি যখন মধ্যাহ্ন-ম ণ মস্তকের উপরে লইয়া কোন প্রকারে পাহাড়ীর ছিন্ন ছত্রের নিম্নে মস্তক রক্ষা করিয়া, গবেষণায় নিমগ্ন—তখন দেখি আর এক মহা বিভ্রাট উপ-স্থিত! আমাদের চস্‌মাধা বন্ধু আমায় পেন্সিল ও কাগজ বাহির করিতে দেখিয়া, সেই ভীষণ রৌদ্রে রৌদ্রমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন যে, দশমিনিটের বেশী দেরী হইলেই তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া যাইবেন। আমি তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়াছিলাম—তিনি একাকী কখনই সেই উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিতে পারিবেন না, ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস। যাহারা কার্য্যের আস্ফালন বেশী করে, তাহাদের কাছে প্রকৃত কাজ অতি অল্পই প্রত্যাশা করা যায়। রুদ্ধভুজঙ্গের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ গর্জ্জন করিয়া শেষে নিরুপায় হইয়া বন্ধুবর অপ্রসন্ন মুখে মন্দিরচত্বরে এক ছায়াময় স্থান অন্বেষণ করতঃ দেহভার প্রসারিত করিলেন, আর বিশ্রাম করিতে করিতে আমাদে ,র শত শত অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

আমি বাহাদুরির লোভে সেই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া চৌষট্টি যো গিনী মন্দিরের ভগ্ন প্রতিমাগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রলুব্ধ হই নাই। দেখ! কনিং হাম্, প্রিন্সেপ্, প্রভৃতি বিদেশীয়গণ আমাদের ভারতের বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া অতীত ও প্রাচীন ইতি-হাস উদ্ধারকল্পে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিতেছেন ও করিয়াছেন। কিন্তু একেবারে । চেষ্টাহীনত্ব

বিশেষতঃ এরূপ সুযোগের মুখে ও সুবিধাজনক স্থলে—আমার পক্ষে বড় লজ্জাকর বলিয়া বোধ হইল। কৌতূহল বশে সেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে সন্তাপিত হইয়া "চৌষট্টি" মন্দিরের যে ভগ্নমূর্ত্তির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম পাঠকের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"চৌষট্টি যোগিনী" মন্দিরের ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তির তালিকা ও বিবরণ।

	মূর্ত্তির নাম	বাহন-চিহ্ন	মূর্ত্তি-পরিচয়	মন্তব্য
১	শ্রীগণেশ	* *	...	
২	,, ছত্রসম্ভর	হরিণ	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩	,, অজিতা	সিংহ	ঐ	ঐ
৪	,, চণ্ডিকা	নরকঙ্কাল	দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৫	,, আনন্দা	পদ্ম	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৬	,, কামদি	(অবনত) পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি	ঐ	ঐ
৭	,, ব্রহ্মাণী	রাজহংস	ঐ	শক্তি
৮	,, মাহেশ্বরী	যণ্ড	ঐ	ঐ
৯	,, টঙ্কারি	সিংহ	দশভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১০	,, জয়া	মার্জ্জার	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	ঐ
১১	,, পদ্মহংসা	পুষ্প	ঐ	ঐ
১২	,, রণজীরা	হস্তী	ঐ	ঐ
১৩	* নাম নাই	নাগিনী	ঐ	ঐ
১৪	,, হংসিনী	রাজহংস	ঐ	ঐ
১৫	* খোদা নাই	...	ষোড়শ হস্ত পুরুষ	ত্রিনেত্র শিবমূর্ত্তি
১৬	,, ঈশ্বরী	যণ্ড	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
১৭	,, স্থানী	পর্ব্বতচূড়া	ঐ	ঐ
১৮	,, ইন্দ্রজালী	হস্তী	ঐ	যোগিনী
১৯	,, ভগ্ন *	যণ্ড	ঐ	...
২০	,, স্থানচ্যুত *	...	ঐ	...
২১	,, থাক্কিনী	উষ্ট্র	ঐ	...
২২	,, ধনেন্দ্রী	অবনত মনুষ্য	ঐ	...
২৩	,, শূন্য অংশ *	...	...	...
২৪	,, উজ্জ্বলা	কালসার	উপবিষ্টা স্ত্রী মূর্ত্তি	...

	মূর্ত্তির নাম	বাহনচিহ্ন	মূর্ত্তিপরিচয়	মন্তব্য
২৫	শ্রীলম্পটা	অবনত মনুষ্য	উপবিষ্টা স্ত্রী মূর্ত্তি	...
২৬	,, উহা	ময়ুর	ঐ	সরস্বতী
২৭	,, ...	বরাহ	...	...
২৮	,, গান্ধারি	অশ্ব	...	...
২৯	,, জাহ্নবী	মকর	দ্বিহস্তা দেবী	গঙ্গা
৩০	,, ডাকিনী	মনুষ্য-কঙ্কাল	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	যোগিনী
৩১	,, বন্দিনী	স্ত্রীমূর্ত্তি	...	...
৩২	,, দর্পহারি	সিংহ	...	...
৩৩	,, বৈষ্ণবী	গরুড়	...	শক্তি
৩৪	,, অগ্নিনী	ঐ	...	যোগিনী
৩৫	,, ব্রহ্মাণী	মকর	...	...
৩৬	,, শাঙ্গিনী	গৃধ্র	...	...
৩৭	,, ঘণ্টালি	ঘণ্টা	...	...
৩৮	,, তত্ত্বারি	হস্তী	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি (হস্তীমূর্দ্ধা)	যোগিনী
৩৯	খোদা নাই *	...	...	...
৪০	,, গঙ্গিণী	বৃষ	...	...
৪১	,, ভীষণী	অবনত মনুষ্য	...	...
৪২	,, সতমুসম্বর	হরিণ	...	...
৪৩	,, গহণী	মেষ	...	...
৪৪	খোদা নাই *	...	...	...
৪৫	,, উদরী	সজ্জিত ঘোটক	...	...
৪৬	,, বারাহি	বরাহ	বরাহ-মূর্দ্ধা	শক্তি
৪৭	,, নলিনী	বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৪৮	দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রবেশদ্বার	...	...	...
৪৯	স্থানচ্যুত *	...	...	...
৫০	,, নন্দিনী	সিংহ	...	...
৫১	,, ইন্দ্রাণী	ঐরাবত	...	শক্তি
৫২	,, ইরারি	গাভী	...	যোগিনী
৫৩	,, শুঃশ্মিনী	গর্দ্দভ	ভগ্ন হইয়াছে	...

	মূর্ত্তির নাম	বাহনচিহ্ন	মূর্ত্তি পরিচয়	মন্তব্য
৫৪	শ্রীঅঙ্গিনী	হস্তীমূর্দ্ধ মনুষ্য	...	...
৫৫	নাম নাই *	...	...	...
৫৬	,, তেরাস্তা	মহেশ্বর	স্ত্রীমূর্ত্তি বিশভুজা	...
৫৭	,, পারণী	অবনত মনুষ্য	দশভুজা	...
৫৮	,, বায়ুবেগা	কালসার	ভগ্ন	...
৫৯	,, ভুভারবর্দ্ধিনী	পক্ষী	ঐ	...
৬০	খোদা নাই *	...	...	...
৬১	,, সর্ব্বতোমুখী	যন্ত্র ও পদ্ম	ত্রিমুর্দ্ধাদ্বাদশহস্তা	...
৬২	,, মন্দোদরী	কৃতাঞ্জলি পুরুষদ্বয়	স্ত্রীমূর্ত্তি—ভগ্না	যোগিনী
৬৩	,, ক্ষেমুখী	সারস	...	...
৬৪	,, জাম্বভী	ভল্লুক		...
৬৫	,, আরোগ	নগ্নপুরুষ	...	...
৬৬	স্থানশূন্য *	*		*
৬৭	,, স্থিরচিত্তা	কৃতাঞ্জলিপুরুষ	...	অজ্ঞাতব্য
৬৮	,, যমুনা	কূর্ম্ম	...	যমুনানদী
৬৯	,, নীলদাম্বরা	গরুড়	দ্বিহস্তা	যোগিনী
৭০	,, বিভাষ	মানুষ ও নরকঙ্কাল	...	* স্থির নাই
৭১	,, নারসিংহ	নৃসিংহমুর্ত্তি	...	শক্তি
৭২	,, অন্তকারি	মহিষ	উপবিষ্ট নরসিংহমূর্ত্তি	যোগিনী
৭৩	,, পিঙ্গলা	ময়ুর	উপবিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি	শক্তি
৭৪	,, অক্ষলা	জোড়হস্ত পুরুষ	ঐ	...
৭৫	খোদা নাই *	*	ঐ	...
৭৬	,, ক্ষেত্রধর্ম্মিণী	শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃষ	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৭৭	,, বীরেন্দ্রী	অশ্বমুর্দ্ধা	ঐ	ঐ
৭৮	স্থানভ্রষ্ট *	*	*	*
৭৯	,, শুধালি দেবী	কোন অজানিত জন্তুমূর্ত্তি	উপবিষ্টা স্ত্রী	যোগিনী
৮০	* পশ্চিম প্রবেশপথ *	*	*	*
৮১	,, স্থানভ্রষ্ট *	*	*	*

এই মন্দিরে চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত—আট্‌টী শক্তিমূর্ত্তি, তিনটী নদীমূর্ত্তি, শক্তির চারিমূর্ত্তি, শিব ও গণেশের দুইমূর্ত্তি,—মোট একাশি মূর্ত্তি আজও বর্ত্তমান।

ভৃগুক্ষেত্রকে চলিত কথায় লোকে "ভেড়াঘাট" বলিয়া থাকে। গৌরীশঙ্করের মন্দির হইতে নামিয়া পার্শ্বস্থ আর একটী অত্যুচ্চ প্রস্তরময়স্থানের নিকটবর্ত্তী দেশে 'ভৃগুমুণির' আশ্রম ছিল বলিয়া একটী জনপ্রবাদ আজও প্রচলিত। আশ্রম-অধিকৃত স্থানের স্মরণার্থে কতকটা অংশ ইন্দোররাজ্ঞী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

ভৃগু-আশ্রমের অনতিদূরে দত্তাত্রেয় ঋষির নির্জ্জন সমাধিক্ষেত্র। একটী প্রস্তরময় গুহা নিবিড় অন্ধকার হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া আজও ঋষিপ্রবরের নাম, সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে ঘোষণা করিতেছে। আমাদের পথ প্রদর্শক বলিল এই আশ্রম হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটী সুরঙ্গ বর্ত্তমান আছে। সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য সেই মহান্ধকার অজাগর-সঙ্কুল নিবিড় গুহায় নামিতে আমাদের সাহস হয় নাই। ভৃগু আশ্রমের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানটী অতি-মনোরম। নির্জ্জনে জগৎপাতার চিন্তার উপযুক্ত এরূপ মনোহর স্থান আর বুঝি দ্বিতীয় নাই! আশ্রম হইতে দু পাঁচ হাত দূরেই একটী মর্ম্মরপাহাড়ের বিস্তৃত শৃঙ্গ! সেখান হইতে নীচের দিকে চাহিলে গভীরতা দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—মাথা ঘুরিয়া যায়। সেই গভীরতার নিম্ন দিয়া পর্ব্বত সানুদেশ চুম্বিত করিয়া, নির্জ্জন সঙ্গীতে জীবন ভাসাইয়া নর্ম্মদা জলস্রোত প্রণয় প্রবাহের ন্যায় চলিয়াছে। এত নির্জ্জন, এত শান্তরসাস্পদ, এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়, এত চিরপ্রফুল্লতাপূর্ণ স্থান আমি জীবনে দেখি নাই। এইখানে শীতলতরুচ্ছায়ায় বসিয়া, পাহাড়ী শীতল বাতাসে, আকাশবিহারী কলকণ্ঠ পার্ব্বত্যপক্ষীর মধুর গাথা, আর নিম্ন প্রবাহিতা তরঙ্গভঙ্গমণ্ডিতা পর্ব্বত গাত্রপ্রহতা নর্ম্মদার বায়ুবেগ-বিতাড়িত প্রবল জলোচ্ছ্বাসশব্দ, শ্রবণ করার সুখ, একদিনও যদি তুমি ভোগ করিতে পাও তো তোমার জীবন সার্থক হইল। তোমার প্রাণের জ্বালা থাকে—তাহা হইলে তাহা তখনি শান্ত হইবে। তোমার প্রাণের কথা কিছু থাকে সেই নির্জ্জন তরঙ্গিণীকে বল—সেই আকাশ-বিহারী—সঙ্গীতস্রাবী কৃষ্ণবিন্দুবৎ-পক্ষীকে বল—তোমার মনের মধ্যে কিছু অভিমানের বা ক্ষোভের থাকে—নিকট প্রবাহিতা স্নিগ্ধ সলিলা নির্ঝরিণীকে বল—দুঃখময় জীবনের কাহিনী শুনিয়া কেহ তোমায় উপেক্ষা করিবে না—কেহ বিদ্রূপ করিবে না—কেহ তীব্র কটাক্ষ করিবে না—কেহ মুখ ফিরাইবে না।

যাক্ ও সব কথা—ভৃগুক্ষেত্রের এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা কে এ সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা কৌতূহল হইতে পারে। আমি এ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

এ সম্বন্ধে এ অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে একটী চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী আছে। সেই কিম্বদন্তীমতে নাগবংশীয় রাজা শালিবাহন 'গৌরীশঙ্করের' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই শালিবাহনকে শকাব্দাপ্রচারক শালিবাহন বলিয়া যেন ভ্রমে পড়িও না। উপকথার মধ্যে ইহার

জন্ম এবং উপকথাতেই শেষ। রাজা শালিবাহনের মাতা, কাশীর একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের কন্যা। তাঁহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য ছিল। একদিন বণিককন্যা—নদীতে স্নান করিতেছেন, সঙ্গে কেহই নাই—এমন সময়ে জল হইতে এক বৃহৎ সর্প উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই সর্পমূর্ত্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। বণিককন্যা এই প্রকারে বিপদগ্রস্তা হইয়া মহাভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

সেই মনুষ্যমূর্ত্তিধারী সর্প অপসৃত হইলে বনিক্‌কন্যা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। বণিক জাতিপাত ভয়ে সেই অনূঢ়া কন্যাকে বাটি হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বণিককন্যা এক কুম্ভকারের আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন।

এই নাগপরিগৃহীতা বণিককন্যার সন্তানের নামই শালিবাহন। এক সময়ে দিল্লীশ্বর কাশী আক্রমণ করিলে কুম্ভকারপালিত এই শালিবাহনই স্বীয় বাহুবলে কাশীক্ষেত্র শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত করেন। শালিবাহন কি অদ্ভুত ক্ষমতায় এই প্রকার অসমসাহসিকরূপে যুদ্ধজয় করিয়াছিলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই। শালিবাহন বলিতেন "গৌরী ও শঙ্করের" কৃপায় বরলাভ করিয়া তিনি সেই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন। যেখানে তিনি গৌরী ও শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই স্থানেই এই ঘটনার স্মরণার্থে "গৌরীশঙ্কর" মন্দির নির্ম্মিত করান। এ গল্পটী পাছে কেহ আমার স্বরচিত বলিয়া ভাবেন তাই বলিয়া রাখি, আমি এটি মেজর জেনারল বিখ্যাত কনিংহাম সাহেবের কাছ হইতে পাইয়াছি। গল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইতিহাসের কথা বলি। এই ভেড়াঘাটে বা ভৃগুক্ষেত্রে একখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছিল—তাহার ২৭ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত ছিল—

"নরসিংহ দেবের জননী
অহ্লন দেবী এই অদ্ভুত
সুদৃঢ় ভিত্তি-সঙ্কুল শিব
মন্দির ও তৎসংলগ্ন এক
মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাউলী
পরগণার উদী নামক
সমগ্র গ্রাম দেবতার জন্য নির্দ্দিষ্ট
রহিল।"

এই অহ্লন দেবী গয়াকর্ণ রাজার স্ত্রী। গয়াকর্ণ চেদীরাজ্যের "কুলসুরি" রাজবংশ-সম্ভূত। আগামীবারে এই গয়াকর্ণ ও অহ্লনদেবীর সম্বন্ধে বলিব। এইটুকু জানাইয়া রাখি, যখন ভারতে যবনাধিকার আদৌ বদ্ধমূল হয় নাই, গয়াকর্ণ সেই সময়ের একজন পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি।

কদম্ব সুন্দরী।

কবি বিদ্যাপতি-মুখে শুনি এ সঙ্গীত
উল্লাসিত পাণ্ডা, কতই কতই সুখী!
দর দর ধারে বহে নয়নযুগলে
আনন্দের ধারা! মরি, মকরন্দ পানে
বিহ্বল ভ্রমর যথা, বার বার আসি
কুসুমে বসিতে চাহে, তেমতি সুমতি
পাণ্ডা, কহিল কবিরে "বল বল কবি
বস্ত্রহরণের এই সুন্দর কাহিনী।
আর সব সুন্দরী গোপিনী, ছিল জলে
যারা, আকণ্ঠমগনা, ব্রজবিলাসিনী
ধনী, তারা কি করিল? কেমনে উঠিল?
এমন মধুর গীতি কখন শুনিনি।
শ্রীমাধব গোপিনীবল্লভ, মুরলীর
রবে, হরিত গোপিনী-মন, হে সুকবি,
হরিয়াছ মম চিত তুমিও তেমতি,
অনুপম, অপরূপ ও গীতমাধুরি!"
কবি বিদ্যাপতি, মরি, শুনিয়া সুখ্যাতি,
ভাবে গদগদ কতই আহ্লাদে! বল
এ জগতে, কোন্ কবি, কবিত্বের খ্যাতি
আপন, শুনিলে (চির সাধনার ধন!)
নাহি ভাসে আনন্দসলিলে! ওই টুকু
লাগি, হায় ও যে সর্ব্বত্যাগী; ওই টুকু
পেলে, বিশ্বে, হায় ও যে সব অবহেলে!
হাসিয়া হাসিয়া কবি, মনের আনন্দে,
মধুর ব্রজ-ভাষায়, গাঁথিয়া গাঁথিয়া,
গাহিয়া কহিলা "অপরূপ গোবিন্দের
লীলা। গোপিনীবৃন্দের অবলজ্জা হেরি
শ্রীহরি, অদৃশ্য হইলা। ব্রজ-ভিতরে,
বণিক-চত্বরে, শ্রেষ্ঠীর দোকানে, মরি,
নারী-পরিধেয় বস্ত্র যত গো আছিল
মায়াবলে হরিয়া লইলা। নারীঘাটে
সারি সারি, স্তূপাকার করি, বসনের
রাশি, অদৃশ্য হইয়া, রাখিলা শ্রীহরি।
"কোথা গেল বস্ত্র? কে লইল? কোন চে
এই রবে হাহাকার ধ্বনি, উঠিল গো
বণিক-চত্বরে!"
হেথা সেই নারী-ঘাটে,
সুনীল যমুনাজলে, আকণ্ঠ-মগনা,
ব্রজের অঙ্গনা সব, হর্ষ-কলরব
করিয়া উঠিল, হেরি সেই রাশি রাশি
(ব্রজবিলাসীর নয়নের ফাঁশি!) চারু
বসনের রাশি! হর্ষে, ছুটিয়া, ধাইয়া,
পুলিনে উঠিয়া, পরিতে লাগিল বস্ত্র
বিবস্ত্র গোপিনী!
রাধিকার কোনো আলি,
(পতির দুলালি) গুল-আনারের রঙে
রঞ্জিত, বাছিয়া নিল বাসন্তী চুনরি!
কোনো প্যারি "অচ্ছা" বলি "পিয়রি" পরিল
সচ্চা গোটাময়!—ব্রজবিলাসিনী ধনী
কোনো সুহাসিনী, মরি, গোলাপীবসনে
রঞ্জিল মোহন তনু! পুলিননিবাসী,
চপল সমীর, তার অঞ্চল হেরিয়া
চঞ্চল হইল; মরি, অনঙ্গ দেবের
বিজয়-পতাকা যেন সদর্পে উড়িল!
কোনো সুরঙ্গিণী রাঙা "লাহাঙ্গার" হেরি
বর্ণভাতি, রঙ্গে শ্রীঅঙ্গে বেড়িল; কেহ
হাসি হাসি পরিল গো বারাণসী শাড়ি!
কোনো কলাবতী, মতি-পান্না-বিজড়িত
ঝক্‌মক্ কিংখাপে সাজিল! অতি স্বচ্ছ
যমুনা-জল-দর্পণে মুখ-প্রতিবিম্ব

হেরি, বুঝিল নাগরী, আজি রজনীতে,
বাসর-শয্যাতে, হবে বিজয়িনী ! কেহ
লাল-বুটি-ময়, সুন্দর "দরেশ" মরি
হরষে পরিল ; জরির "তাঞ্জেব" কেহ ;
কেহ রজতের ভাতি "ওঢ়নি" ধরিল ;
কেহ কনকের ভাতি "ঘাঘরি" পরিল।
আহা, এইরূপে রাসরসময়ীসজ্জা
ভূষণে ভূষিতা, যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা,
শিরোপরি ধাতুর কলসী জলে ভরা,
বক্ষে ধরি কনক-কলসী রসে ভরা,
বিম্বাধরা, দু অধরে হাসি নাহি ধরে,
সুনয়না, দু নয়নে চাহনি না ধরে,
রাজহংসিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া,
গজেন্দ্রগমনে, গাহিয়া গাহিয়া গীতি,
কঙ্কণ বাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ
হার, দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,
চলিল সে নারী সেনা ব্রজ-বিজয়িনী !
চরণচুম্বনে জাগি পথ ধূলি-রাশি
আনন্দে শিহরি উঠে ! কোনো ধূলিকণা,
কোনো-চন্দ্রাননা-চরণ-পরশে, হর্ষে
পাইয়া চেতনা, কহে "ওগো গোপাঙ্গনা,
সমাপ্ত হইল মম এ ধূলি-জীবন!
এবে আমি অশোক হইয়া, ফুটিব গো
ফুল-বনে, নর-নারী-নয়ন রমিয়া।"
কোনো ধূলিকণা, উড়ি গিয়া, অধরেতে
বসে, কোনো রঙ্গিণীর ; হাসি কহে ধূলি
(স্বর্গে উঠি!) "এবে আমি হইব বান্ধুলি !"
কোন ধূলিকণা, কোনো বরাঙ্গীর মরি
নথদর্পণেতে উঠি, হাসি কহে "আলি,
এবে আমি হইব শেফালি !" গোপী-বক্ষে
উঠি, হর্ষে লুটাপুটি, হাসি কহে কোনো
ধূলিকণা "একি সখি, সুখের যাতনা !
অঙ্গ মম উঠিছে শিহরি ! হে সুন্দরি,
বুঝি আমি কদম্ব হইব, পোহাইলে
বিভাবরী !"

শ্রীরাধার সহচরী সব,
করি হর্ষ-কলরব, যাইতে যাইতে,
ব্রজের সে রাজপথে, আসি উপস্থিত
ক্রমে সেই নিরানন্দ বণিক-চত্বরে ;
যথায় উঠিতেছিল হাহাকার-ধ্বনি,
বার বার বলি "কোথা বস্ত্র ? কোথা চোর ?
কোথা বস্ত্র ? কোথা চোর ? কে করিল চুরি ?"

* * * *

বিচিত্রবসনময়ী, রাসলীলাময়ী,
রজতে কাঞ্চনে বিভূষিতা, অনিন্দিতা,
গোপ-দুহিতা-বনিতা !—তাহাদের পানে
একদৃষ্টে, মুগ্ধনেত্রে, শ্রেষ্ঠীচত্বরের যত
বণিকেরা, বাক্যহারা, চাহিয়া রহিল !
সুধাই, সুধাই করে "কোথা হ'তে পেলে
এই বস্ত্র ?" আশঙ্কায় সুধাতে নারিল !
কতক্ষণে অগ্রসরি বস্ত্র-ব্যবসায়ী
ধনদাস (ধনদাস শ্রেষ্ঠীর অগ্রণী—
চক্ষুলজ্জা অল্প তার !) ভাল আকুঞ্চিয়া,
করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গি, জিজ্ঞাসিল ক্রোধে,
"বল ওহে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
কে দিল এ বস্ত্ররাশি ? যাই বলিহারি
চৌরপণা !"

শুনি এই কঠোর আহ্বান
গোপীদের উড়িল পরাণ ! বাক্যহারা,
কাঁপি থরথরি, ভূমি পানে নেত্র করি,
সারি সারি গোপ-নারী রহিল দাঁড়ায়ে !
ক্রোধান্ধ-নয়নে সেই বণিক-মণ্ডলি
চক্রাকার করি, ঘিরিল গোপিনী-ব্রজে !
গোপী-বৃন্দ করে হাহাকার !

বাতায়নে
বসি, গোবিন্দ-চরণ-প্রান্তে, শ্রীরাধিকা,
দেখিতেছিলা এই সব ; কহিলা রাধা
"একি লীলা তব লীলাময় ! সখীদের
এ লাঞ্ছনা, পরাণে সহেনা ! পায়ে পড়ি
হে শ্রীহরি, সম্বর সম্বর লীলা তব !
হের নাথ, উঠ, উঠ !—দুষ্ট ধনদাস,
বিশাখার অঞ্চল ধরিয়া—ওই দেখ—
টানিছে সরোষে !—কত কষ্টে সম্বরিছে
বস্ত্র, চন্দ্রাবলী! আহা সোহাগিনী আলি
কাঁদে উচ্চে ; রাখ মান, রাখ বনমালি !"
অবগাহি রাধিকারে সোহাগ-সায়রে,
ঈষৎ আঘাত করি কপোলে চিবুকে
প্রেমাদরে, সরাইয়া চূর্ণকুন্তলেরে,
চুম্বিয়া মুখারবিন্দ, কহিলা গোবিন্দ
"সোহাগিনি, মিছে তব ভয় ; আমি আছি
যবে, কি সংশয় ? চাহি দেখ ব্রজেশ্বরি !"

* * *

মরি কি হরির মায়া !—দুষ্ট বণিকেরা
যতই টানিল বস্ত্র, অসহায়া সেই
গোপিনীবৃন্দের, ততই সে বস্ত্ররাশি
হয়ে যায় দীর্ঘতম ! চম্পকের বর্ণ
শাড়িখানি শেষ হলে, অশোকের বর্ণ
কোথা হ'তে শাড়ি আসি জোটে ; তাহা শেষ
হলে, কোথা হ'তে জোটে আসি, কটিতটে
সুবিচিত্র শাটী মরি অতসী-বরণ !
তাহা শেষ হ'লে, কে গো অন্তরীক্ষ হ'তে
জোগায় গো চুপে ঝক্‌মক্ নীল-আভা,
অপরাজিতার বর্ণ নীলাম্বরী শাড়ি !
হরি যাহাদের লাজবস্ত্র, এই বিশ্বে
কে করে বিবস্ত্র তাহাদের ? আজি ব্রজে
একি লীলা ! চারিধারে শত শত মরি
দ্রৌপদী !—এ কৌতুকের নাহি গো অবধি !
বস্ত্র টানি পরিশ্রান্ত, ব্যথিত দু হস্ত
দুষ্ট বণিকেরা, ভয়ে লাজে অধোমুখে
ছাড়ি দিল বস্ত্র ; কহিল, "রাক্ষসী এরা
মায়াবিনী, শিখিয়াছে কামাখ্যার যাদু !"
হেনকালে পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে
আসি উপস্থিত তথা ; কহিলা সুস্বরে
"যাও সবে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
নিজ নিজ গৃহে ; তোমরা ত' চোর নহ ;
ইহারাই অন্ধ, দুষ্ট বণিকেরা ! এরা
রাখেনা সন্ধান ভাল, আপন গৃহের !
নির্লজ্জ পামর এরা, পথে ঘাটে ধরে
অবলা জনেরে !—বণিককুলের গ্লানি
ওহে ধনদাস, ওহে চন্দনবিলাস,
তোমাদের চক্ষু কোথা ? হের সারি সারি
তোমাদেরি দোকানেতে তোমাদেরি বস্ত্র !
ধিক্ ধিক্! "হা বস্ত্র" বলিয়া, ছুটিতেছ
যথাতথা, ধরিতেছ যারে তারে পথে !
ভাঙ বুঝি ভখিয়াছ শ্রেষ্ঠীকুলগ্লানি ?"
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে, লাজে ম্রিয়মাণ,
হেঁট করি মাথা, বুঝিল সে বণিকেরা
সত্যই অলীক চুরি !—হেরিল দোকানে
বিদ্যমান যত বস্ত্র !—হাসিয়া গোবিন্দ
অদৃশ্য হইলা !
মুক্তি পেয়ে আহ্লাদিনী,
গোপ-আনন্দ-দায়িনী, রাধার সঙ্গিনী
সব, বারবার বলি "শ্রীরাধার জয়"
"জয় জয় নন্দদুলাল" "আজু কুঞ্জমে
ফাগু খেলব্ হম সব্, চলোরে সহেলি"
গাহিয়া গাহিয়া গোষ্ঠগীতি, চঞ্চল চরণে,
কঙ্কণবাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ
হার দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,

চলি গেল নারী-সেনা ব্রজ-বিজয়িনী !

*　　*　　*

কভু কবি বিদ্যাপতি গীত গাহি বলে
সেই গীতি, শুনি যাহা, বিপদভঞ্জন,
চিরলজ্জা নিবারণ, শ্রীমধুসূদন,
করিলা বারণ কলসীর শতছিদ্র
শত হস্ত দিয়া, মরি অদৃশ্য হইয়া !
অপূর্ব্ব সতীর হ'ল কলঙ্কভঞ্জন !
　বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ,
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
　কুলশীল জাতি মান !
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
　যোগীর আরাধ্য ধন,
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
　না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
　দিয়াছি তোমার পায়,
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
　মন নাহি আন ভায় ।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
　তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
　গলায় পরিতে সুখ !
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
　ভাল মন্দ নাহি জানি,
রাধার ধেয়ানে, পাপ পুণ্য সম
　তোহারি চরণখানি !*

*　　*　　*

এইরূপে সারাদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আনন্দকাননে, মুগ্ধ বিদ্যাপতি কবি,
আইলা পাণ্ডার সহ, মধুর বৈকালে,
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যমুনার ধারে !
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যত তরু আছে
প্রতি কদম্বের মরি বাকলে বাকলে
লেখা আছে শ্রুতিমধু প্রেমের কাহিনী !
কবিরে, চতুর পাণ্ডা বিনায়ে বিনায়ে,
নানা ছন্দে, শুনাইল সে সব কাহিনী !
সর্ব্বশেষে এই চারু কদম্বের তলে,
যে স্থান এখন আছে পাষাণ-প্রতিমা,
কথার কৌতুকরঙ্গে উপস্থিত দোঁহে !

*　　*　　*

চুপ্ ! চুপ ! ওই শোন ! একি গো ক্রন্দন ?
মৃদু মৃদু একি গুঞ্জরণ ! ভ্রমর গুঞ্জন
একি ? মধুর অস্ফুট বীণার তারেতে
একি গো প্রেমের আলাপন ? কুতূহলী
পাণ্ডা, বিস্ময়-বিস্ফারনেত্রে, চাহিতেছে
চারিধার !—একি, একি, অদ্ভুত ব্যাপার !
সহসা তরুর বক্ষ হইল বিদার,
বল্কলের [illegible]লিকা কে যেন সহসা
করে দিল অপাসার ! তরুবক্ষমাঝে
একি রাজে ? নারীমূর্ত্তি ! উদ্ভিদ-দেবতা !
অদ্ভুত, অতুল্য রূপ লাবণ্য-প্রতিমা !

*　　*　　*

ভয়ত্রস্ত পাণ্ডা, হেরি সে মোহিনী মূর্ত্তি,
ফেলি তথা মাথার পাগ্‌ড়ি ; ফেলি তথা
চির যতনের ধন, ভাঙ ঘুঁটিবার
সোঁটা, ব্যস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, গেল পলাইয়া !

*　　*　　*

কোথা বিদ্যাপতি কবি ? অবাক্, স্তম্ভিত,
চরণদুখানি কিলবিদ্ধ ! লৌহ যথা
চুম্বকের তেজে, শ্যাম হিরণ্ময়ী কান্তি
তেমতি সে পল্লবের দুকূল-বসনা,

* চণ্ডীদাস হইতে উদ্ধৃত।

উদ্ভিদ-মূরতি নিরখি, বিমুগ্ধ, লুব্ধ
কবির, চরণে নাহি গতি !
অকস্মাৎ
বাহিরিল কবির সুমুখ হ'তে "অয়ি
বনদেবি, কে তুমি, কি তুমি ?"
নারী-মূর্ত্তি
উত্তরিল বীণার ঝঙ্কারে, কবি-চিত্ত
রোমাঞ্চিয়া, বিমোহিয়া "বন-দেবী নয়
এ অধীনী, আখ্যা মম কদম্ব-মোহিনী"
"কদম্বমোহিনী ?—কোন্ অলকায় ওগো
থাক তুমি হে যক্ষমোহিনি !"
মুচকিয়া
উত্তরিলা মরি, তরুবক্ষ নিবাসিনী
সুহাসিনী "আমি নহি যক্ষবধূ, আমি
নহি গন্ধর্ব্বের প্রিয়া। আমি একাকিনী
আজন্মকুমারী, এই কদম্বের গর্ভে
থাকি আমি, এই ভাবে, কি দি া যামিনী,
—কাছে এস ; স্পর্শ বাহু"—
বিদ্যাপতি কবি
আনন্দে, যেন গো স্বপনে, প' াশিলা
ফুলের কাঁকণপরা, সুকোম.. বাহু
বরাঙ্গীর ! একি গো পরশ ! কি যেন কি
বিদ্যুতের মত, অকস্মাৎ প্রবেশিয়া
কবির সুতনু মাঝে, সর্ব্বাঙ্গ করিল
বিকল বিবশ ! কি যেন কি অমৃতের
মত, সর্ব্বাঙ্গে ঢালিল বিহ্বল হরষ !
যেন কোন দেব-কন্যা পুলক-অলসে
ভরি দিল কবি-তনু, ললাট অর্চ্চিয়া
হরিচন্দনের রসে ! মন্দাকিনী-জলে
অবগাহিয়া, অবাক্ হইয়া, যেন গো
তীরে দাঁড়াইয়া, ভোলা কবি নিরখিলা
সৌরভ সৌন্দর্য্যে ভরা ইন্দ্রের অমরা !

যেন কবি মিথিলায়, নব বসন্তের
নব সমাগমে, নব মলয়াহিল্লোলে,
(যবে নবীন প্রেমিক, বসন্তের পিক,
ঢালি দেয় গীতধারা বধূর অঞ্চলে)
নব পল্লব মর্ম্মরে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
নব প্রেমের উন্মেষে, হৃদয়-স্পন্দনে,
করিলা অবগাহন বাসন্ত-নির্ঝরে !

* * *

রোমাঞ্চিত কলেবরে কহিলা সুকবি
"অয়ি দেবি ! আজন্ম, আজন্ম কাল হ'তে,
তুমি কি গো আছ বন্দী এই তরুমাঝে ?
হায় রে এ দশা কে করিল ? দগ্ধবিধি,
নিষ্ঠুর পাষাণ, তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে,
কোমল শিরিষপুষ্পে কেমনে বিঁধিল ?"
"নহি আমি আজন্মবন্দিনী --এই ব্রজে
ছিনু আমি গোপের নন্দিনী !"
"তারপর ?"
"তার পর একদিন আমার দুষ্কৃতি
এ দুর্গতি করিল আমার !"
"এ ছলনা
গোপাঙ্গনা কেন ? কেন এ দাসের সাথে ?
তোমার দুষ্কৃতি ? অকলঙ্ক হাস্য-মুখ
তব, কুন্দশুভ্রবদনের কান্তি, জ্যোতিঃ
লাবণ্যেতে কি প্রশান্তি ! তোমার দুষ্কৃতি ?
দর্পণে মুরতি যথা, স্বচ্ছ সরসীতে
(মিথিলার রাজোদ্যানে) কুঞ্জ-প্রতিবিম্ব
কুঞ্জ ব'লে হয় ভ্রান্তি, তেমতি তোমার
সরল হৃদয়, স্বচ্ছ অনাবিল দেহে,
আহা ওই অকলঙ্ক নয়ন-মুকুরে,
প্রতিভাত হয় ! দেবি তোমার দুষ্কৃতি ?
ওগো মনে নাহি হয়, তুমি করেছিলে
পাপ, কোনো অসময় !"

"রাধিকার সখী
ছিনু আমি। জানেন অন্তরযামী হরি,
জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন, বাসিতাম
ভাল, কত যে রাধারে! রাধাও দাসীরে
বাসিত গো প্রাণপণে! কোথা ব্রজলীলা?
কোথা ব্রজবালা? এবে নিশার স্বপন!
আমি শুধু একমাত্র লক্ষযুগব্যাপী
চির-ম্রিয়মাণা, চির-মৃত্যুঞ্জয় সাক্ষী!
আজি কিন্তু ওগো কবি, হেরি তব মুখ,
জাগিয়াছে এ পরাণে পুরাতন সুখ!"
"তুমিও কি নহ দেবি, নিশার স্বপন?
শঙ্কা হয় মনে, পাছে যাও মিলাইয়া,
সুখ-মরীচিকা সম, জল-বুদ্বুদের
সম, স্বপনের সম! দাও একবার,
ভাল করি পরখিতে, দাও একবার,
ভাল করি পরশিতে, লাবণ্য-সম্ভার,
সুন্দর, অতনু-তনু, গোপিনি, তোমার!"
"হে কবি, কি স্পর্দ্ধা তব! প্রথম আলাপে
প্রগল্‌ভ বাসনা তব একি এ তোমার!
বড়ই হাসির কথা!"
"কবির এ স্পর্দ্ধা
জগতে বিদিত। বুঝি দেবতার শাপে,
হয় সে সর্ব্বস্বহারা প্রথম আলাপে!
হে গোপি, তোমার ওই আলাপী বয়ান
করেছে আলাপী মোরে। সাজে না তোমারে
ছলনার ভাণ; সখি, সাজে না আমারে!
আমি বুঝিয়াছি তব চিত; মম চিত
বুঝিয়াছ তুমি! অভিনব শ্যামকান্তি
হরিয়াছে মম ভ্রান্তি; বুঝিতে কি বাকি
আছে আর? আপনি দিয়াছ ধরা—
কেন আর তবে, আপনারে দাও ফাঁকি?"
"আজি নহে, কালি!"
"গোপবালা, আজি নহে?
কালি কেন? শাস্তি দাও কোন অপরাধে?"
"হে কবি, ক্ষম গো মোরে। কালি সন্ধ্যাকালে
শুনিবে কাহিনী যবে, বুঝিতে পারিবে
আমার এ আকিঞ্চন নহে বঞ্চনার!"
"কদম্ব-কাহিনী তব কদম্ব-মোহিনি!
শুনাবে না আজি তবে?"
"আজি নহে—কালি"
"আজির কি পক্ষ আছে? বিহঙ্গের মত
সে কি উড়ি যাবে? যুগযুগান্তের মত
সে যে গুরুভার হয়ে, চাপিয়া বসিবে
বক্ষের উপরি!"
"ওই শোন শঙ্খধ্বনি
আরতির; ওই শোন যমুনার ঘাটে
দেবের মন্দিরে স্তুতিপাঠ; আজি মম
সমাপ্ত হইবে উদ্ভিদ-জীবন; কালি
শাপ-অবসানে, হইবে তোমার সহ
দেখা, যমুনা-পুলিনে; নিভৃতে নিকুঞ্জে
তথা, হে কবি, পূরাব তব মনোবাঞ্ছা!
নিবেদিব সর্ব্ব কথা তোমার চরণে,
অপরূপ অদভুত কদম্ব-কাহিনী!
এই দেখ ধীরে ধীরে কদম্ব-বাকল
ঘিরিছে আমারে; হের, ভগ্ন এ ফাটল
হয়ে গেল লগ্ন!—কালি পুনঃ হবে দেখা;
আজি যাও প্রিয় সখা, বিদায়, বিদায়!"
এত বলি সবিষাদে উদ্ভিদ-দেবতা,
তরুবক্ষনিবাসিনী কদম্বমোহিনী
অদৃশ্য হইলা। ক্ষিপ্ত বিদ্যাপতি কবি
দুই বাহু পশারিলা, আলিঙ্গিয়া আহা
ধরিয়া রাখিতে! আঘাত পাইল বাহু
তরুত্বক-স্পর্শে! হর্ষ-হারা সন্ধ্যা-বায়ু
চঞ্চল হইল; সন্ধ্যা করুণে কাঁদিল

ঝিল্লি-ছলে ; নিশীথিনী, সতত কাতরা
পরদুঃখে, আঁখি-প্রান্তে অঞ্চল টানিল;
কাতরে শিশির-অশ্রু নীরবে মুছিল !

* * *

হে কবি, বিষণ্ন কেন? তুমি কি জাননা
এ জগতে এমনিই মিলনের রীতি ?
অনুরাগ-প্রীতি পুড়ে হ'ত খাক্, যদি
পলে পলে জাগাইতে মিলন-অনলে
না থাকিত বিশ্বে বিরহ-ইন্ধন ! বল,
কে গাইত মিলন-সঙ্গীত? ম্লান ওষ্ঠ
কাঁপিয়া উঠিত থর থর করি, কণ্ঠ
পরিশুষ্ক হ'ত, যদি বিরহের ছন্দে
না হ'ত গ্রথিত সে সঙ্গীত ! গাও
তবে, গাও কবি, কণ্ঠ ছাড়ি (সারানিশি
যমুনাপুলিনে বসি, মোহিনী রূপসী
গাঁথিছে তোমার লাগি বনমালা!) গাও
বিশ্ববিমোহিনী গীতি, সারা বঙ্গ যাহে
আনন্দ তরঙ্গে ভাসে হয়ে মাতোয়ারা!

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল। *
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচরে খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক-কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
পাশ পসারল কাম॥
দশনমুকুতাপাঁতি অধর মিলায়তি
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা

(ক্রমশঃ)

অথর্ব্ব বেদের সময়।

হিন্দুদের চারি বেদ আছে ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইহার মধ্যে অথর্ব্ব বেদ সকল বেদের পরবর্ত্তী। ইহা ত্রয়ীর মধ্যে গণ্য হয় নাই। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্ত ৯ম ঋকে অন্য বেদের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু অথর্ব্বের কোন উল্লেখ নাই—

তস্মাদ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচাঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বভক্ষী যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম ছন্দ ও যজু ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইল। বেদত্রয়ের পাদচারী মনুসংহিতার সঙ্কলিতাও সেইমত প্রকাশ করিয়াছেন—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ংব্রহ্ম সনাতনং
দুদোহ যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌যজুঃ সামলক্ষণং॥ ১ অধ্যায় ২৩

স্বয়ম্ভু যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অগ্নি বায়ু রবি হইতে ক্রমান্বয়ে ঋক্ যজুঃ ও সামরূপ বেদ-ত্রয় দোহন করিলেন। অর্থাৎ "ভূ"র সার পদার্থ অগ্নি হইতে ঋক্, "ভুব"র সারাংশ বায়ু বা

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

অন্তরীক্ষ হইতে যজুঃ, এবং "স্ব" অর্থাৎ আকাশের সার সূর্য্য হইতে সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋক্ সাম ও বাজসনেয়ীসংহিতায় অথর্ব্ব ঋষির উল্লেখ ও প্রশংসা আছে—

যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ প্রথস্ততে।
ইমংতুত্যমথর্ব্ববদগ্নিং মথন্তি বেধসঃ।

অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অথর্ব্ব ঋষি সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন এবং ঔদ্ধত্যও অবিনয়তা প্রযুক্ত স্বীয় বেদের গুণগান ও শ্রেষ্ঠতা এবং অন্য বেদত্রয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন—

ঋচঃসামানিছন্দাংসি পুরাণং যজুসাসহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবিদেবাদিবিশ্রিতঃ॥
যস্মাদ্‌ঋচো অপাতক্ষণ্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্তলোমানি অথর্ব্বাঙ্গিরসোমুখং।
স্কম্ভংতংব্রূহিকতম স্বিদেব সঃ। ১০ কাণ্ড ৭ ক্ত ২০

বহ্বচোহন্তি বৈরাষ্ট্রং অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছান্দোগো নাশয়েদ্ধনং তস্মাদথর্ব্বনো গুরুঃ॥
অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরা॥
ব্রহ্মা শময়েন্ নাধ্বর্য্যু ন ছন্দোগো ন বহ্বৃচঃ।
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাতস্মাদথর্ব্ববিৎ॥ ইত্যাদি অথর্ব্বপরিশিষ্ট।

ভাবার্থ—ঋক্, সাম, ছন্দ, পুরাণ, যজুঃ এবং দেবগণ সকলেই উচ্ছিষ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। যাঁহা হইতে ঋগ্ যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সাম যাঁহার লোমমাত্র ও অথর্ব্বাঙ্গিরস মুখ- সেই জগদাধার স্কম্ভ কে? তাহা বল। ঋগ্বেদীয় গুরু রাজ্যনাশ যজুর্ব্বেদীয় গুরু পুত্রনাশ এবং সামবেদীয় গুরু ধননাশ করেন অতএব অথর্ব্ববেদীয় গুরুকেই বরণ করা উচিত। অথর্ব্বা যজ্ঞরক্ষা করেন সুতরাং তিনি যজ্ঞকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদীয় পুরোহিত বিঘ্নের শান্তি করেন, রাক্ষস হইতে যজ্ঞরক্ষা করেন কিন্তু অন্য বেদীয় পুরোহিতগণ তাহা পারেন না। শান্তিপুষ্টি ও অভিচারাদি কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মা পুরোহিতের সাহায্য লওয়া হইত কিন্তু যজ্ঞের অন্য কার্য্যে তাঁহার আবশ্যক হইত না ইহাতেই ঈর্ষান্বিত পরবর্ত্তী বংশধরগণ অন্য বেদের নিন্দা করিয়া স্বীয় বেদের প্রশংসা করিয়াছেন, তত্রাপি হিন্দুগণ চিরাগত যজ্ঞপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন না, প্রত্যুত পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ীর অখ্যাতিই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—

ঋচঃপঠন্ মধুপয়ঃ কুল্যাভিস্তর্পয়েৎ সুরান।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভি র্যজুংষ্যপি পঠন্‌সদা॥

সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহং।

মেদঃ কুল্যাভিরপিচ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন॥ কাত্যায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ পাঠ করাও যা আর দেবতার বসা (চর্ব্বী) দ্বারা তর্পণ করাও তাই। যাহা হউক এই সময়েই অথর্ব্ববেদ পর্য্যায়ে আরোহণ করিয়া বেদের ত্রয়ীত্বকে চতুষ্কে পরিণত করিয়াছে।

অধ্যাপক Max Muller বলিয়াছেন * বেদাধ্যায়নে দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। ইহাদ্বারা এককালেই জগৎ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে ভাষা সম্বন্ধে যে অভাবটী রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার বেদদ্বারাই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মানবজাতির যে সময়ের ইতিহাস আমরা কোথাও পাই না, সে সময়ের ইতিহাসের জন্য আমরা ঋগ্বেদের নিকট ঋণী। এই ঋগ্বেদই রূপকচ্ছলে নক্ষত্রাবস্থানগুলিও প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন না করিলে তাহা হইতে সময় নিরূপণে কোন সাহায্যই পাওয়া যাইবে না। অতএব তাহা হইতে এখন নিরস্ত হওয়া উচিত—শেষে তাহার বিচার করিব।

অথর্ব্ববেদ নক্ষত্রাবস্থানগুলি স্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহার সময় নিরূপণে তাদৃশ কষ্ট ও মস্তক চালনা করিতে হইবে না। ইহারই রচনা মনুসংহিতা ও রামায়ণ মহাভারতাদির রচনা হইতে বিভিন্ন—ঋগ্বেদের রচনার সহিত তুলনার ত কথাই নাই। বহুকালাগত প্রযুক্ত আমরা বলি বেদ অপৌরুষেয় বা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—বেদ, ধ্যাননিরত ঈশ্বরে বা তাঁহার প্রাকৃতিক জ্যোতিতে তন্ময়চিত্ত ঋষিগণের ভক্তি প্রার্থনা ও আনন্দাদি হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা অভিব্যক্তিমাত্র কিন্তু তাহা হইলেও বিসদৃশ বা প্রলাপোক্তি নহে এই কারণেই বেদের এত সম্মাননা ও সমাদর। অপিচ বেদ এক সময়ে রচিতও হয় নাই ইহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষিগণের রচনায় পূর্ণ কিন্তু তাঁহারা এত পুরাকালের যে পরবর্ত্তী কালের রচনা আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও সংহিতাগুলি যাহা কালে বেদের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেগুলির নিকটও বেদের কোন কোন স্থানের অর্থ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতএব বেদের সময় নিরূপণে মনের স্থিরতাই প্রধান সহায়;—

অথর্ব্ববেদের ১৯ কাণ্ডে ৭ম সূক্তে নক্ষত্রাবস্থান নিম্নপ্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে।

চিত্রাণিসাকং দিবি রোচনানি।

সরীসৃপানি ভুবনে জবানি। †

---

* History of Ancient Sanskrit Literature P. 63.

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা বলিয়া থাকি যে মিসর ও কাল্ডীয় দেশেই চিত্রাক্ষর (hieroglyphics)গুলি প্রচলিত থাকায় রাশিচক্রের কল্পনাও তদ্দেশপ্রসূত। ভারতবর্ষরাশিচক্রের আবিষ্কারক কি না সে সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে বেদের কোন স্থানেই উহার উল্লেখ নাই অতএব তাহা এখানে উদ্ভূত হয় কি না তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১৪০০ বৎসরের পরে কোন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে রাশি শব্দের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। যাহা হউক আর্য্যগণও আকাশে জীবজন্তু ও প্রাকৃত বস্তুর চিত্র দেখিতে পাইতেন—

অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো।
অহানিগীর্ভিঃ সপর্য্যামি নাকং ॥ ১
সুহবং মে কৃত্তিকা রোহিণীচ
অস্তুভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসুঃ সুনৃতা চারুপুষ্যো।
ভানুরশ্লেষা অয়নং মঘামে ॥ ২
পুণ্যং পূর্ব্বফল্গুন্যৌ চাত্রহস্তঃ।
চিত্রাশিবা স্বাতিঃ সুখোমেঅস্তু।
রাধো বিশাখে সুহবানুরাধা।
জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলং ॥ ৩
অন্নং পূর্ব্বারাসন্তাংমে অষাঢ়া।
ঊর্জং যে হ্যত্তর আবহন্তু।
অভিজিন্মে বাসন্তাং পুন্যমেব
শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠা কুর্ব্বতাং সুপুষ্টিং ॥ ৪

শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সম্বৎসর।
ইদমদ্যা ব্যথ্যত　　॥ ঋ ১।১৬১।১৩
যৌ তৌ শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথীরক্ষী　　ঋ ১০।১৪।১১
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিবঃ ইন্দ্রোদবর্ত্তয়ঃ।　　ঋ ৮।১৪।১৩

এগুলি দ্বারা কুকুর বা মৃগব্যাধ (Canis Major or Serms and Minor or Procyon) ও মৃগ or Orion বুঝাইতেছে। অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকাদি নক্ষত্রেও একটী না একটী আকার কল্পনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য Orionকে কিরাৎরূপী রুদ্র বলা যাইতে পারে। তাঁহার মস্তক আর্দ্রানক্ষত্রে; তিনটী মধ্যস্থিত নক্ষত্রে তাঁহার কটিবন্ধ, মৃগশিরা তাঁহার গদার শীর্ষদেশ কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের একপাঠমতে আর্দ্রা রুদ্রের শিরোদেশ; তিনি মৃগ বা মৃগশিরাকে হস্তে ধারণ করিয়া আছেন—এই কারণেই শিবের ধ্যানে—"পরশু মৃগবরাভীতিহস্তংপ্রসন্নং" ইত্যাদি বচন দেখিতে পাই এবং পাঠান্তর মতে মৃগব্যাধই রুদ্র বলিয়া বোধ হয়েন, আর রুদ্রের একাদশ নামের অন্যতমটী মৃগব্যাধও বটে (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই কারণেই মহিম্নস্তোত্রে মৃগরূপী প্রজাপতির পশ্চাৎ রুদ্ররূপী মৃগব্যাধের ধাবনব্যাপার বর্ণিত দৃষ্ট হয়।

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং।
গতং রোহিদ্ভূতাং বিরময়িষুমৃষ্যাস্যবপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রা কৃতমমুং।
ত্রসন্তং তেহদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ রভসঃ॥
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগোভূত্বাসপাবকঃ॥ ১৩
সতু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্যাব্যরাজত।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠিরনমস্তলে॥ ১৪ মহাভারত সৌপ্ত ১৮ অধ্যায়
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনং॥ শকুন্তলা

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে ভারতীয়গণও চিত্রদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Cunningham সাহেব সংস্কৃত বর্ণমালায় সে ভাবের পরিস্ফুটন প্রদর্শন করিয়াছেন—যেমন থ অর্থে সূর্য্য; ইহার আকার পালিভাষায় (যাহা পুরাতন দেবনাগর বা সংস্কৃত অক্ষর) বৃত্তমধ্যে বিন্দুরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্দ্ধবৃত্তে বা 'গ'য়ে গগণ বোঝায় ইত্যাদি। তাঁহার Inscription of India vol. I. দেখিলে পাঠকবর্গ পালি অক্ষরের অর্থ জানিতে পারিবেন।

আমে মহচ্ছতভিষ গ্বরীয়।
আমে দ্বয়া প্রোষ্ঠপদা সুশর্ম্ম।
আরেবতীচাশ্চযুজৌ ভ্যাংমে।
আমে রয়িংভরণ্যঃ আবহন্ত॥ ৫

ভাবার্থ—আকাশে নানাপ্রকার মনোহর গতিশীল সরীসৃপ দৃষ্ট হয়; তাহারাই অষ্টবিংশরূপে আকাশে অহোরাত্রমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে সম্বৎসরের মধ্যে তাহারা উদিত হইয়া আমাদের ঐশ্বর্য্য মঙ্গল ধন ধান্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরিলিখিত অংশে আমাদের সময় নির্দ্ধারণ পক্ষে চারিটী নক্ষত্রাবস্থানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতেছি।

১ম—"সুহবং মে কৃত্তিকারোহিণীচ" অর্থাৎ যজ্ঞের পক্ষে কৃত্তিকা ও রোহিণী প্রশস্ত।

২য়—"অয়নং মঘামে" অর্থাৎ মঘায় অয়ন পরিবর্ত্তন ঘটিত।

৩য়—"সুহবানুরাধা" অর্থাৎ অনুরাধাও যজ্ঞের পক্ষে প্রশস্ত।

৪র্থ—"আমে মহচ্ছতভিষ গ্বরীয়" অর্থাৎ শতভিষার সীমাই শ্রেষ্ঠ অথবা সেই সময়েই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

বসন্ত ঋতুর ক্রান্তিপাত যজ্ঞের আরম্ভ সময়; সুতরাং সত্র বা যজ্ঞ বিষুবান্ দ্বারা শরদৃতুতে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ এস্থানে অনুরাধায় শরদৃতুর ক্রান্তিপাত সংঘটিত হইতেছে। যখন বসন্তের যজ্ঞারম্ভ সম্বন্ধে দুই নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতেছি তখন ইহা ত নিশ্চয় যে দুই নক্ষত্রে এক সময়ে ক্রান্তিপাত অবস্থান করিতে পারে না, তবে এ প্রকার হইবার অর্থ আছে—ক্রান্তিপাত রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে কৃত্তিকাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল—অর্থাৎ রাশিচক্র সম্বন্ধে কৃত্তিকার ভোগাংশ ৪০ অংশ ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। এই কয়টী নক্ষত্রাবস্থানের মধ্যম অংশ ধরিলে জানা যায় ক্রান্তিপাত মেষের আরম্ভ বা নিরংশ স্থান হইতে ৪৬ অংশ ৪০ কলা পশ্চিমে ছিল। ইহা দ্বারা যদিও অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন কাল (৭২ × ৬$\frac{২}{৩}$) ৪৮০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে তত্রাপি আমরা কৃত্তিকার ভোগাংশ ৪০ ধরিয়াই গণনা করিব, যে হেতু নক্ষত্রের আদিতে কৃত্তিকারই নাম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব নিরংশ স্থান হইতে অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলন কাল (৪০ × ৭২) ২৮০০ বৎসর হইতেছে। আমাদের মতে নিরংশকাল ২৮৪ খৃষ্টাব্দ (হিন্দুজ্যোতিষীগণের বিবরণ, ভারতী ভাদ্র ১৩০৩ দ্রষ্টব্য) নিরূপিত হইয়াছে সুতরাং অথর্ব্ব বেদ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২৫১৬ বৎসরে অথবা ৩০০০ ও ২৫১৬ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়। Weber, Bentley আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ৪০০০ বৎসররূপ আসন প্রদান করিতে বড় নারাজ। তাঁহাদের ত্রিকোণমিতি সাধিত গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বেদরচনা খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ১৪২৬ বৎসরের পূর্ব্বে কখনই হইতে পারে না। পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন যে আমরা অথর্ব্ব বেদের যে অংশের প্রমাণবলে তাহার সঙ্কলনকাল নিরূপিত করিয়াছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া Bentely উপরিউক্ত কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। কে যথার্থ সময় নিরূপণ করিয়াছে তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। যাঁহাদের

মূলেই কুসংস্কার রহিয়াছে, তাঁহারা প্রমাণসত্ত্বেও বেদের প্রাপ্য প্রাচীনতা স্বীকার করিতে বড় কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে এক বাইবেলই জগতের প্রাচীন গ্রন্থ। রচনার অর্ব্বাচীনতা যেমন প্রাচীনতার, প্রবীণতা তেমনি আধুনিকতার নির্ণায়ক নহে; ইহা স্মরণ রাখিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাইবেল ও বেদ তুলনা সময়ে কখন প্রমাদের বশীভূত হইবেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সে বিষয়ে বড় মনোযোগী নহেন। হিন্দুগণের চিন্তা ক্রমিক উদার হইতে উদারতর ভাব ধারণ করিয়াছে—প্রকৃতির অনুশীলন হইতে ক্রমে পরম ব্রহ্মের উপাসনায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঋগ্বেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষদের সৃষ্টিবর্ণন পাঠ করিলে তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। আর বাইবেলের সৃষ্টিবর্ণন পাঠ করুন। অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। ইহাতে ইহুদিগণ স্বীয় অনুদারতা ও ঈর্ষা ঈশ্বরেও আরোপিত করিয়াছে কিন্তু মুখে বলিতেছে পুত্তল পূজা করিও না।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ।

তৈত্তীরীয় সংহিতা ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে দীক্ষেচ্ছুক সম্বৎসরান্তে "একাষ্টকায়" দীক্ষিত হইবেন। ইহা সম্বৎসরের পত্নী ও তাহার প্রথম রাত্রি কিন্তু এসময় দীক্ষিত হইলে একটী অসুবিধা আছে অর্থাৎ তখন "আর্ত্ত" কাল "অনাবৃতু" হইয়া থাকে এবং জল বড় অপ্রিয় বোধ হয়। অতএব সম্বৎসরের আদি ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে দীক্ষিত হও; কিন্তু ইহার একটী অসুবিধা এই যে "বিষুবান্" বর্ষাকালে গিয়া পড়ে। অতএব সম্বৎসরের আদি চিত্রাপূর্ণমাসীতে দীক্ষিত হও; ইহাতে কোন অসুবিধা নাই।

"সম্বৎসরায় দীক্ষিষ্যমানা একাষ্টকায়াং দীক্ষেরন্নেষাবৈ সম্বৎসরস্য পত্নী যদেকাষ্ট
"কৈতস্যাং বা এষ এতাং রাত্রিং বসতি সাক্ষাদেব তৎ সম্বৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে। আর্ত্তং বা
"এতে সম্বৎসরাভি দীক্ষন্তে যেন্তে নামানাবৃতু অভিদীক্ষন্তে।' (ব্যস্তং (বিচ্ছিন্নং) বা এতে সম্বৎসরস্যাভিদীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেহন্তনামানাবৃতু ভবতঃ। তস্য সা নির্য্যা যদপোহ
"নভিনন্দতোহভ্যবয়ন্তি। তস্মাদে কাষ্টকয়াং ন দীক্ষ্যম্
"ফাল্গুনী পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্; মুখঃ বা এতৎসম্বৎসরস্য যৎফাল্গুনী … …।
"তস্য সা (একৈব) নির্য্যা যৎসম্মেঘে বিষুবান্ সম্পদ্যতে।
"চিত্রা পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখং (চক্ষুঃ) বা এতৎসম্বৎসরস্য যচ্চিত্রাপূর্ণমাসো …।
"তস্যন নির্য্যাস্তি … … … …।

উপরিলিখিত অংশ দ্বারা আমরা অবগত হইতেছি যে উত্তরায়ণে দীক্ষিত হইতে হইত তখন শীতকাল ঋতু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যথা "আর্ত্তা যস্মিন্কালে ভবন্তিস আর্ত্তঃকালঃ শীতেনচ আর্ত্তা ভবন্তি।" অয়ন পরিবৃত্তি ব্যস্তশব্দেনোচ্যতে" ইতি শবরঃ

ইহা এবং পরবর্ত্তী প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে উত্তরায়ণ 'মাঘী পৌর্ণমাসী'তে আরম্ভ হইত যে হেতু—১মতঃ দীক্ষার অনুপযুক্ততা নির্দ্দেশ করিবার পরেই ফাল্গুনীর উল্লেখ আছে।

২য়তঃ ফাল্গুনীতে দীক্ষার আরম্ভ করিলে বিষুবান্ ভরপুর বর্ষায় গিয়া পড়ে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষে বিষুবান্ সংঘটিত হয়। ইহা ছাড়া লৌগাক্ষী একস্থানে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে "মাঘীপূর্ণমাসীর চারি দিবস পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবে"—"মাঘ্যাঃ পৌর্ণমাস্যাশ্চতুরহঃ পুরস্তাৎ সম্বৎসরায় দীক্ষন্তে।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—"কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত—মুখং বা এতন্নক্ষত্রানাং যৎকৃত্তিকাঃ" "মুখং বা এতদৃতূনাং যদ্বসন্তঃ। দেবগৃহাবৈনক্ষত্রাণি। কৃত্তিকাঃ প্রথমং বিশাখে উত্তমং "তানি দেবনক্ষত্রাণি। অনুরাধা প্রথমং। অপভরণীরুত্তমং। তানি যমনক্ষত্রাণি। যানিদেব "নক্ষত্রাণি তানি দক্ষিণে পরিচন্তি। যানি যমনক্ষত্রানি তান্যুত্তরেণ।"

নক্ষত্রের আদি কৃত্তিকায় অগ্নি স্থাপন করিবে এবং তাহা ঋতুর আদি বসন্তেই করা উচিত। নক্ষত্রগুলি দেবতার গৃহ, ইহাতে কৃত্তিকা হইতে বিশাখাবধি দেবনক্ষত্র, তাহার সীমা দক্ষিণে। অনুরাধা হইতে অপভরিণী পর্য্যন্ত যমনক্ষত্র; তাহার সীমা উত্তরে। এই উত্তর দক্ষিণ সীমা দ্বারা উত্তরায়ণও দক্ষিনায়ণ বুঝায় না। কিন্তু ইহা দ্বারা দেবযান বা দেবলোক এবং পিতৃযান বা পিতৃলোক বুঝায়। ক্রান্তিপাতের উত্তরাংশে দেবযান এবং দক্ষিণাংশে পিতৃযান। "বসন্ত গ্রীষ্মোবর্ষা তে দেবাঋতবঃ শরদ্ধেমন্ত শিশিরস্তে পিতরঃ........। সযত্র উদগাবর্ত্ততে দেবেষু তর্হিভবতি দেবাংস্তর্হ্যভি গোপায়তি অথ যত্র দক্ষিণাবর্ত্ততে পিতৃষুতর্হিভবতিপিতৃন্ তর্হ্যভি-গোপায়তি।......ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যোদেবলোকং......।......ষণ্মাসান্ দক্ষিণা-দিত্য এতিমাসেভ্যঃ পিতৃলোকং।"

অতএব দেখিতেছি যখন সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমনাগমন করেন, তখন দেবযান বা দেবলোক হয় এবং যখন দক্ষিণদিকে গমনাগমন করেন, তখন পিতৃযান হয়।

উপরিলিখিত অংশগুলি বিচার করিয়া দেখিলে আমরা নিম্নরূপ নক্ষত্রাবস্থানগুলি প্রাপ্ত হইতেছি

১ম কৃত্তিকাতে বসন্তের ক্রান্তিপাত হইত।

২য় মঘাপূর্ণমাসীতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইত।

সুতরাং দেখিতেছি যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সঙ্কলনকাল অথর্ব্ব বেদের সমসাময়িক হইতেছে; তবে এইমাত্র প্রভেদ যে অথর্ব্ব বেদের সঙ্কলনকালে ক্রান্তিপাত রোহিনী হইতে কৃত্তিকায় অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু সংহিতাদির সময়ে তাহা কৃত্তিকায় ছিল, অপিচ অনুরাধায় ক্রান্তি-পাত না হইয়া বিশাখার শেষে হইত (অন্ততঃ ঋষিগণের সহজ দৃষ্টিতে তাহাই বোধ হইত) সুতরাং যদি আমরা ক্রান্তিপাতের অবস্থান ৪০ অংশে না রাখিয়া কৃত্তিকার যোগ তারা ৩৭ অংশে রাখি, তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকে; অতএব সংহিতা ব্রাহ্মণাদির রচনা সময়ে ক্রান্তিপাত ৩৭ অংশ পশ্চিমে ছিল অর্থাৎ সেগুলি খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব ২৩৮০ বৎসরের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়।

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

একাদশ অধ্যায়।

সন্ধির পরিণাম!

সন্ধি সংস্থাপিত হইল;—কিন্তু ইংরাজের মনের গোল মিটিল না। সিরাজদ্দৌলা মিত্রতাবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ক্লাইব, ওয়াট্‌স্‌ন্‌ এবং ড্রেক সাহেবকে যথাযোগ্য "সিরোপা" পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই শিরোপা গ্রহণ করিলেন, ওয়াট্‌স্‌ন্‌ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে,—তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা; সিরাজদ্দৌলার নিকট শিরোপা লইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না!*

আলিনগরের সন্ধি-সূত্রে ইংরাজের অপমান হইল বলিয়া ইংরাজমাত্রেই ক্লাইবের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; যাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সময় পাইয়া তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চকণ্ঠে ক্লাইবকে ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন! ইহা হইতেই হয়ত ওয়াট্‌স্‌ন্‌ বুঝিয়াছিলেন যে আলিনগরের সন্ধিপত্র বড় অধিকদিন সমাদরলাভ করিবে না; সুতরাং তিনি বোধ হয় "নিমক্‌হারামী" করিবেন না বলিয়াই শিরোপা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন;—"এইসময়ে তাঁহার সেনাবল কেবল দুই সহস্রমাত্র; ফরাসিরা নবাবের পক্ষভুক্ত হইলে সহজেই ইংরাজের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত। কেবল বারহৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইলে, তিনিও সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন না;—কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া বাণিজ্যরক্ষার জন্যই তাঁহাকে এরূপ (অপমানসূচক) সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইতে হইয়াছিল।" †

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে;—এখন কোনরূপে ফরাসিদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করাই ইংরাজদিগের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সিরাজদ্দৌলা এই প্রস্তাবে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন! ইহাই কি শান্তিপিপাসার পরিচয়? এখনও এক সপ্তাহ অতীত হয় নাই,—ইহার মধ্যেই আবার যুদ্ধ? তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজের ন্যায়

---

* পলাসির যুদ্ধাবসানে মীরজাফর যখন 'শিরোপা' পাঠাইয়া দেন, তখন কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ওয়াট্‌স্‌ন্‌ সাহেবের কোনরূপ ইতস্ততের পরিচয় পাওয়া যায় নাই; বরং তিনি সহস্তে মীরজাফরকে লিখিয়া গিয়াছেন যে:—Mirza Jaffier Beg, whom you have done me the honor to depute to me, has delivered me your letter, and *other marks of friendship*, with which you have been pleased to favor me.—Ive's Journal.

† Clive's Evidence.

ফরাসিরাও নবাবের পদাশ্রিত ফিরিঙ্গি বণিক্‌,—তিনি কিছুতেই আশ্রিতের সর্ব্বনাশসাধনের সহায়তা করিবেন না। ইংরাজেরা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করায়, সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্তহৃদয়ে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অগ্রদ্বীপে আসিয়া সিরাজদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির অবসর পাইয়া ইংরাজেরা আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, এবং সঙ্গীণস্কন্ধে চন্দননগর লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতেছেন। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব তাঁহার সঙ্গেই মুরশিদাবাদে যাইতেছিলেন ;—তিনি এ সকল কথা একেবারে অস্বীকার করিবার জন্য বিবিধ বিধানে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে বণিকরাজ উমাচরণ আসিয়া সিরাজদ্দৌলার সমক্ষে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে,—"ইংরাজেরা কখনও সন্ধিভঙ্গ করিবে না, তাহাদের মত সত্যপ্রিয় জাতি ভূভারতে আর নাই, তাহাদের যে কথা সেই কাজ।"* ঈশ্বরের নামে ধর্ম্মশপথের বলে সিরাজদ্দৌলাও বশীভূত হইলেন। তথাপি তিনি ইংরাজদিগকে সাবধান করিবার জন্য ওয়াট্‌স্‌নকে লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"সমুদায় কলহ বিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিলাম। আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এ দেশে আর যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিবেন না। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, আপনারা বুঝি হুগলীর নিকটস্থ ফরাসিকুঠি আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই সমরানল প্রজ্জলিত করিবেন। আমার রাজ্যে আবার কলহ সৃষ্টির আয়োজন করিতেছেন কেন? ইহা ত সকল দেশেরই সুনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার। তৈমূরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিরা ত এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোন দিনই যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিতে পারেন নাই? আপনারা রণোন্মুখ হইয়া থাকিলে, আমি আর কি করিব? বাদশাহের কর্ত্তব্যপালন ও সম্মানরক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈন্যে ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছেন,—ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধ? মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল ; কিন্তু যেদিন সন্ধি করিল, সে দিন হইতে আর কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে নাই ; ভবিষ্যতেও করিবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মশপথ পূর্ব্বক সন্ধিসংস্থাপন করতঃ জানিয়া শুনিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা বড়ই গুরুতর অপরাধ। আপনারা সন্ধি করিয়াছেন, সন্ধিপালন করিতেই বাধ্য। সাবধান! যেন আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ উপস্থিত না হয় ;—আমি যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।"†

পত্র লিখিয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না,—তিনি প্রজারক্ষার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলীতে, অগ্রদ্বীপে এবং পলাসীতে সেনাসমাবেশ করিয়া রাজধানীতে শুভাগমন করিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজেরা সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ করাই স্থির করিয়াছেন! তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সিরাজদ্দৌলা পুনরায় ওয়াট্‌স্‌নকে লিখিলেন :—

---

* Orme, vol. II.

† মূলপত্র কোথায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না ;—ইংরাজেরা এই সকল পত্রের যে ইংরাজি অনুবাদ করাইয়াছিলেন, তাহা Ive's Journal নামক পুরাতন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। সিরাজচরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পত্রগুলি আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

"গত কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় আপনার হস্তগত হইয়াছে। সেই পত্র লিখিবার পরেই ফরাসিদিগের উকীলের নিকট অবগত হইলাম যে,—আপনারা নাকি চারি পাঁচ খানি অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছেন, এবং আরও আনাইবার চেষ্টায় আছেন। ইহাও শুনিলাম যে আপনারা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াই নিরস্ত হইবেন না, বর্ষাশেষে সসৈন্যে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্তও শুভাগমন করিবেন। ইহা কি বীরোচিত অথবা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার? সন্ধিপালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাহাজগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। এই ত সেদিন সন্ধি করিলেন! এত অল্পদিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি? মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাইবেল নাই,—কিন্তু তাহারা ত সন্ধিলঙ্ঘন করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—সহসা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ হয়,—বাইবেলের ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, পরমেশ্বর এবং যীশুখৃষ্টের দোয়াই দিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছেন, অথচ কার্য্যকালে তাঁহা পালন করিতে পারিতেছেন না!" *

এই পত্রখানি যেরূপ শ্লেষাত্মক, সেইরূপ সুতীব্র ভাষায় লিখিত। বোধ হয় পত্র পড়িয়া ইংরাজদিগেরও চক্ষুলজ্জা হইয়াছিল। তাঁহারা নবাবের অনুমতি না লইয়া বাহুবলে চন্দননগর আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ওয়াট্‌স্‌ন্‌ অনন্যোপায় হইয়া নূতন এক ধূয়া ধরিয়া প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলেন ঃ—

"আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র অদ্য ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হস্তগত হইল। পত্রপাঠে জানিতে পারিলাম যে, ফরাসিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা আপনার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে আপনি যে এতদূর অসন্তুষ্ট হইবেন, এ কথা জানিতে পারিলে আমরা আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিবার আয়োজন করিতাম না। ফরাসিরা সন্ধি-সংস্থাপন করিলে আমরা আর যুদ্ধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিলেই ছাড়িব না, সুবাদারস্বরূপ আপনাকে তাহার জামিন থাকিতে হইবে। পৃথিবীতে আমাদের মত সত্যপরায়ণ লোক যে আর কোন দেশে নাই, তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই। আমি আপনাকে সত্যশপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা কিছুতেই সত্যলঙ্ঘন করিব না। প্রভু যীশু খৃষ্ট এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আবার বলিতেছি যে, আপনি যদি ফরাসিদের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া দেন, তবে আর কিছুতেই আমরা সত্যভঙ্গ করিব না।" †

ওয়াট্‌স্‌নের প্রত্যুত্তর পাইয়া সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—তথাস্তু। তিনি কলহপ্রিয় চঞ্চল যুবক হইলে, এই উপলক্ষে ইংরাজকে বিলক্ষণ দশকথা শুনাইয়া দিতে পারিতেন; বলিতে পারিতেন, ফরাসির সঙ্গে তোমাদিগের সন্ধি হয় হউক, না হয় না হউক, তাহার সঙ্গে আমার সংস্রব কি? আমার অধিকারে আর কলহ বিবাদ করিবে না বলিয়া সেদিন যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছ, তাহার সহিত ফরাসিদিগের সম্বন্ধ কি? কিন্তু সিরাজদ্দৌলা এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত না করিয়া অম্লান-বদনে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"ফরাসিযুদ্ধ সংক্রান্ত পত্র পাইয়া তন্মর্ম্ম জ্ঞাত হইলাম। আমি ফরাসিদিগকে কলহবৃদ্ধির সহায়তা করিব না, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবেন। এবং তাহারাই যদি গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করে, তবে সসৈন্যে বাধাপ্রদান করিব। আপনারা চন্দননগর আক্রমণ করিবেন শুনিয়া যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আমি ফরাসিদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সেনাবল পাঠাই নাই; আপনারা কলহ-বিবাদ উপস্থিত করিলে আমারই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং প্রজারক্ষার জন্যই (স্থানে স্থানে) সেনা-

* Ive's Journal. † Ive's Journal.

সমাবেশ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাইয়া আপনারা যে চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। ফরাসিদিগকে সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। সন্ধি হইলে, আমি একজন রাজকর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিব, এবং আপনাদের সন্ধিপত্র আমার দপ্তরে জারি করাইয়া রাখিব। মিত্রভাবে থাকিবার জন্যই সন্ধি করিয়াছি,—সে কথার কথনও অন্যথা হইবে না।

"আর এক কথা। শুনিতেছি যে দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তজ্জন্য বোধ হয় শীঘ্রই পাটনা অঞ্চলে গমন করিব। এ সময়ে আপনারা সেনাসাহায্য করিলে আমি লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব।"*

যখন নবাবের নিকট হইতে এই পত্রখানি কলিকাতায় উপনীত হইল, তখন ইংরাজমণ্ডলীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ফরাসিরা সন্ধির জন্য কলিকাতায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গিয়াছে, কেবল গৃহকলহে ইংরাজবণিক তাহা স্বাক্ষর করিতে ইতস্তত: করিয়া কালক্ষয় করিতেছেন। ওয়াট্‌সন্ সাহেবই সকল গোলযোগের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সকলেই সম্মত, কেবল একাকী ওয়াট্‌সন্ অসম্মত হইয়া সকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার প্রধান তর্ক এই যে, "পঁদিচেরীর ফরাসিদরবার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করিলে কদাচ সন্ধি করা কর্ত্তব্য নহে।" ক্লাইব দরবার বসাইয়া প্রাণপণে সন্ধির জন্য অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন, এবং সকলেই তাহাতে সম্মতিদান করায় ওয়াট্‌সনের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌সন্ তাহা দুইবার ফিরাইয়া দিবার পর, ক্লাইব স্বহস্তে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বার বার তিনবার ওয়াট্‌সনের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌সন্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না ;—সন্ধি হইল না। কাহার দোষে সন্ধি হইল না, সে বিষয়ে ক্লাইব নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে :—

"Do but reflect, gentlemen, what will be the opinion of the world of these our late proceedings. Did we not, in consequence of a letter received from the Governor and Council of Chandernagore making offers of a neutrality within the Ganges, in a manner accede to it by desiring they would send deputies, and that we would gladly come into such a neutrality with them ; and have we not since their arrival drawn out Articles that were satisfactory to both parties, and agreed that each Article should be reciprocally signed, sealed and sworn to ? What will the Nabab think ? After the promises made him on our side and after his consenting to

---

* Ive's Journal.—অনেকে এই পত্রখানির অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরাজেরা বলেন যে সিরাজদ্দৌলা পাঠানসেনার আক্রমণ ভয়ে জীবন্মৃত হইয়াই ইংরাজের নিকট সেনাবল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজচরিত্র বিচার করিয়া আমাদিগের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, ইংরাজদিগকে সেনাহীন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পাটনায় প্রস্থান করিলে ইংরাজ হয় ত সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ করিবেন, বোধ হয় সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

guarrantee this neutrality, he and all the world will certainly think that we are men of a trifling, insignificant disposition, or that we are men without principles. It is therefore incumbent on us to exculpate ourselves by declaring the real truth, that we were entirely ignorant of Mr. Watson's intentions to refuse the neutrality in the manner proposed and settled by us, and that we always thought him of a contrary opinion to what his letter declares. I am persuaded these must be the sentiments of the gentlemen of the Committee, or they never would have gone such lengths as must expose them to the censure of all reasonable men."*

ওয়াট্‌সন্ ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর আক্রমণভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া ইংরাজের নিকট সাহায্যভিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ সময়ে দায়ে পড়িয়াই—চন্দননগর লুণ্ঠনের অনুমতি দিতে হইবে। ওয়াট্‌সন্ হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে হইবে। তিনি সেই জন্য নানারূপ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—"চন্দননগরের ফরাসিদুর্গে অনেক সেনা রহিয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারি না। আপনি অনুমতি করিলেই আমরা ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিয়া সসৈন্যে আপনার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলে গমন করিতে পারি।" †

সিরাজদ্দৌলা বিষম বিপদে পতিত হইলেন। এদিকে বাদ্‌শাহী সিপাহী সদর্পে অগ্রসর হইতেছে, ওদিকে ইংরাজসিংহ সগর্ব্বে ফরাসিদলনের আয়োজন করিতেছেন;—সিরাজদ্দৌলা কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন? তিনি যদি পদাশ্রিত ফরাসিবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের সাহায্য ক্রয় করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত উভয়কূলই রক্ষা হইতে পারিত, এবং ইতিহাসলেখকেরাও বোধ হয় দুই হাত তুলিয়া সিরাজদ্দৌলার জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন! কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাহা পারিলেন না; পদাশ্রিত ফরাসিবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের নিকট সেনাভিক্ষা করা সিরাজদ্দৌলার মনঃপূত হইল না। তিনি ওয়াট্‌সনের ঘৃণিত প্রস্তাবের কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না দিয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন! ইহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

---

* Select Committee proceedings, 4 March 1757.

† Ive's Journal.

দ্বাদশ অধ্যায়।

চন্দননগর-ধ্বংস।

নবাবের প্রত্যুত্তর না পাইয়া ইংরাজেরা সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্লাইব বলিতে লাগিলেন যে, হয় সন্ধি কর, না হয় এখনই যুদ্ধঘোষণা কর। ওয়াট্‌সন্ সন্ধিতেও অসম্মত, নবাবের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধঘোষণা করিতেও অসম্মত। অগত্যা সন্ধির লেখাপড়া যেমন চলিতেছিল, সেইরূপই চলিতে লাগিল; অথচ কোন কথারই মীমাংসা হইল না!

সিরাজদ্দৌলা যে ফরাসিদিগের সর্ব্বনাশসাধনে সহায়তা করিবেন না, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, ফরাসির সঙ্গে কলহ বিবাদ উপস্থিত করিলে প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গেই কলহ করার ফল হইবে। সেই জন্য সকলেই বলিয়াছিলেন যে,—"সন্ধিভঙ্গ মহাপাপ; নবাবের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ করা হইবে না।" কিন্তু এই সময়ে মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই হইতে কয়েক পল্টন ফৌজ আসিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল; তাঁহারা দরবার বসাইয়া কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন!

এই মন্ত্রণাসভায় ক্লাইব প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন;—গবর্ণর ড্রেক, মেজর কিলপ্যাট্রিক, এবং বীচার সাহেব সদস্য হইলেন। ক্লাইবের বক্তৃতা শেষ হইলে সকলেই বুঝিলেন যে, আর নবাবের অনুমতিলাভের আশা নাই, বরং তিনি সসৈন্যে ফরাসিপক্ষ অবলম্বন করাই সম্ভব। সুতরাং সহসা চন্দননগর আক্রমণ করিলে আলিনগরের সন্ধিভঙ্গ হইয়া নবাবের সঙ্গে পুনরায় শত্রুতার সূত্রপাত হইবে। মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং বীচার বলিলেন যে, "এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অনুচিত।" ক্লাইব তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিসের সন্ধি? এই ত চন্দননগর আক্রমণের উপযুক্ত অবসর।" তখন সকলেই ড্রেক সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি অনেক হত ইতি গজ করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সমস্যার কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার "মত" কেহ গণনার মধ্যে আনিলেন না। দুই জন সন্ধির পক্ষে, একজন যুদ্ধের পক্ষে;—এরূপ অবস্থায় সন্ধি করাই স্থিরীকৃত বটে। কিন্তু মেজর সাহেব সহসা ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"আচ্ছা, এখন আমাদের যত সেনাবল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা লইয়া নবাব এবং ফরাসি দুইদলকেই পরাস্ত করা কি সম্ভব নহে?" ক্লাইব বলিলেন,—"নিশ্চয়ই সম্ভব।" তখন কিলপ্যাট্রিক মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমিও আর সন্ধি চাহি না।"* দরবার ভঙ্গ হইল।

---

* এই মন্ত্রণাব্যাপারের সমালোচনা করিতে গিয়া ইংরাজ ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল সভ্যদিগকে পরিহাস করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ক্লাইব বাহিরে আসিয়া ফরাসি-দূতকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আর সন্ধি হইবে না; অতঃপর কেবল যুদ্ধ।"

সহসা ইংরাজের মতিপরিবর্ত্তন হইল কেন, ফরাসিরা আর তাহা লইয়া কোনরূপ আন্দোলন করিলেন না। ইংরাজ তাঁহাদের পুরাতন বন্ধু, (!) সুতরাং নূতন পল্টন আসিয়াছে বলিয়াই যে তাঁহাদের মতিপরিবর্ত্তন হইল, ফরাসিরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা চন্দননগরে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আর সন্ধির আশা বৃথা;—অতঃপর কেবল যুদ্ধ!

ইংরাজ-দরবার স্থির করিলেন যে, অতঃপর কেবল যুদ্ধ! কিন্তু ওয়াট্‌সন্ তাহাতে সম্মত হইলেন না। নবাবের অনুমতি না পাইলে তিনি কিছুতেই যুদ্ধঘোষণা করিবেন না,—এ সংবাদে ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। জাহাজগুলি ওয়াট্‌সনের আজ্ঞাবহ, জাহাজ না লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করা বিড়ম্বনা মাত্র;—সুতরাং ওয়াট্‌সন্‌কে বুঝাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ওয়াট্‌সনের সংকল্প অচল অটল! সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলার অনুমতি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব; তথাপি ওয়াট্‌সনের অনুরোধে নবাবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

ওয়াট্‌সন্ ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, এ সময়ে একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলে অবশ্যই অনুমতি পাওয়া যাইবে। তিনি সেই উদ্দেশ্যে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"স্পষ্ট কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা করা যদি আপনার রাজধর্ম্ম হয়, তবে অদ্য হইতে দশ দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। অন্যথাচরণ করিলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। আমরা কেবল সরল ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্যই বলিতেছি যে আমাদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কলিকাতায় উপনীত হইবে, এবং আবশ্যক বুঝি ত আরও জাহাজ জাহাজ ফৌজ লইয়া আসিব। ইহাদের সহায়তায় এ দেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়া দিব যে, সমস্ত জাহ্নবীজল শুষ্ক করিয়াও আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু যিনি জীবনে কাহারও সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নাই, তিনিই যে স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছেন, এ কথা যেন আপনি কদাচ বিস্মৃত হইবেন না!" *

সিরাজদ্দৌলা এই পত্রের গূঢ়মর্ম্ম অনুধাবন করিয়াই লিখিয়া পাঠাইলেন যে:—

"আপনাদের নিকট যে সেনাসাহায্য চাহিয়াছিলাম তাহার কি হইল? সন্ধিপত্রের অঙ্গীকৃত অর্থ শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি, কেবল দোলযাত্রা উপলক্ষে রাজকর্ম্মচারিগণ উৎসব-মগ্ন ছিলেন বলিয়াই বিলম্ব হইয়াছে। সন্ধিভঙ্গ করা আমার অভ্যাস নাই, যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা প্রদান করিবার সময়ে বাক্‌চাতুরী করিয়া কাল হরণ করিব না! কেহ যদি আপনাদিগকে আক্রমণ করে, তখন আমিও আপনাদের সাহায্য করিব। আমি এ পর্য্যন্ত ফরাসিদিগকে কপর্দ্দক সাহায্য করি নাই; কেবল প্রজারক্ষার জন্যই হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের

* Ive's Journal.

নিকট কতকগুলি ফৌজ পাঠাইয়াছি মাত্র। এদেশের চিরন্তন প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনারা আমার অধিকারে কোনরূপ যুদ্ধকলহ উপস্থিত না করেন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।" *

এই পত্র পাইয়া সকলেই বুঝিলেন যে সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধের অনুমতি দিবেন না। যাহা সহজে হইবে না, তাহা কৌশলক্রমে সাধন করাই ওয়াট্‌স্‌নের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। কি জন্য, কাহার দোষে সন্ধি হইল না, সে সকল কথার আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ না করিয়া ওয়াট্‌স্‌ন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ফরাসিদিগের দোষেই সন্ধি হইল না; এবং যাহারা এরূপ চরিত্রের লোক, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সিরাজদ্দৌলার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাকে সাধারণ ভাবের পত্র মনে করিয়াই সাধারণ ভাবেই প্রত্যুত্তর লিখিলেন ঃ—

১০ মার্চ্চ ১৭৬৬।

"আমার পত্র পাইয়া আপনি যে প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিয়াছেন, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন যে "আপনার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমার পত্র পাইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, এবং ফরাসীদিগের সঙ্গে লেখা পড়াও শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসিরা নাকি স্বাক্ষর করিবার সময়ে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের সেনাপতিগণ এই সন্ধি পালন করিবেন কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই।" একজন ফরাসি যাহা স্বাক্ষর করিল, আর একজন আসিয়া তাহার অন্যথা করিলে তাহাদিগকে আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? সে যাহা হউক, আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ করিতে আমি নিতান্ত অসম্মত; তাহার কারণ এই যে, ফরাসিরাও আমার প্রজা এবং আপনাদের ভয়ে শরণাগত। সেই জন্যই আমি সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম। তাহাদিগকে যে অনুগ্রহ দেখাইব বা সাহায্য করিব এমন অভিসন্ধি ছিল না। আপনি ত একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সদাশয় মহাত্মা; আপনিই বিচার করিয়া দেখুন যে পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয় তবে আপনিও তাহাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান করেন কি না? তাহার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে আপনিও তাহাকে দয়া করিয়া থাকেন; সরলতায় সন্দেহ হইলে পৃথক কথা,—তখন যেমন বুঝিতে পারেন সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।"†

এই পত্রের শেষোক্ত কথাগুলি সিরাজদ্দৌলার লিখিত কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পত্রখানি যাহাতে এইরূপ ভাবে লিখিত হয় তজ্জন্য মুন্সিখানায় সময়োচিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি হইয়াছিল না। ‡

মূলপত্রখানি পারস্যভাষায় লিখিত। তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব মুন্সীখানায় "তদ্বির" করিয়া যেরূপ অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই এখন ইতিহাসের একমাত্র সম্বল। আমরা তাহারই অনুবাদ প্রদান করিলাম। এই পত্রের কোন স্থলেই অনুমতির নামগন্ধ নাই; অথচ ওয়াট্‌স্‌ন্ ইহাকেই নবাবের অনুমতি পত্র বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। ওয়াট্‌স্‌নও সমরোন্মুখ, কিন্তু পাছে উত্তরকালে ইহার জন্য গঞ্জনাভোগ করিতে হয়, বোধ হয় সেই জন্যই তিনি কৈফিয়ত সংগ্রহের আয়োজন করিতেছিলেন। যেই

* Ive's Journal. † Ive's Journal. ‡ Scrafton's Reflection, 70.

কৈফিয়ত হস্তগত হইবামাত্র ওয়াট্‌সনের সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল। তখন ইংরাজের রণবাদ্য ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল ;—জলপথে ওয়াট্‌সন্, আর স্থলপথে ক্লাইব, উভয়েই সসৈন্যে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল ; আর ৭ই মার্চ্চ ইংরাজসেনা চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া শিবির-সংস্থাপন করিল। সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে বাইবেল চুম্বন করিয়া ঈশ্বর ও যীশু খৃষ্টের পবিত্রনামে ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণ পরমায়ু এইরূপে প্রভাতশিশিরের ন্যায় এত অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

মন্ত্রণাগৃহের উত্তেজনায় পড়িয়া ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, "ফরাসির সহিত নবাবের সেনাদল মিলিত হইলেই বা ভীত হইব কেন? একাকী উভয়সেনাদল বাহুবলে পরাজয় করিব!" কিন্তু চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া সে বাহুবল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল! ফরাসিরা বীরবিক্রমে দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প, নিকটেই নন্দকুমারের সেনাদল সতর্কভাবে দণ্ডায়মান! সুতরাং ক্লাইব শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্লাইব বড়ই সিদ্ধ হস্ত। তিনি শাম দান ভেদ দণ্ডাত্মক সামরিক নীতির সমাদর রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। নন্দকুমারকে পরাজয় করিতে কতক্ষণ? কিন্তু পরাজয় করা অপেক্ষাও কি সহজ পথ নাই? ক্লাইব সেই সহজ পথের সন্ধান লইবার জন্য উমাচরণকে নন্দকুমারের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন।* উমাচরণ সহজেই কৃতকার্য্য হইলেন ;—নন্দকুমার সসৈন্যে ডঙ্কা বাজাইয়া দূরস্থানে সরিয়া পড়িলেন। ক্লাইবের কলঙ্কমোচন করিবার জন্য অনেক প্রতিভাশালী ইতিহাসলেখক অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু একজন আর কোন উপায় না পাইয়া স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, এ যাত্রা কেবল উৎকোচ-মহিমাতেই নন্দকুমার পরাজিত হইয়াছিলেন। †

ফরাসিরা প্রাণপনে দুর্গরক্ষা করিতে গিয়া দলে দলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন ; কিন্তু ইংরাজের প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। যখন তাঁহাদের বাহুবল টুটিয়া আসিল, তখন তাঁহারা ধীরে ধীরে দুর্গত্যাগ করিলেন ;—ইংরাজসেনা ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্নে মহোল্লাসে "হুরে ধ্বনিতে" জলস্থল প্রতিশব্দিত করিয়া ফরাসিদুর্গে ইংরাজের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল!

---

* Another well-applied bribe to NunComar.—Scrafton.

† A body of the Subahdar's troops was stationed within the bounds of Chander- —— previously to the attack. They belonged to the garrison of Hoogly, and were —nd of Nuncomar, governor of that place. Nuncomar had been bought —e English, and on their approach, the troops of Shirajodwola were —handernagore.—Thornton's History of the British Empire, vol.

সংবাদ পাইয়াও সিরাজদ্দৌলা ফরাসিদিগকে রক্ষা ক রতে পারিলেন না; ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। ইংরাজেরা বলেন যে, তিনি আহ্‌মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই, এবং ইংরাজবন্ধু মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্ল্লভ প্রভৃতি পাত্রমিত্রও নানাকৌশলে সিরাজদ্দৌলার হৃদয়ে আব্‌দালীর আক্রমণভীতি জাগরিত রাখিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে ত্রুটি করেন নাই। সিরাজদ্দৌলাকে যে দশজনে মিলিয়া নানা বিভীষিকায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহা সত্য কথা; কিন্তু তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াও ফরাসিদিগের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য হুগলীতে সেনাসমাবেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ফরাসিদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করাই যে তাঁহার মঙ্গলসূচক তাহা সিরাজদ্দৌলা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ইংরাজদিগকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! কে জানিত যে মহারাজ নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলার লবণ খাইয়া সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেন?

স্বরলিপি।

মিশ্র সাহানা—একতালা।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর—শ্রীমতী সরলা দেবী।

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
সে শুধু যদি ভাল বাসিত।
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি।
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা বিধি তুমি, মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য, নাহি যদি দৃষ্টি।
যদি হলাহলে ভরা প্রেম সুধা বৃষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত।

||৩|| রম১ র১ ম১। প১ র্স১ ন১। র্র্স৩। র্সনো১ নোপ১ পম১।
এ ম ন যা — মি নী ম ধু র

মগো১ মপ১ পম১। মগো১ র১ সন্১। স৩। রগো১ মগো১ র-স১।
চা — দি নী — — — হা — র

রম১ র১ ম১। প১ র্স১ ন১। র্র্স৩। —৩। ম২ প১। নো২ র্স১।
এ ম ন যা — মি নী — সে শু ধু গো

শেষ।

র্রগো১ র্রর্ম১ গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২। —২ পমগ১।
য — — দি আ — সি ত — — —

গম১ পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১। ম১ প১ পন১। ন২ ন১। ন৩।
হা — — — — য় প রা ণে এ ম ন

(আ—প্র)

—১ প১ ন১। র্স১ র্সন১ নর্সর্র১। র্স১ ন১ ন১। র্স৩। —৩। র্র২ র্র১।
— — — আ কু ল পি — য়া সা — সে শু

র্র২ র্র১। র্রগো১ র্রর্ম১ গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২।
ধু য দি — ভা ল বা — সি ত

—২ পমগ১। গম১ পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১ ॥ [ম২ ম১। মপম১
— — হা — — — — য় [এ ম ধু

(আ—প্র)

গ১ ম১। প৩। প৩। পধপ১ মগ১ ম১। প১ ন(রেরেরই)। র্সর্রর্স১ নো১ ধ১।
— ব স ন্ত এ — ত শো —(শক) হা — —

প১ ম১ গ১। গ২ গ১। গ২ গ১। গম১ গমপ১ ম১। গ১ র১ সন্১। স৩।
সি — — এ ন ব যৌ ব — ন এ — ত ক্ষ

গ২ ম১। পধ১ নোর্স১ নোধ১। প৩।]ম১ প১ পন১। ন২ ন১। ন৩।
প রা শি — — —]স ক লি উ ঠি ত

—১ প১ ন১। র্স১ র্সন১ নর্সর্র১। র্স১ ন১ ন১। র্স৩। —৩। র্র২ র্র১। র্র২
— — — পু ল কে বি — কা শি — সে শু ধু

র্র১। র্রগো১ র্রর্ম১ গোর্র১। র্স৩। র্সনো১ ধনো১ প১। প১ র্স২। —২ পমগ১।
য দি — — গো চা — হি ত — — —

গম১ পধপ১ মগর১। গ১ গর১ স১। [ধ৩। ধ২ ম১। প২ প১। প৩। ধ২
হা — — — — য় [মি থ্যা বি ধি তু মি মি

(আ—প্র)

নো১ । ধ১ প১ প১ । মপ১ মপ১ ধপ১ । ম১ গো২ । গো২ গো১ । রগো১
থ্যা ত — ব স্থ — — ষ্টি — বৃ থা এ

প। (৩)
মপ১ র১ । সর৩ । স৩ । র১ ম১ ম১ । ম১ পধ১ ম১ । প৩ । প২ স১] ম১
— সৌ ন্দ র্য্য না — হি য — দি দৃ ষ্টি —] য

প১ প১ । ন২ ন১ । ন২ ন১ । ন১ প১ ন১ । র্স১ ন১ নর্সর্র১ । র্স১ ন১ ন১ । র্স৩ ।
দি হ লা হ লে ভ রা — — প্রে — ম সু — ধা বৃ

র্স৩ । ম১ ম১ প১ । পনো২ র্স১ । রর্গো১ র্রর্ম১ র্গোর্র১ । র্স৩ । র্সনো১ ধনো১
ষ্টি কে ন ত বে প্রা ণ — — — তৃ —

প১ । প১ র্স২ । —২ পমগ১ । গম১ পধপ১ মগর১ । গ১ গর১ স১ ॥
ষি ত — — — হা — — — — য়
দি আ — সি ত — — — হা য়

রামমোহন রায়।

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেন ; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্ত্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না ; তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্ব্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট এই বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব্ব মানসীমূর্ত্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদ মহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্য্যন্ত,—স্নেহ-চিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছি—আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব—যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি মধ্যে অবতীর্ণ হইবে তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না,—সেদিন

যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ;—তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল—তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র, এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরিপরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই, তখন ছোট ছোট গ্রামসমাজ পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়াছিল ; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য্য অকার্য্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির তাঁহার বৃহৎ সঙ্কল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নব-বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙ্গলা দেশের প্রভাত বিহঙ্গেরা ইংরাজি অনুবাদমিশ্রিত সঙ্গীতে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাঙ্গলাভাষায় মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে ; তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কি করিয়া বুঝিতে হয়, রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দ্দেশ করিয়া তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও বা কণ্টকিত কোথাও বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে,—আজ সভাসমিতি, আবেদন নিবেদন, আলোচনা আন্দোলন, বাদপ্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ;—ফলতঃ বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে—কিন্তু তথাপি, আমি কল্পনা করিতেছি, যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই ; এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জ্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্ম্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ—তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে,—তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্য্যের বিশালতা ;—অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা, অতলস্পর্শ নির্ম্মল সরোবরের শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল—তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল, সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল—এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিম দিক্প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভা-

মণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মত বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মত তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সঙ্গীত-ধ্বনির প্রতি কাণ পাতিয়াছিলেন ;—সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল, তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস-বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ম্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সঙ্গীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সতত সঞ্চরমান ছায়ালোকের কোন অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত ; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার, ধর্ম্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগতপ্রতিপালন, এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদেরই মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সঙ্কীর্ণ বর্ত্তমানকালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না—তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্দ্ধে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্ব্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন ; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্ত্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়,—আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃ শব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে ;—আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাস-হীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক পরলোকের জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্যই আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা, সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্ব্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ ;—সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্ম-

সমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না, মর্ত্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মত আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, বর্ত্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য,—আর সমস্ত শুনা কথা, শিক্ষালব্ধ মুখস্থ বিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য—বস্তুতঃ সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন—আমাদের সংসার, আমাদের সুখ দুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণামস্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্যসত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দ্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজনবেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশ-দেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্য্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্ব্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব্বজীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না,—রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই সকল জড়সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না—নীড়নিবাসী তরুণ ঈগল্ পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রভেদী শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখরপ্রতিষ্ঠিত সত্যকুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন—সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙ্গালী বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি এই গৃহপালিত তরুণ বাঙ্গালীর নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ইহা নহে ইহা নহে—আমি ধর্ম্ম চাহি ধর্ম্মের পুত্তলি চাহি না, আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না। বঙ্গমাতা কিছুতেই এই

বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্ এক সময় কেমন করিয়া বাঙ্গলা দেশের সমস্ত দেশাচার লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার অনুষ্ঠানই চরম নহে—ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্য-ভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্ব্বর্ত্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বাহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্ম্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃত-রসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্ল্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত্ত রামমোহন রায় সেই সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্ম্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদপুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃষ্টধর্ম্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরাণের মূলমন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন—ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই, সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে—কর্ত্তব্যবিমুখ অলসধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্ব সাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরি-পুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতীকূলে কোন এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্তস্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর—আমি সেই তিমিরাতীত মহান্-পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্ব্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসী-গণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্কপর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্ত্তিকার অগ্নি যখন ধরিয়া

উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে—আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই সে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না—সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্য্যাতন করুক্ তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জ্জনের ঊর্দ্ধে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে—মিথ্যা, মিথ্যা, হে পৌরগণ! ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই—ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না;—সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা কর,—যে ভক্তি যেখানেসেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তিলাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা,—তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জ্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জ্জন ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে—যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণ বর্জ্জন ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ুগ্রহন করি অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীরকোষ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং মৃত কোষ পরিত্যাগ করিতেছে, কি করিয়া যে তাহা আ[illegible] জানি না।

আমাদের অন্তর প্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমা[illegible] অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে —কিন্তু সেখানে আমাদের কর্ত্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। ভাল মন্দ পাপ পুণ্য শ্রেয় প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও এ কার্য্যের যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না—তবে ধর্ম্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ বর্জ্জন কার্য্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্ত্তব্যকার্য্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃতকোষকে যেমন নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করে আমরা আমাদের মৃতবস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না। এই জন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্ম্মেরই চতুর্দ্দিকে বহুযুগসঞ্চিত

পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়,—অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিতভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে তাহারা কি আলোক কি স্বাস্থ্য কি মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশতঃ ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্ব্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে, যাহা মুখ্যবস্তু, যাহা সার পদার্থ তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিও না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহবা বলে, সত্যকে মিথ্যাস্তূপের মধ্যে হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ যাহা বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জ্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জ্জটী যখন মৃত সতীদেহ কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিস্ফলমোহে তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানবসমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র লইয়া আবির্ভূত হন,—সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে; কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে; যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি;—বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি;

সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে একমুহূর্ত্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি, আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনও মহৎ সঙ্কল্প সাধন কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই,—সেইজন্য আমাদের অন্তর-প্রকৃতি ক্রমশঃ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল, এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম্ম যে আপন আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে; যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত,—তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না,—তবে আমরা লোকসমাজে সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে অসঙ্কোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই, বারুদ এবং শীসকের গোলকদ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা, সকল দুর্ব্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্ম্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্ম্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়—রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ-পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন—যে সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন। সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে আর এই সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে আমাদের চিন্তায় কার্য্যে আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে—চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই শাস্ত্র উদ্ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত, আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশঃ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা একমুহূর্ত্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি,—সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে, তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু-বর্ষন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে, সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্ম্মল উজ্জ্বল সুন্দররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব—না, না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও, তাহার পর একদিন বলিব, এস এস হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এস হে হৃদয়ের মহারাজ, এস হে আত্মার জাগরণ! তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়াছিলাম!

এসগো নূতন জীবন!
এস গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এস গো ভীষণ শোভন!
এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন!
থাক্ বীণাবেণু মালতী মালিকা,
পূর্ণিমানিশি মায়া-কুহেলিকা,
এস গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয় শোণিত-প্রাশন!
এস গো পরম-দুঃখ-নিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন!

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই যখন আবাহন করিব, তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব,—প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পন করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব ; তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্য মিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্য মিথ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। এমন কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোন গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারম্বার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহ-রণ করিয়া যে ধর্ম্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করি লয় নাই, এমন কি, এক এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত-মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্ম্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন ;—আমরাও অগ্রে সে ধর্ম্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ; সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে,—অনেকে যাঁহারা মনে করেন জানিয়াছি তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই ; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই, এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝি-লাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই ; সত্যধর্ম্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই ; যে ধর্ম্ম স্বীকার করি সে ধর্ম্ম বিশ্বাস না করি-লেও আমাদের চলে, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করি সে ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতি বোধ হয় না ;—আমাদের ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমা-দের এমন অবিনয় এমন চাপল্য এমন মুখরতা, কোন সন্ধান কোন সাধনা না করিয়া অন্ত-রের মধ্যে কোন অভাব অনুভব বা কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এমন অনায়াসে কোন এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক উকীলের মত নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্ব্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছু-

দিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে—তখনই সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্ক বিতর্ক, এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব, ধর্ম্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব, অবশেষে সূর্য্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বই পরিতৃপ্তি নাই—তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙ্গালীকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রাম মোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিশ্রামমন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি ঃ—

"হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগো আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ।"

প্রতিশোধ।

নরেন্দ্রনাথ যখন ক্রোধভরে তারাপ্রসন্ন বাবুর আফিষের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন, তখন সকলে একবাক্যে নরেন্দ্রনাথের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন কি যাঁহারা পূর্ব্ব দিবসেও নরেন্দ্রনাথের সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তায় বলিয়াছিলেন "আপনার আর এ আফিষে থাকা ভাল নহে; আমরা হইলে বহুকাল পূর্ব্বেই কর্ম্মত্যাগ করিতাম" তাঁহারাও এখন অপরের নিকট বলিতে লাগিলেন "আরে ছিছি! নরেন্দ্রনাথ যে লেখাপড়া শিখিয়া এত ছেলেমানুষি করিবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তারাপ্রসন্ন বাবু একজন মহাশয় লোক, দেশের মাথা, তাঁহার সহিত ওরূপ ব্যবহার করা কি ভাল ?—না কাজটা ভাল হয় নাই। কাল আমরা উহাকে কত বুঝাইয়াছি যে মনিব যদি এক কথা বলেই থাকেন, তাহা হলে চেপে যাওয়া উচিত। আজ কাল এই চাকরির বাজার, কপালে ওর নিতান্ত কষ্ট আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলতঃ নরেন্দ্রনাথ যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন "বিশেষতঃ আজ কালিকার এই চাকরীরবাজারে" তাহা বুঝিতে আর কাহারও তিলমাত্র বাকি রহিল না। কেবল বুঝিলেন না নরেন্দ্রনাথের পিতামাতা, দুই একজন নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু ও নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁহারা মনে করিলেন যে ভদ্রলোকের মান সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হওয়া উচিত, আত্মসম্মান নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর এত দুর্গতি। নরেন্দ্রনাথ আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তারপর চাকরীর কথা? সে জন্য তখন কেহ বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিলেন না। নরেন্দ্রনাথ দার্শনিকের ন্যায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তারাপ্রসন্ন বাবু আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন স্বীকার করি এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন সে কথা স্বীকার করিব কিন্তু আহারদাতা কি তিনি? তাঁহার আহারদাতা কে? যে দেশে তারাপ্রসন্ন বাবু নাই, সে দেশের সকলে কি উপবাস করিয়া থাকে? যিনি তাঁহাকে আহার দিতেছেন, তিনি আমাকেও আহার দিবেন। চাকরি কোথাও না হয়, ব্রাহ্মণের ছেলে—ভিক্ষা করিয়া খাইব, তাহাতে আমাদের অপমান নাই।"

তারাপ্রসন্ন বাবুর নিবাস ২৪পরগণার কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। তিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ও দাতা। কলিকাতায় তাঁহার খুব ফলাও কারবার, প্রায় বিশলক্ষ টাকা ও দুই তিন শত [illegible]ক তাঁহার কারবারে ঘুরিতেছে। আর এত যে বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার স্বোপা[illegible] বাল্যকালে সরস্বতীর প্রতি যথার্থ বিমাতৃভাব থাকাতেই যেন কমলা তাঁহাকে নি[illegible]হের চক্ষে দেখিতেন। সামান্য টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অবশেষ ক[illegible]ধ্য একজন বিশেষ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত হয়েন। তাঁহার অনে[illegible]হল, বিশেষতঃ ধনবানের মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর প্রায় দেখা [illegible] বাল্যকালে অশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক অথবা হৃদয়ের স্বা[illegible]নতা বশতঃই হউক পরের কষ্ট শুনিলেই তাঁহার অশ্রুপাত হইত এবং সাধ্য-[illegible] করিতে চেষ্টা করিতেন। স্বয়ংসিদ্ধ ধনবানদিগের ন্যায় তিনি বিলাসের উপর বি[illegible]ক্ত ছিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, বড় বড় জুড়ি, নানাবিধ গাড়ি ও মেকেবের ঘড়ি সত্ত্বেও তিনি বড় সাদা চালচলন ভাল বাসিতেন। কিন্তু দেশের নিন্দুকেরা এত গুণ সত্ত্বেও তাঁহার শ্রবণের সূক্ষ্মত্ব লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন করিত। তারাপ্রসন্ন বাবুর বিচারশক্তি বড় তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া নিন্দুকেরা স্বীকার করিত না। এমন কি বহুকাল পূর্ব্বে যখন তিনি একজন অনাহারী মাজিষ্ট্রেট বলিয়া কোম্পানি বাহাদুরের নিকট পরিচিত হলেন তখন অনেকে বলিত যে তাঁহার নিকট যে আগে নালিশ করিবে, তাহারই জিত হইবে।

নরেন্দ্রনাথ তারাপ্রসন্ন বাবুর প্রতিবাসী এবং বয়সে প্রায় তাঁহার পুত্রের সমান। বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনেরা মনে করিতেন যে নরেন্দ্রনাথ বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী। নরেন্দ্রনাথও সর্ব্বসাধারণ যুবকের ন্যায় আপনাকে একজন

অসাধারণ মনে করিতেন। যে সকল সাধারণ ঘটনা সকলের জীবনে প্রায় ঘটিয়া থাকে, নরেন্দ্রনাথও সেই সকল ঘটনাকেই আপনার অসাধারণত্বের অনুকূলে সাক্ষ্যস্বরূপে গণ্য করিতেন। বাল্যকালে একটু আধটু কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়াই এফ, এ, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অঙ্কশাস্ত্রের সহিত যে কবিদের চিরবিবাদ এবং আমাদের নরেন্দ্রনাথ যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ অনুরক্ত নহেন, এই সামান্য ব্যাপারেই তিনি আপনাকে ভবিষ্যৎ হেম বাবু, নবীন সেন, অথবা রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে করিতেন।

পিতার তাড়নায় দুই তিনবার পরীক্ষার চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়-দ্রাক্ষা ফলে অম্লরসের সঞ্চার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। এবং অবশেষে কলেজ ত্যাগ করিয়াই "বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির দোষ," "ইংরাজী শিক্ষায় দেশের ক্ষতি" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ-কষ্ট-পীড়িত সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিরবাধিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আপাততঃ আধিভৌতিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া "মহাজন অবলম্বিত পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ" বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার একজন পিতৃবন্ধু তারাপ্রসন্ন বাবুর অধীনে তাঁহার জন্য ৩০ টাকা বেতনে একটি কর্ম্মের যোগাড় করিলেন, বলা ভাল এই কর্ম্মের জন্য নরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার পিতা কাহাকেও কিছু অনুরোধ ক রেন নাই। নরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু উপযাচক হইয়া নরেন্দ্রনাথের কর্ম্ম করিয়া দিলেন। ন্দ্রনাথও লক্ষ্মী ছেলেটি হইয়া প্রত্যহ বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত "চাকরি পেশা" শেষ করিয়া শূন্য জঠরে, বিষন্ন মনে, মৃদুমন্দ গমনে বাসায় ফিরিতে লাগিলে

এ ত গেল সাদা কথা। ইহার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের কর্ম্মপরিত্যাগ কে ... কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামরাবণের যুদ্ধের বহুকাল ... নিঃস্বার্থ দেবগণ কৈকেয়ীর কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতীর অবস্থান, দশরথের ব্রহ্মহত্যা কারণ পরম্পরার জাল বুনিয়া রাখিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথের চাকরী স্বীকার পূর্ব্বে কোন অজ্ঞাতনামা দেবতা, সেই প্রকার তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে এক অন্ধকার কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে নিজ নিজ গন্তব্য ও কর্ত্তব্য-পথে যাই মনে করিলেও এই কুহেলিকার প্রভাবে পরস্পরের সংঘর্ষণ হইয়া থাকে।

তারাপ্রসন্ন বাবুর একটি পুত্র ও একটি ভ্রাতুষ্কন্যা ছিল। চিররুগ্ন ও অক্ষম ভ্রাতা তাঁহার সংসারেই বাস করিতেন এবং তাঁহার কন্যা বিমলা তারাপ্রসন্ন বাবুর কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের কন্যাসন্তান না থাকাতে তিনি বিমলাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জ্ঞান করিতেন। ভবিষ্যতে বিবাহ দিয়া বিমলাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া তিনি কখন কখন সঙ্কল্প করিতেন যে, কোন দীনহীন গৃহস্থের পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া তাহার সহিত বিমলার বিবাহ দিবেন। আবার কখন মনে করিতেন তাহা হইলে আমার অভিমানিনী বিমলার মনে ঘরজামায়ের স্ত্রী বলিয়া বড়ই কষ্ট হইবে। এই

প্রকার নানাবিধ চিন্তার পর নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী অমরনাথের সহিত বিমলার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অমরনাথ বনিয়াদি ঘরের ছেলে, দেখিতে অতি সুশ্রী এবং পিতাও বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বিমলা গৃহের নিকটে থাকিবে, মনে করিলেই দেখিতে পাইব অথচ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে পড়িবে—ইহা অপেক্ষা আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে ? এই প্রকার সকল দিক বিবেচনার পর অমরনাথের পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। অমরনাথের পিতা সুশিক্ষিত, উন্নতমনা ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন "অমরনাথের মতামত জানিয়া আপনাকে কথা দিব ; এ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই।" তারাপ্রসন্ন বাবু দেনা পাওনার কথা উত্থাপন করিলে অমরনাথের পিতা সহাস্যে বলিলেন "আমাদের বংশে পুত্রবিক্রয়ের প্রথা নাই। আপনার কন্যাকে আপনি দিবেন তাহাতে আমার কথা কওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।" উপস্থিত সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের অসাক্ষাতে "লোকটা কি বোকা! চাহিলে অনায়াসে ১০ হাজার টাকা পাইতে পারিত, বিষয়-বুদ্ধি কিছু নাই" ইত্যাদি বাক্যে নিজের বিষয়-বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে লাগিলেন। এদিকে নরেন্দ্রনাথের উপর অমরনাথের মন জানিবার ভার পড়িল। এত মন জানাজানির বিশেষ কোন আবশ্যক ছিল না, তবে মেয়েটি নাকি একটু শ্যামবর্ণা, তাই একবার তবু জিজ্ঞাসা করা ভাল, এইজন্যই নরেন্দ্রনাথ মন জানিবার ভার পাইলেন এবং বিবাহের অনুকূলে মনও পাইলেন। বর, কন্যা, নরেন্দ্রনাথ সকলেরই এক পাড়ায় বাস সুতরাং কন্যা সকলেরই নয়নপথে পড়িয়াছিল। অমরনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিমলাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন ; এমন কি বিবাহের পূর্ব্বে বিমলা দুই এক বার অমরনাথের বাটিতে নিমন্ত্রণেও আসিয়াছিল।

কৌতুকপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ বিবাহের সময় একটু নূতন ধরণের আমোদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন নরেন্দ্রনাথ, অমরনাথকে আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্ন উপলক্ষে নিজের বাটিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অমরনাথ ভোজন করিবার জন্য ভোজন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গৃহের মধ্যে দুইখানি আসন পাতা আছে ও দুইজন লোকের আহার্য্য রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে বোধহয় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত আহার করিবেন। নরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলে তিনি বলিলেন "তুমি ব'স আমার কিছু বিলম্ব হইবে।" অগত্যা অমরনাথ আহারে প্রবৃত্ত হইলেন ; নরেন্দ্রনাথ "আসিতেছি" বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণকাল পরে গৃহের বাহিরে বসন্তকালের ভ্রমরগুঞ্জনবৎ বালিকার চরণকমলনিঃসৃত নূপুরধ্বনি হইতে লাগিল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতামহী, প্রস্ফুটনোন্মুখ অপরাজিতা কুসুমবৎ, সর্ব্বালঙ্কার-বিভূষণা নয়নাভিরাম-স্নিগ্ধ-শ্যামবর্ণা একটি বালিকার হস্ত ধরিয়া ভোজন-গৃহের অপর আসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। অমরনাথ বিস্ময়-বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন "বিমলা!" নরেন্দ্রনাথের পিতামহী বিমলাকে বলিলেন "বোস ভাই, এই আসনে ব'সে বর কনে দুজনে একসঙ্গে খাও, আমরা দেখে চক্ষু সার্থক করি। এখন ত বিয়ে

হয়নি, এর মধ্যে এত লজ্জা কেন ? এখন লজ্জা করিতে নাই।" বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল ; প্রাচীনা দেখিলেন যে, অমরনাথও খুব মনোযোগী ছেলে হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অমরনাথকে দুই একটি মিষ্ট অনুশাসন করিয়া এবং বিমলাকে জোর করিয়া আসনে বসাইয়া "খাওনা ভাই, কতক্ষণ বসে থাকবে ? ও শালা থাক্‌লেই বা ওকে লজ্জা কি ? খাও ভাই আমি দুধ আনি।" এই বলিয়াই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। বোধহয় অন্যমনস্কবশঃতই হইবে, যাইবার সময় গৃহের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মা, বিমলাকে বসাইয়া দুগ্ধ আনিবার জন্য বোধহয় "মাহিন্দির" গয়লার বাড়ি লোক পাঠাইয়া দিলেন অথবা গোয়াল বাড়িতে গিয়া দুগ্ধদোহনে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ যে সময় তিনি দুগ্ধ আনিতে গিয়া অতিবাহিত করিলেন সে সময়ের মধ্যে স্বয়ং ঠাকুরমা তিনবার আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। দুধের বাটী হাতে লইয়া ও যথাসাধ্য বিলম্ব করিয়া ঠাকুরমা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে বিমলাকে যে অবস্থায় বসাইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায়, বরং মাথাটী আরও একটু নামাইয়া, বসিয়া আছে। অমরনাথেরও প্রায় সেই অবস্থা—তবে সুখের মধ্যে আহার বন্ধ নাই, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিবাহের পর বিমলা একদিন নরেন্দ্রের পত্নীর নিকট বলিয়াছিল যে ঠাকুরমার অনুপস্থিতিকালে সে একবারও অমরনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, তাহার বুকের ভিতর কেমন গুরুগুরু করিয়া কাঁপিয়াছিল এবং নিশ্বাস ফেলিতেও সাহস হয় নাই। নরেন্দ্রের স্ত্রী কিন্তু বলে যে সে সেই সময় আড়ি পাতিয়াছিল। সে অমরনাথের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল কিন্তু কিছু অর্থ বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

"আমার জামাই আর কাহার নিকট চাকরির জন্য যাইবে ? আমার নিকট কাজকর্ম্ম শিক্ষা করুক" তারাপ্রসন্ন বাবুর এই যুক্তিসঙ্গত কথায় অমরনাথের পিতা, অমরনাথকে বৈবাহিকের অধীনে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যবন্ধুকে একই স্থলে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং দুই বন্ধুতে পরম উৎসাহে তারাপ্রসন্ন বাবুর ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারাপ্রসন্ন বাবুও জামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এমন কি কখন কোন কারণে যদি জামাতার কোন বিরক্তির সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথের উপর জামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার ভার দিতেন।

সম্প্রদায় বিশেষের মতে, সয়তান সর্পরূপ ধারণ করিয়া মানবকে সুখময়-উপবন-বাস হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। সেই সয়তানের বংশাবলী আজিও নানাবিধ আকার ধারণ পূর্ব্বক সকলকেই প্রতিপদে কষ্ট দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। হয়ত একজন পল্লীগ্রামবাসী কোন বিশেষ সমারোহ উপলক্ষে কলিকাতা দেখিতে আসিল। কলিকাতার গগণস্পর্শী বিচিত্র অট্টালিকাশ্রেণী দেখিয়া ইংরাজ জাতিকে স্বর্ণলঙ্কাবাসী রাক্ষসের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব বলিয়া

মনে করিতেছে, এমন সময় সয়তানের বংশধর কি না ফুটপাথের পাথর হইয়া তাহার পদনখে এমন আঘাত করিল যে বেচারার কলিকাতা দেখা সাধ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে স্নায়ুযোগে তড়িত-বেগে মস্তকে উঠিয়া গেল। শনিবারে ৫টার সময় আফিষের বাবু বাড়ি যাইবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলেন, সয়তানবংশধর অমনি সেই ট্রামের অশ্বরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং নানাবিধ উপায়ে যেমন করিয়াই হউক বাবুর বৃথা ২০ মিনিট সময় নষ্ট করিল; বাবু যেমন ষ্টেশনের প্লাটফরমে উপস্থিত হইলেন, আর সয়তান অমনি এঞ্জিনের বংশীধ্বনি রূপে উচ্চহাস্য করিয়া বাবুকে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া গেল, বাবু রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে বসিয়া রহিলেন। নববিবাহিত যুবক উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন প্রিয়তমার পত্র না পাইয়া, অভিমান ভরে পত্নীকে নরম গরম ভাষার সোহাগে ভিজাইয়া, বিরহের ভয় দেখাইয়া "এই পত্রের অবশ্য অবশ্য জবাব দিও" অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যেই পত্রখানি ডাকবাক্স মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন আর অমনি পোষ্টপিয়ন, সর্ব্বাঙ্গে গোলাকার ষটকোণ চৌকোণ কাল ও লালরঙ্গের ছাপলাগান একখানি পত্র দিয়া বলিল "বাবু ঠিকানার গোলমাল হওয়াতে ৪।৫ দিন পত্র খানি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আপনার পত্রখানা লউন।" সয়তান পোষ্টমাষ্টার বাবুর স্কন্ধে চাপিয়া "নইহাটির" পরিবর্ত্তে "নলহাটী" পড়াইয়া এই গোলযোগ করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের সহিত অমরনাথের সদ্ভাব দেখিয়া দুই একজন "বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী" তারাপ্রসন্ন বাবুর নিকট কথায় কথায় "এখন নরেন্দ্রনাথের একটু বিবেচনা করিয়া চলা ভাল, অমরনাথ হাজার হ'ক এখন মনিবের জামাতা, সেই রকম দেখলে ভাল হয় না" বলিয়া বাবুর মাথায় চিন্তা করিবার একটা নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া দিলেন। "বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী" মহাশয়েরা যে নিজে মন্দ লোক—একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তবে হয় ত সয়তান কখন্ কোন্ দুর্লক্ষ্য-সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের রসনায় আবির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহারা যে নিজে তারাপ্রসন্ন বাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। একবার বাবুর বাটিতে পূজা উপলক্ষে, একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী" ময়রার হিসাব নিকাসের সময় ময়রা যে বাবুকে ছানা অপেক্ষা চিনি অধিক পরিমাণে দিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহার নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক ময়রার ১৫৲ টাকা জরিমানা করাইয়া বাবুকে চিরবাধিত করেন। অপর একজন "শুভাকাঙ্ক্ষী" ১০।১২ খানা গরম গরম লুচি চাকিয়া তাহাতে যে ময়ান কম এবং লুচিভাজা ব্রাহ্মণেরা যে ইচ্ছা করিয়া কম ময়ানের লুচিতে বাবুকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছে ইহা প্রমাণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সদলবলে বরতরফ করেন।

এই হিতৈষীদের প্ররোচনায় অমরনাথের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের কিছুদিন পরে, নরেন্দ্রনাথের প্রভুজামাতা অমরনাথের প্রতি প্রভুপ্রাপ্য সম্মান না দিয়া বন্ধুপ্রাপ্য প্রণয় দেওয়াটা, তারা-প্রসন্ন বাবুর চক্ষে যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেলাগিল। অমরনাথওআবার এমন অবাধ্য যে শ্বশুরের নানাবিধ যানবাহনাদি সত্ত্বেও পদব্রজেই নরেন্দ্রনাথের সহিত যাতা-য়াত করেন। অবোধ অমরনাথ নরেনের নিকট কিছুতেই আপনার প্রভুত্ব রাখিতে পারেন

না এবং রাখিতে চেষ্টাও করেন না। অবশেষে শ্বশুর মহাশয় একদিন স্বয়ং দুই এক কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কিছু অনুযোগ করিতে উপক্রম করিলে অমরনাথ বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্বশুরের অভিপ্রায় কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথা কহিতে এ পর্য্যন্ত কোন সুযোগ পান নাই। অদ্য শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ের উল্লেখ করাতে অমরনাথ সবিনয়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে নরেন্দ্রনাথ দরিদ্র হইলেও যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশকে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজারাও সম্মান করিতেন এবং নরেন্দ্রনাথের পিতাকে সকলেই স্বাধীনচেতা উন্নতমনা, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন ও নরেন্দ্রনাথের স্বভাব চরিত্র সকলে আদর্শ বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং অমরনাথ শূদ্র। এমন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বলাভ অমরনাথের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে।

তারাপ্রসন্ন বাবুর কথার উপর কথা কহিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি নিজে একজন ধনবান ব্যবসাদার ছিলেন। অধিকাংশ দালাল ও ব্যবসাদারদিগের সংস্রবে তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইত, বিদ্বান স্পষ্টবক্তা ও উন্নতমনা লোক তাঁহার সংস্রবে বড় আসিতেন না ও আসিবার আবশ্যক হইত না। সুতরাং "কর্ত্তা যা বল্লেন" "যে আজ্ঞা হুজুর" প্রভৃতি পদ তাঁহার কর্ণকুহরে এত কলরব করিত যে তিনি যথার্থ উচিত কথা বড় শুনিতে পাইতেন না। সুতরাং এমন স্থলে যে অমরনাথের যুক্তিসঙ্গত কথা তাঁহার প্রিয় হইবে না তাহা বলা বাহুল্য। জামাতার কথায় তিনি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। জামাতা প্রস্থান করিলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দুর্গে! আমায় আবার উপদেশ দেয়! এসব ইংরাজী লেখাপড়ার ফল! মেয়েটাকে একটা মূর্খের সঙ্গে বিয়ে দিলে ভাল হ'ত; এ ত হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলে দিয়াছি!!" হায় রে ইংরাজী শিক্ষা! অজ্ঞানান্ধকারপ্রসূত কত অভিশাপ ও দীর্ঘনিশ্বাস যে তোমার শিরে বর্ষণ হইতেছে তাহা কে বলিবে?

এই হইল প্রথম সূত্রপাত। তারপর সকলেই প্রতি ঝোপে বাঘ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। অমরনাথ, শ্বশুরের কোন যুক্তিহীন অসঙ্গত আদেশ পালন না করিলে সেটা বেচারা ইংরাজী শিক্ষা ও গোবেচারা নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পড়ে! নরেন্দ্রনাথের অপরাধ তিনি অমরনাথকে আপনার সমকক্ষ ভাবেন কোন্ হিসাবে? শ্বশুরের কোন ত্রুটি দেখিলে অমরনাথ মনে করেন যে আমি উঁহার অপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে। আমি উঁহার ন্যায় ধনবান হইলে হয়ত আমাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। এ দিকে তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্রও কতকটা কুশিক্ষাবশতঃ কতকটা ঈর্ষাবশতঃ ও কতকটা বাল্যসুলভ চপলতাবশতঃ অমরনাথের প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। পাছে পিতার অধিক স্নেহ আকর্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে পিতৃসম্পত্তির অংশ আকর্ষণ করেন, বোধ হয় এই ভাবিয়াই, তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্র সারদাপ্রসন্ন সুবিধা পাইলেই অমরনাথের অতি সামান্য ক্রটী অতিরঞ্জিত করিয়া

পিতার নিকট চিত্রিত করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তারাপ্রসন্ন বাবুর নিকট যে অগ্রে নালিশ করিত তাহারই জিত হইত। সুতরাং তারাপ্রসন্ন বাবুও জামাতার আচরণে যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইতে লাগিলেন। এ স্থলে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে তাহাই হইল। তারাপ্রসন্ন বাবুর, তাঁহার পুত্রের এবং তাঁহার মতস্থ সকলের বিরক্তি একত্রীভূত হইয়া নির্দ্দোষী নরেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পড়িল। নরেন্দ্রনাথও যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে তারাপ্রসন্ন বাবুর স্নেহলাভ করিয়া পরে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া বড়ই কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। যদি প্রথম হইতে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ চলিয়া আসিত, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হইত না। প্রথম প্রথম প্রভুর নিকট হইতে স্নেহমাখা ব্যবহার পাইতেন এবং আপনাকে সেই স্নেহের যথার্থ অধিকারীও মনে করিতেন; কেননা তিনি অমরনাথের বন্ধু। অবশেষে বিনা কারণে সেই স্নেহচ্যুত হইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি দেখিতেন তারাপ্রসন্ন বাবু বরং অপরের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি গম্ভীর কর্ত্তব্যমিশ্রিত আদেশবাণী ভিন্ন অন্য কোন কথা কহি-তেন না। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত অথচ নিরুপায়ে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইতেন। তারাপ্রসন্ন বাবু নরেন্দ্রের কার্য্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পান না অথচ ত্রুটি দেখিবার জন্য নূতন নূতন কার্য্য করিতে আদেশ করেন। প্রথম প্রথম নরেন্দ্র যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে তারাপ্রসন্ন বাবু সস্নেহে বলিতেন "থাক, ও কাজ তুমি কেন করছ? ও কাজ ওরা করবে এখন" এখন তদপেক্ষা হীনতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন ও স্নেহের পরিবর্ত্তে নিতান্ত কঠোরকণ্ঠে আদেশ করিতেন। তারাপ্রসন্ন বাবু যদি অমরনাথের পূজনীয় আত্মীয় না হইতেন তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে স্বাধীনচেতা নরেন্দ্র তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেন। যে আত্মীয় তাঁহার কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন, পাছে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এই ভয়েও কর্ম্ম সহসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অমরনাথ সকলই বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নিরুপায় হইয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল। তারাপ্রসন্ন বাবু, অমরনাথ ও নরেন্দ্রনাথ তিন-জনের হৃদয়েই কেমন অন্ধকার করিয়া একটা মেঘ উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বুঝিলেন যে, বিলম্বে অথবা অবিলম্বে এই মেঘ হইতে অশনিপাত হইবেই হইবে, প্রত্যেকেই যেন এই দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অথচ প্রত্যেকে অতি সাবধানে আপনাকে এই অশনিপাতের লক্ষ্য হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন ভবিষ্যতে এই কলহবিবাদের উল্লেখ করিয়া কেহ যেন আমার নামে দোষ না দিতে পারে। অবশেষে তারাপ্রসন্ন বাবুর কোন আত্মীয়ের বিবাহে এই বর্ষণোন্মুখ মেঘ হইতে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হইল। হরকুমার বাবু তারাপ্রসন্ন বাবুর আত্মীয়। তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি তারাপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন যে "আপনার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীকে আমি নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহা-

দের নামের ও বাসস্থানের তালিকা দিয়া বাধিত করিবেন।” তারাপ্রসন্ন বাবু আপনার অধীনস্থ কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও উন্নত কর্ম্মচারীর নাম দিয়া বলিলেন অপর সকলকে আমার এই খানে বলিলেই হইবে। ভ্রমবশতঃই হউক অথবা ইচ্ছাবশতঃই হউক, তালিকার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের নাম ছিল না। নরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে আমার বাসায় গিয়া আমাকে স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা উচিৎ বলিয়া ইহাঁরা বিবেচনা করেন না। ভাল আমিও এ অপমানের প্রতিশোধ লইব! যাঁহাদের স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, তারাপ্রসন্ন বাবু স্বয়ং তাঁহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নরেন্দ্রকে কিছু বলিলেন না; নরেন্দ্রনাথ ইহাও লক্ষ্য করিলেন! পূর্ব্বে হয়ত নরেন্দ্র এ সকল তুচ্ছ বিষয় লক্ষ্য করিতেন না কিন্তু এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যবহারে ছল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকলে নিমন্ত্রণে গেলেন, নরেন্দ্র যাইলেন না। তারাপ্রসন্ন বাবু নরেন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া অমরনাথকে বলিলেন “দেখ দেখি নরেন্দ্রের ব্যবহার! সকলে আসিল আর বাবুর বুঝি আসা হ’ল না?” অমরনাথ ক্ষুণ্ণচিত্তে নীরব হইয়া রহিলেন।

পরদিন তারাপ্রসন্ন বাবুর পুত্র সারদাপ্রসন্ন নরেনকে বলিলেন “নরেন কাল নিমন্ত্রণে যাও নাই কেন?” নরেন্দ্রনাথ বলিলেন “আমার অসুখ করিয়াছিল।” “বাবা কাল তোমার অনুপস্থিতির জন্য তোমার উপর বড় রাগ করেছেন।” অন্য সময় তাঁহারা আগে সংবাদ লইতেন ‘কি অসুখ’ “কেন হল” “কেমন আছ” এখন কি না বলিলেন “বাবা বড় রাগ করে-ছেন!” নরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন “তোমার পিতা রাগ করিলে আমার বড় ক্ষতি নাই; তিনি আমার চাকরীর কর্ত্তা, আমার জাতের আমার সমাজের কর্ত্তা নন। তুমি জিজ্ঞাসা করিলে তাই বলিলাম অসুখ করিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম ইচ্ছা হয় নাই তাই যাই নাই, নিমন্ত্রণ হয় নাই তাই যাই নাই। অথবা তাঁহার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। তিনি শূদ্র—শূদ্রের ন্যায় থাকুন, তাঁহার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? তিনি যদি আমাকে পূর্ব্বের চক্ষে দেখিতেন তাহা হইলে আমি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতাম কিন্তু এখন তাঁহারও সেভাব আমারও সেভাব নাই।” নরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এত কথা না বলিতেও পারিতেন, আর সারদাপ্রসন্ন কিছু এত রূঢ় কথা বলেন নাই যে, যাহাতে নরেন্দ্র এত আত্মহারা হইলেন কিন্তু কেমন যে বিধা-তার খেলা, সময় সময় আমাদের বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা আত্মসংযম করিতে পারি না। বলা বাহুল্য সেইদিনই তারাপ্রসন্ন বাবু পুত্রের নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত ভাবে জ্ঞাত হইলেন ও ক্রোধে অপমানে অধীর হইয়া স্থির করিলেন পরদিন প্রাতে আফিসে গিয়া প্রথমেই নরেন্দ্রনাথের এই রূঢ় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া বেতন কমাইয়া দিবেন অথবা তেমন তেমন দেখেন ত কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিবেন।

পরদিন প্রাতে কর্ম্মস্থলে গিয়া দেখিলেন নরেন্দ্র তখনও আসেন নাই। (আজকাল

নরেন্দ্র সকলের অপেক্ষা অগ্রে আসিতেন) নরেন্দ্র আসিলেই নিকটে পাঠাইয়া দিবার জন্য দ্বারবানকে অনুমতি করিয়া স্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিয়া দৈনিক সংবাদপত্র, তারের সংবাদ ও পত্রাদি দেখিতে দেখিতে একখানা বাঙ্গালা পত্র পাইলেন। পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন :—

"আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সসম্মানে নিবেদন—

মহাশয় আমাকে স্বয়ং অনুরোধ করিয়া যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সাধ্যমত পালন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কোন অজ্ঞাত কারণে আপনি আমার উপর বিরক্ত হওয়াতে আমি নিজের ইচ্ছায় আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। যদি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন ত্রুটি দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। এক সময়ে মহাশয় আমাকে নিজের অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এ উপকার জন্মে বিস্মৃত হইব না। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।"

* * * * *

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। তারাপ্রসন্ন বাবুর বড় কঠিন পীড়া, জীবনের আশা নাই, বাটীর সকলেই শোকে মগ্ন। দেশ মধ্যে কেমন একটা ভয়মিশ্র আবেগ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে ৩।৪ জন ডাক্তার আসিয়াছেন। আজ তারাপ্রসন্ন বাবুর জীবনের বড় কঠিন সন্ধিস্থল। তারাপ্রসন্ন বাবু আজ অনন্তের সীমায় উপস্থিত, আজ যদি রক্ষা পান তাহা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন, তাঁহার এমন যে কঠিন রোগ, নরেন্দ্রনাথ একদিনের জন্যও উঁকি মারেন নাই! কি অকৃতজ্ঞ! এখন অপর এক আফিসে উচ্চ বেতনে কর্ম্ম হইয়াছে কি না? হউক একবার আসিতে হয়।

রোগীর গৃহে প্রায় ৪।৫ জন চিকিৎসক ও পুত্র, জামাতা, পত্নী প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। সকলে একদৃষ্টে রোগীরদিকে চাহিয়া আছেন। মৌনভঙ্গ করিয়া প্রধান ডাক্তার (সাহেব) বলিলেন "এখন একমাত্র এবং শেষ উপায় এই যে—অপর কোন সবল লোকের শরীর হইতে শোণিত লইয়া ইহার শরীরে প্রবিষ্ট করান। রোগীর দেহে নূতন শোণিত সঞ্চারিত করিয়া দিলে রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। কিন্তু কে শোণিত দিবেন? যিনি দিবেন তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে।" তারাপ্রসন্ন বাবুর পত্নী বলিলেন "আমি দিব, আমার প্রাণ যায় যাক্!" বাঙ্গালী স্ত্রীর পতিভক্তি দেখিয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন! স্বামীর জন্য অকাতরে মরিতে চায়! প্রকাশ্যে বলিলেন "আপনি স্ত্রীলোক তাহাতে প্রাচীনা, আপনার শোণিত লইলে কোন ফল হইবে না। আমি কোন সবল যুবকের শোণিত লইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কে শোণিত দিয়া এই মহাত্মার প্রাণরক্ষা করিবেন?"

অন্ধকার কোণ হইতে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত একব্যক্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সতেজ কণ্ঠে স্পষ্টস্বরে কহিল "আমি দিব।" আগন্তুকের বদনমণ্ডলের প্রায় সমস্ত ভাগই আবৃত, শীতকাল বলিয়া কেহ অকস্মাৎ এরূপ আবরণে সন্দিহান হয় নাই। ডাক্তার আগন্তুকের উলঙ্গ বাহু দেখিয়া বুঝিলেন লোকটা সবল বটে। গৃহস্থিত সকলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক ডাক্তারের নিকট হইতে একখানা অস্ত্র লইয়া স্বীয় বাহুমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল "আবশ্যক মত শোণিত লউন।" ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে একবার আগন্তুকের একবার রোগীর দিকে চাহিতে লাগিলেন, ক্ষণকালপরে ডাক্তার গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "আপনারা এই অজ্ঞাত মহানুভবের সেবা করুন, রোগীর আর ভয় নাই কিন্তু ইঁহাকে আগে দেখুন।"

"আজ আমার প্রতিশোধ লইলাম" এই বলিয়া আগন্তুক সেবার অপেক্ষা না করিয়াই মুখের বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক দুর্ব্বলদেহে স্খলিতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সকলে তাহার মুখ দেখিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল "নরেন্দ্রনাথ!"

বৃহস্পতি।

দূরত্ব, ভগণ ইত্যাদি। ক্ষুদ্রগ্রহগণ-অধ্যাসিত নভোমেখলা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে সৌরজগতের এবম্ভূত প্রদেশে প্রবেশ করা যাইতেছে যে, তাহার সহিত অভিপার্থিব গ্রহরাজ্যের অথবা ক্ষুদ্র গ্রহবলয়াবলি উপসেবিত অন্তরীক্ষের সাদৃশ্য নাই। সৌরজগতের এই ঊর্দ্ধাম্বরে গ্রহগণের ব্যবধানের আধিক্য এবং আকারের বৈপুল্য উভয়ই বিস্ময়কর।

মহামায়া প্রকৃতি যেন এই সুবিশাল রঙ্গশালার পরিষদ্‌বর্গের মনোমধ্যে বিস্ময়রসের আবির্ভাব করাইবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্রগ্রহকুলের উর্দ্ধতমা ফ্রেইরার অভিনয়ান্তে এই মহামহিম সুশোভন গ্রহবরের প্রবেশ আদেশ করিলেন। বৃহস্পতি কেবল সুরগুরু নহেন, ইনি আকারে মহিমায় ভারে, বিভবে, সর্ব্বতোভাবে গুরু।

এই সুদূর অন্তরীক্ষে প্রথমতঃ গ্রহরাজ (রবি ভিন্ন) বৃহস্পতিকে পর্য্যবেক্ষণ করুন। ইনি রবিপরিত ১১ বৎসর ৩১৪.৯ দিনে পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্য হইতে ইঁহার মধ্যম অন্তর ৪৮,২৭,১৬,০০০ মাইল কিন্তু কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব .০৪৮ প্রযুক্ত যখন অপহেঁলিকে থাকেন, তখন দুরত্ব ৫০,৫৮,৮৬,০০০ মাইল, আর যখন অনুহেঁলিকে থাকেন, তখন দূরত্ব ৪৫,৯৫,৪৫,০০০ মাইল হয়।

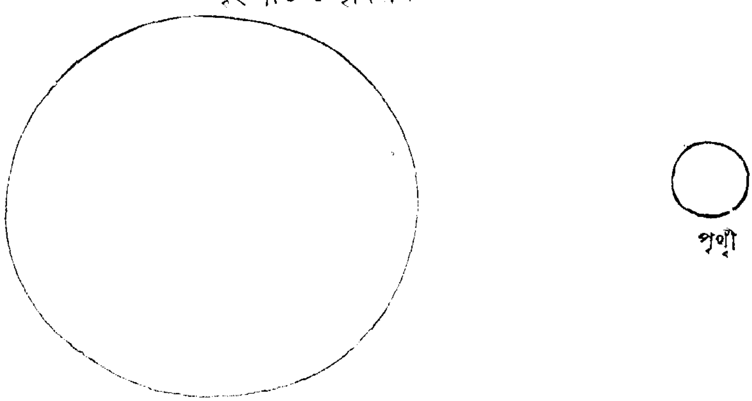
সেপ্টেম্বর ও অক্টোম্বর মাসে পৃথিবী যখন বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যে আসেন, তখন সুরাচার্য্য আমাদিগের খুব নিকটবর্ত্তী হন। এবং সূর্য্যকে যখন পৃথিবী ও গুরুর মধ্যগত দেখায় তখন তিনি পৃথিবী হইতে অত্যন্ত বিপ্রকৃষ্ট হন; সুতরাং পৃথিবী হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব কখন কখন ৩৬,৬৪,৮১,০০০ এবং কখন বা ৪১,২৮,৭১,০০০ মাইল হয়। পৃথিবী যে দিবস রবির একদিকে এবং বৃহস্পতির বিপরীত দিকে থাকেন এবং তিন জ্যোতিষ্ক এক রেখাস্থ হন, সেই দিবস হইতে ৩৯৯ দিন পরে জ্যোতিষ্কত্রয়ের পুনঃ সদৃশভাবে সমাগম হয়। এই ৩৯৯ দিনের মধ্যে স্থূলতঃ বৃহস্পতি ২৭৯ দিন মার্গী এবং ১২১ দিন বক্রী থাকেন। এই শোভনতম গ্রহবর বর্ষে বর্ষে একমাস ছয়দিন বিলম্বে সূর্য্য হইতে ষডভান্তরিত হন। এই সময় তিনি কান্তিমতী তারার ন্যায় অর্দ্ধ রাত্রে ধীরে ধীরে যাম্যোত্তর রেখা অতিক্রমণ করেন, সুতরাং তখন তাঁহাকে অনায়াসে চিনা যায়। ইনি রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন এবং প্রতি দ্বাদশবর্ষে সেই নক্ষত্রে উপনীত হন। প্রতি বর্ষে তিন মাস পর্য্যন্ত ইঁহাকে সুখে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় অর্থাৎ যে মাসে উর্দ্ধসমাগম হয় এবং পরবর্ত্তী দুই মাসে।

বৃহস্পতি মণ্ডলের ব্যাস। এই মণ্ডলের নিরক্ষবৃত্তীয় ব্যাস অপেক্ষা আক্ষ্যব্যাস $\frac{1}{১৭}$ পরিমাণে ছোট। দীর্ঘব্যাস ৮৬,৫২০ মাইল, হ্রস্বব্যাস ৮১১৪৩০ মাইল। সুতরাং তন্মণ্ডলের ব্যাস ভূব্যাস অপেক্ষা ১১ গুণে অধিক; এবং ইহার ঘনফল পৃথিবীর ঘনফল অপেক্ষা ১,২৪৮ গুণ অধিক। অপর গ্রহ সকলের ঘনফলের সমষ্টি অপেক্ষা গুরুর ঘনমান অধিক।

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে।

বৃহস্পতির ভগণকাল	৪৩৩২ দি-১৯দ-১৪প-২০-৯ বি,	
মন্দপরিধির ব্যাস যুগ্মপাদে ...	... ৩১৫·১৫	কলা,
,, অযুগ্মপাদে ...	... ৩০৫·৬০	কলা,
ভূসাপেক্ষিক দূরত্ব যুগ্মপাদে ...	... ৫·১৪২৯	,,
,, অযুগ্মপাদে ...	... ৫·২০২৮	,,
মন্দফল বা কেন্দ্র সংস্কারের পরমপরিমাণ	৫°৫′৫৮″	,,
উপর্য্যুপরি দুই সমাগমের ব্যবধান কাল	৩৯৮দি ২১ঘ ২০ মি	
চাপাত্মক ব্যাস	... ৩′ ৩০″	
কক্ষা পরিমাণ	... ৫,১০,৭৫,৭৬৪ যোজন	
কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব	... ০·০৪৫	
বিক্ষেপ	... ১°	

বৃহস্পতি ও পৃথিবী।



বৃহস্পতি

পৃথিবীর সহিত বৃহস্পতির তুলনা।

চন্দ্রকলার ন্যায় বার্হস্পত্য মণ্ডলের শুক্লাংশের হ্রাসবৃদ্ধি। বুঝা যায় না বিম্বের কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয় বটে কিন্তু তাহা ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষয় যে হয় তাহার সন্দেহ নাই, কারণ বৃহস্পতির চন্দ্রের গ্রহণকালে যখন মণ্ডলের ক্ষয়িত অংশে স্পর্শ হয় তখন বৃহস্পতির উজ্জলাঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তদীয় চন্দ্র অদৃশ্য হইয়া পড়ে! তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, মণ্ডলের কিঞ্চিৎ অপচিতি ঘটে। পৃথিবী যখন বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যে আসেন তখন শুক্র ভিন্ন নভশ্চরদিগের মধ্যে এমন সুন্দর ও উজ্জল কোন গ্রহই দেখায় না।

বৃহস্পতির মধ্যাকর্ষণ। জ্যোতির্ব্বিদেরা বার্হস্পত্য মণ্ডলের সামগ্রীর যে পরিমাণ

অবধারিত করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যে কোন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গণিত কর, সামগ্রীর সেই এক পরিমাণ অর্থাৎ সৌর-সামগ্রীর $\frac{1}{1043}$ উপলব্ধি হয়। বৃহস্পতির উপগ্রহের গতিদ্বারা হউক বা ক্ষুদ্র গ্রহগণের প্রতি তদীয় আকর্ষণের দ্বারা হউক পরিমাণ এতই ঠিক হয় যেন বৃহস্পতিকে তুলাযন্ত্রে ওজন করা হইয়াছে। পৃথ্বী অপেক্ষা বৃহস্পতি ৩০৯ গুণ ভারি। পৃথিবীর সান্দ্রত্ব যদি এক মনে কর, এবং বার্হস্পত্য মণ্ডলের কেন্দ্রপ্রদেশের সপাটত্ব যদি হিসাবের ভিতরে ধর তবে তন্মণ্ডলের সান্দ্রত্ব ·২৪২ হইবে। সাবিত্র মণ্ডলের সান্দ্রত্ব ·২৪২ ; এই একতার কি কোন ভৌতিক কারণ আছে? না ইহা আকস্মিক? বৃহস্পতি মণ্ডল যদি জলময় হইত, তবে উহার ওজন এখন যত আছে, তাহা অপেক্ষা আর ১ এর ৩ অধিক হইত। বৃহস্পতি যদি পৃথিবী অপেক্ষা বড় না হইতেন অথচ ওজনে ৩০৯ গুণ অধিক হইতেন, তবে তদীয় পৃষ্ঠে মধ্যাকর্ষণের বল পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা ৩০৯ গুণ অধিক হইত। কিন্তু বার্হস্পত্য বিম্বের ব্যাস ভূব্যাস অপেক্ষা ১১ গুণ বেশী, সুতরাং তদীয় পৃষ্ঠে আকর্ষণ অবশ্য উক্ত সংখ্যার বর্গের বিলোম অনুপাতে অল্পীভূত হইবে অর্থাৎ ১২১:১ হইবে ; অথবা সূক্ষ্ম গণিত অনুসারে ১১·০৬ × ১১·০৬ = ১২২ ভাগের একভাগ হইবে। এখন ৩০৯কে ১২২ দিয়া ভাগ দিলে ২½ হয় ; তবেই বুঝা গেল যে, বৃহস্পতির মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা আড়াই গুণ অধিক। যে মানুষের ওজন এখানে ২ মোণ, তিনি সেখানে গেলে ৫ মোণ ভারি হইবেন। উত্তুঙ্গ স্তম্ভের চূড়া হইতে লোষ্ট্র পতিত হইলে পতনকালের প্রথম সেকণ্ডে উহা ৩৯·৩৬ ফুট পড়িবে। অতএব ভূমণ্ডলের উপকরণীভূত পদার্থ, এবং অত্রত্য জীবদেহ, বৃহস্পতির অঙ্গীভূত পদার্থ এবং তত্রত্য জীবদেহ অপেক্ষা লঘুতর ও অসংহত ; কিন্তু গ্রহের আকর্ষণের আধিক্য প্রযুক্ত সে সমস্ত বস্তুতঃ গুরুতর, শীঘ্রতর নিপতিত হয় এবং ওজনেও বেশী হয়। পরন্তু বিশ্ব-সংসারে পরমার্থতঃ কিছুই লঘু কিছুই গুরু নহে ; সমস্ত ভূতধর্ম্ম সাপেক্ষিক। এই গোলা এখানে রহিয়াছে বলিয়া এত ভারি—কোন ক্ষুদ্রগ্রহে লইয়া যাও, পালকের মত হাল্‌কা হইবে ; আবার সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গেলে এত ভারি হইবে যে, উহা আর নাড়াচাড়া ভার হইয়া পড়িবে।

বৃহস্পতিলোকে ঋতু। যে ক্ষেত্রে পৃথিবী রবিপরিতঃ ভ্রমণ করেন, প্রায় সেই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রে বৃহস্পতির পর্য্যটন হয় ; কারণ তাঁহার কক্ষাক্ষেত্র ভূকক্ষা ক্ষেত্রে ১°১৮′৪১″ পরিমাণ মাত্রে অবনত। এই কক্ষার অনুহৈলিক বিন্দু এক্ষণে ক্রান্তিপাত হইতে ১৩° অন্তরে অর্থাৎ মীনান্তে রেবতীর অনতি দূরে। ১৮৮০, ২৫ সেপ্টেম্বরে এবং ১৮৯২, ৫ অগষ্টে বৃহস্পতি ঐস্থানে ছিলেন। তদীয় অপহৈলিকে আগমন অবশ্য আকাশের প্রতীপ ভাগে ১৮৮৬, ২২ এপ্রেলে এবং ১৮৯৮, ৩ মার্চ্চ তারিখে ঘটিয়াছিল এবং ঘটিবে। বৃহস্পতির মন্দোচ্চের বর্ষে বর্ষে ৫৭″ পরিমাণে পূর্ব্বাগতি হয়। সিদ্ধান্ত মতে মন্দোচ্চের বার্ষিকী গতি ·২৭″, গতি নাই বলিলেই হয়।

সূর্য্য হইতে বার্হস্পত্য মণ্ডলের দূরত্ব প্রযুক্ত এখান অপেক্ষা সেখানে আলোক ও তাপের

পরিমাণ ২৭ অংশে কম, সুতরাং ভূমণ্ডল রচনার প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রণালী অনুসারে এই প্রকাণ্ড মণ্ডল বিনির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বৃহস্পতি রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় অক্ষে প্রায় খাড়া হইয়া আবর্ত্তিত হন, কারণ আবর্ত্তন—অক্ষের অবনতি ৩° মাত্র, অতি অল্প। অতএব এলোকে ঋতুভেদ অসম্ভব। সেখানে যাবৎ বৎসর দিনমান সমান থাকে; রবি প্রায় নিরক্ষবৃত্তীয় ক্ষেত্রে গমন করেন। তথা শীত, উষ্ণ, বা সম-কোটিবন্ধ নাই; সর্ব্বত্র চিরবসন্ত। নিরক্ষ প্রদেশ হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ তাপের পরিমাণ কম।

অস্মৎ সম্বন্ধে এই বিশাল গ্রহমণ্ডলে নানারূপ বিষমতা দৃষ্ট হয়। ইহার বার্ষিক গতি অতি মন্দ কিন্তু আহ্নিক গতি এত দ্রুত যে, এক এক আবর্ত্তন দশ ঘণ্টার কমে হয় সুতরাং রাত ও দিন দুইই ৫ ঘণ্টার কম।

বৃহস্পতির উপগ্রহ। ইটালির অন্তর্গত পাডুয়া নগরে সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ গালিলিও কর্ত্তৃক ১৮১০, ৮ জানুয়ারি তারিখে বৃহস্পতির তিন উপগ্রহ এবং ১৩ তারিখে চতুর্থ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৯২, সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক বারনার্ড পঞ্চম উপগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন। ইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহস্পতির নিকটস্থ এবং তন্মণ্ডলের মধ্য হইতে ১,১২,৫০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া ১১ ঘ ৫৭ মি ২২½ সেকণ্ডে পরিভ্রমণ করে। প্রথমোক্ত চন্দ্র চতুষ্টয় বৃত্তাকার কক্ষে ভ্রমণ করে। বার্হস্পত্য জগৎ অতিপার্থিব জগতের যদ্রূপ হস্তমিত অনুরূপ, তদ্রূপ বিশাল গ্রহ চতুষ্টয় বিনির্ম্মিত অতিপার্থিব জগতের অক্লিষ্ঠা অনুকৃতি। এই উপগ্রহ চারিটি—চারিটি কেন, এখন পাঁচটি কেপ্‌লারীয় নিয়মের বশবর্ত্তী।

গালিলিওর আবিষ্কার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের ব্যবহার। গালিলিওর আবিষ্কারে বিজ্ঞান অনুরাগী ও অনুশীলকদিগের মধ্যে মহা কুতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রবিশারদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতীব অভ্যসূয়া-পরতন্ত্র হইয়া যাহাতে বিজ্ঞান পরিচিত-সীমা অতিক্রম না করে, সেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্রচেতাদিগের বিরক্তির অন্যতর কারণও ছিল। তাঁহাদিগের সংকীর্ণ মনোমধ্যে এই অসীম বিশ্বের যে সীমাবিশিষ্ট ভাব অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত গালিলিও দ্বারা আবিষ্কৃত সৌরজগতের সামঞ্জস্য হয় না। প্রাচীন গণিতজ্ঞ ক্লাবিয়স ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন 'এই উপগ্রহ চতুষ্টয় গালিলিওর দূরবীক্ষণের সুত চতুষ্টয়।' কিন্তু এই সাধু যখন স্বচক্ষে চারি চন্দ্র দেখিলেন তখন তিনি নিজের ভ্রমস্বীকার পূর্ব্বক জাত-প্রত্যয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপ কুৎসাবাদ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থে ক্ষীণশ্রদ্ধ কতিপয় লোকে দর্শন করা দূরে থাকুক দূরবীক্ষণে হাতে করিতে আশঙ্কা করিলেন, পাছে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কলুষীকৃত হইয়া যান। ইহাঁদিগের মধ্যে জনৈকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নর্ম্মচ্ছলে গালিলিও বলিয়াছিলেন 'ভরসা করি এই সন্দিগ্ধচেতা যেন স্বর্গারোহণ করিতে করিতে পথিমধ্যে বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।' ১৮২৩ অব্দে মুদ্রিত নিউটনের সুপ্রসিদ্ধ প্রিণসিপিয়া গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, 'মহাকর্ষণ ব্যাখ্যাস্থলে পৃথিবীর গতি স্বীকার করি, কিন্তু

আমরা পোপের আজ্ঞাধীন, পৃথিবীর গতিবাদের বিরুদ্ধে পোপ যে সকল হুকুম জারি করিয়াছেন তাহার বিপরীতাচরণ আমাদের মতবিরুদ্ধ'। বোধহয় বার্হস্পত্য চন্দ্রের অস্তিত্ব প্রচারের বিপক্ষে বাবাজী কোন আজ্ঞা ঘোষণা করিয়া থাকিবেন।

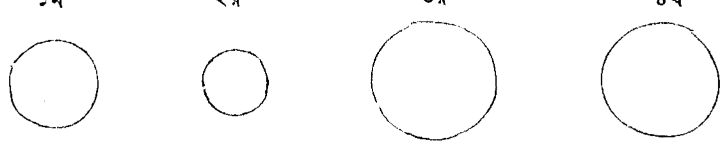
ভারতবর্ষে অদ্যাপি কোন নবাবিষ্কৃত বিষয় দেখিলে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। প্রাচীন সিদ্ধান্তমতে গণিতগ্রহ দৃক্‌সিদ্ধ হয় না তাহা আমাদের মধ্যে অনেকে জানেন, কিন্তু পাছে ঋষিবাক্যে অবিশ্বাস জন্মে এই আশঙ্কা প্রযুক্ত তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না।

১৮৫২ অব্দে ধর্ম্মপ্রচারক ষ্টডার্ড পারস্য দেশের অন্তর্গত ওরুমিয়া নগরে প্রত্যূষে যাবৎ না বৃহস্পতি অরুণাভিভূত হইয়াছিলেন, তাবৎ তদীয় দুইটি উপগ্রহ পুনঃ পুনঃ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত রুস-পর্য্যাটক বেঞ্জেল লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি সাইবিরিয়া দেশে ছিলেন তখন একজন ব্যাধের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, 'আমি এখনই দেখিলাম ঐ বড় তারাটী একটী ছোট তারা গিলিল এবং অচিরে সেটিকে বমন করিল ; অর্থাৎ সে বৃহস্পতির তৃতীয় চন্দ্রের নিমীলন ও উন্মীলন দেখিয়াছিল। বস্তুতঃ তাতারদিগের দৃক্‌শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

চন্দ্র চতুষ্টয়ের সবিশেষ বিবরণ। এ চারিটি নামবিশেষ দ্বারা আহূত হয় না। ইহারা মূলগ্রহ হইতে ইহাদের অন্তর অনুসারে ক্রমসংখ্যা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ) দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি মণ্ডলের মধ্য হইতে উপগ্রহগণের অন্তর যথাক্রমে ২,৬১,৫৫০ ; ৪,১৬,৪৬০ ; ৬,৬৪৯৪০ ; এবং ১২,৩১২০০ মাইল। ইহাদের ব্যাসের পরিমাণ অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই ; স্থূলতঃ ১মের ব্যাস ২,৫০০ ২য়ের ২,২০০, ৩য়ের ৩,৭০০, ৪এর ৩,১০০ ধরিলে ২০০, ৩০০ মাইলের অধিক ভুল হইবে না।

চন্দ্র চতুষ্টয়ের পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে নিম্নরূপ দেখাইবে।

১ম　　২য়　　৩য়　　৪র্থ



ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি আমাদের চাঁদের মত বড়। সুতরাং এতদ্দ্বারা আমাদের চাঁদের সহিত বৃহস্পতির চারিই চাঁদের তুলনা হইল। বৃহস্পতির নিরক্ষবৃত্তের ক্ষেত্রে ১ম উপগ্রহের কক্ষাক্ষেত্র ৬" পরিমাণে অবনত, ২য়ের ১'৫," ৩য়ের ৫'২" এবং ৪র্থের ২৪'৪" অতএব বৃহস্পতির কক্ষাক্ষেত্রে উহাদের কক্ষার অবনতি যথাক্রমে ৩°৫', ৩°৪', ৩° এবং ২° ৪১'।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, পার্থিব চন্দ্রের ন্যায় বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয়ের অক্ষাবর্ত্তন কাল উহাদের ভগণ কালের সমান, কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

বৃহস্পতির অক্ষাবর্ত্তন। পৃথিবী যেমন স্বীয় অক্ষপরিতঃ ২৪ ঘ, ৫৬ মি, ৪.০৯ সে,

সময়ে একবার আবর্ত্তিত হন তেমনই বৃহস্পতি ৯ ঘ, ৫৫ মি, ২০ সে, একবার স্বীয় অক্ষে ঘুরেন; অর্থাৎ বৃহস্পতি-লোকে এই ৯ ঘ, ৫৫ মি, ২০ সে, নাক্ষত্র দিনের পরিমাণ। বৃহস্পতিমণ্ডলের চিরস্থায়ী চিহ্নের আবর্ত্তনকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বার্হস্পত্য দিনমান নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মণ্ডলের পদার্থকণা প্রতি মিনিটে ৪৬৬ মাইলের অধিক বেগে ঘুরিতে থাকে; তবেই উহা পৃথিবীর নিরক্ষদেশীয় কণা অপেক্ষা সাতাইস গুণ বেগে ধাবিত হয়। এই বেগই বার্হস্পত্য মণ্ডলের অসাধারণ গোলাভাসত্বের কারণ। এই দ্রুত-বেগবশতঃ কেন্দ্রবিমুখ বলের আধিক্য জন্মে সুতরাং নিরক্ষপ্রদেশ উদারাকারে প্রলম্বিত হয় কারণ মণ্ডল অদ্যাপি সুঘনম্য অবস্থায় আছে বলিয়া বোধ হয়।

বার্হস্পত্য দিনমান পার্থিব দিনমানের অর্দ্ধেরও ন্যূন। বৃহস্পতির ভগণকাল ৪৩৩২ পার্থিব দিন সুতরাং তদীয় বর্ষ বার্হস্পত্য মানে ১০৪৮৫ দিন হয়।

বৃহস্পতি-মণ্ডলে মেখলা। দূরবীক্ষণ সহকারে মঙ্গল-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিলে তথা মহাদ্বীপ ও সাগর সদৃশ বৃহদাকার জলের ও স্থলের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তথা মেঘ কুহেলিকা ও তুষারের উপচিতি ও অপচিতি নিবন্ধন মণ্ডল কখন একপ্রকার কখন অন্য প্রকার দেখায়। কিন্তু বার্হস্পত্য মণ্ডলের লক্ষণ সকল অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রধান লক্ষণ নিরক্ষবৃত্তের সমান্তর কতিপয় মেখলা; এগুলি বিস্তৃত নানা আভাবিশিষ্ট শ্যামল বা শ্বেতশ্যামল ডোরা। বৃহস্পতিমণ্ডলের গোলাভাসত্ব উহার আক্ষ্য আবর্ত্তনের একটি প্রমাণ; উক্ত মেখলাবলির পরিবর্ত্তন আক্ষাবর্ত্তনের স্বতন্ত্র প্রমাণ। নিরক্ষদেশস্থ বিস্তীর্ণ মেখলাটী কুটিলাকার, ঈষৎ পীতাভ কখন কখন কৌসুম্ভ বা সুবর্ণগৌরিক দেখায়; মণ্ডলের অন্যান্য মেখলা অপেক্ষা এই মেখলার বর্ণ গাঢ়তর। এই মেখলা এবং কখন কখন অপর মেখলাও অণ্ডমালাবৎ দেখায়। এক একটি অণ্ডাকারের ব্যাস পাঁচ হইতে দশ হাজার মাইল, এবং দেখিতে সচ্ছায় মেঘবৎ।

আবার কতকগুলি ডোরা হেঁকাতেও আছে। হেঁকাতে ডোরাগুলি বোধ হয় বৃহস্পতি-মণ্ডলে মেঘাবরণে রন্ধ্র। এইগুলির আকার বোধ হয় যেন ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবী হইতে গুরুর দূরত্বের হিসাব ধরিলে প্রতীতি হইবে যে, তত্রত্য বায়ুমণ্ডলে প্রবল বাত্যাবেগে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল করিয়া মেঘ চলিতেছে।

কখন বা মণ্ডলের দক্ষিণে অনেক সমান্তর মেখলা দৃষ্ট হয়। মেখলা সকলের বিন্যাসে বিবিধ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। ছোট ছোট সমভাবাপন্ন মেখলার মধ্যে একটি বড় মেখলা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার অংশবিশেষ সঙ্কীর্ণ এবং ইহার মধ্যে মধ্যে মেঘরাশি অব-লোকিত হয়। কখন কখন অনেক শ্যাম চিহ্নও লক্ষিত হয়। বোধ হয় এগুলিও মেঘ-মেখলার রন্ধ্র।

বার্হস্পত্যমণ্ডলে যে চিহ্নটি বৃহল্লোহিত লাঞ্ছন নামে অভিহিত, সেটি অতীব অপূর্ব্ব। এই চিহ্নটি প্রথমতঃ বাদামে-বালার মত দেখায়; পরে ক্রমে ক্রমে অণ্ডাকার চিহ্নে পরিণত হয়,

এবং অন্তর্ভূত শুক্লাংশ সমভাবাপন্ন সমুজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। বলয়াকার হইতে অণ্ডাকারে পরিণত হওয়া পর্যন্ত ন্যূনাধিক সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই কাল মধ্যে উক্তচিহ্ন নানারূপ ধারণ করে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্পের লক্ষণ এবং মধ্যে মধ্যে নৈসর্গিক আলোকের লক্ষণ (বিশেষতঃ মধ্যমেখলায়) দৃষ্ট হয়। এই আলোক বোধ হয় মণ্ডলের ভিতর হইতে আইসে। বৃহস্পতির বায়ুকোষের বহির্ভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং তত্রত্য মেঘরাশি পার্থিব মেঘরাশির সদৃশ আলোক প্রতিভাত করে।

মেখলার উৎপত্তি। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের বিক্ষোভ প্রযুক্ত তদীয় মণ্ডলে উক্তরূপ মেখলা ও চিহ্ন সকলের উৎপত্তি হয়। বৃহস্পতির অক্ষাবর্ত্তনকাল ৯ঘ, ৫৫½ মিনিট; তাহা হইলেই আবর্ত্তনের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৭·৭ মাইল। সৌরজগতে এরূপ দ্রুতগতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

বৃহস্পতিলোকে আমাদের মত জীবের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা যায় এবং তত্রত্য বায়ুমণ্ডলের তাপাতিশয্য যদি মান, তবে বায়ুকোষের বিক্ষোভ সম্বন্ধে কোন বাধা দেখা যায় না। বৃহস্পতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলেও সূর্য্যের সমান তপ্ত নহে। সূর্য্যের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সমস্ত মণ্ডল সূক্ষ্ম। সূর্য্যাতপ আমাদের উপলব্ধি হয় এবং তদীয় দীপ্তিকোষ-বিনির্গত অতীব প্রখর আলোক আমাদের প্রত্যক্ষ; কিন্তু বৃহস্পতি হইতে তাপ বিনির্গত হয় না এবং তদীয় আলোক উগ্র নহে। অতএব এ মণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ হইলেও সূর্য্যের ন্যায় চণ্ডরশ্মি নহে অথচ তাঁহার উষ্ণতা এত অধিক যে, তদীয় স্বাভাবিক আলোকের কিয়দংশ নিষ্প্রভ মেঘাক্রান্ত বায়ুমণ্ডল দিয়া বহির্গত হয়।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে যে সকল উপপ্লব ঘটে, তাহাতে সূর্য্যের কর্তৃত্ব যদি থাকে তবে তাহা অত্যল্প, কিম্বা তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য নহে। এক পক্ষে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বার্হস্পত্যমণ্ডলে ঋতু-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে রবির প্রভাব মন্দ ও অতি অল্প; পক্ষান্তরে লক্ষিত হইতেছে যে বৃহস্পতির বায়ুকোষে রবির এরূপ আধিপত্য নাই যে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অপরিবর্ত্তিতভাবে রাখিতে পারেন। যদি বৃহস্পতির অখিল মণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং সেই উত্তাপ তদীয় মধ্যাকর্ষণের ভয়ানক ফলের বিপরীত আচরণে সমর্থ হয় তবে মণ্ডলমধ্যে যে কোনরূপ বিস্ময়জনক উপদ্রব ঘটুক না কেন, তাহা দুরবগাহ নহে। এরূপ অবস্থায় নিম্নস্তরে বিশাল বাষ্পরাশি উৎপাদিত হইয়া ঊর্দ্ধপ্রদেশে ঘনীভূত হইতে থাকিবে। কোন কোন সময়ে বৃহস্পতি-মণ্ডলের মধ্য মেখলা কখন বা অপর মেখলা মেঘের অস্তিত্বব্যঞ্জক শুক্লবর্ণ ধারণ করে। কখন বা মেখলায় বর্ণ বিশেষ দেখিয়া বুঝা যায় যে, অধঃস্থিত দেদীপ্যমান পদার্থরাশির কিয়দংশ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে,—কখন বা মেখলাবলি সরল ও সমভাবাপন্ন,—কখন বা তদ্দ্বারা বিক্ষোভ-বিমর্দ্দিত লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল ব্যাপারের তথ্য নির্দ্দেশ করা সুসাধ্য নহে। যেমন সৌরলাঞ্ছনের কালভেদে

অবস্থান্তরের বিশিষ্ট কারণ পাওয়া কঠিন, তেমনই বার্হস্পত্য মেখলার পরিবর্ত্তনের প্রকৃত হেতু সুলভ নহে। কিন্তু তা বলিয়া সৌরলাঞ্ছন দর্শন করিয়া তদীয় প্রজ্জলিত দীপ্তিকোষের অবস্থা সম্বন্ধে মত-প্রকাশের বাধা দেখা যায় না।

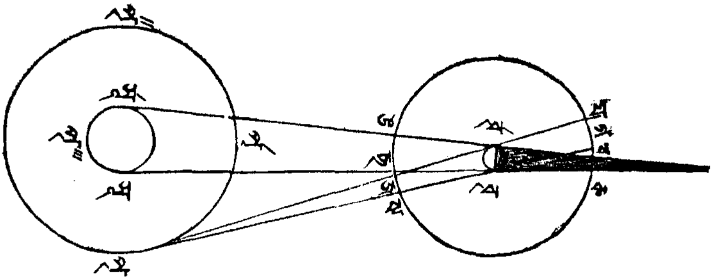
বার্হস্পত্যমণ্ডলের মধ্য মেখলায় যে আলোহিত প্রভা দৃষ্ট হয়, তাহা সুগভীর অভ্রাক্রান্ত বায়ুমণ্ডলের অধঃস্থিত প্রদীপ্ত পদার্থনিচয়ের স্বাভাবিক আলোকসম্ভূত, অথবা সে আলোক স্বভাবতঃ শুক্ল আলোহিত বাষ্পরাশি মধ্যে পতিত হইয়া রক্তাভ ধারণ করে। যে পক্ষ গ্রহণ কর ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বার্হস্পত্য আলোকের অধিকাংশ প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ। বৃহস্পতিমণ্ডল দেখিতে যেন প্রকাণ্ড সান্দ্রীভূত সমুজ্জ্বল মেঘপিণ্ড, সুতরাং তদীয় আলোক তুষার-সন্নিভ। আমাদের চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ পদার্থনিচয়ে বিনির্ম্মিত, বৃহস্পতিমণ্ডল যদি সেইরূপ পদার্থসমূহে বিরচিত হইত তবে তাহার তিনগুণ আলোক পৃথিবীর দিকে প্রতিভাত হইত; কিন্তু মণ্ডলটি কেবল নির্ম্মল তুষারনির্ম্মিত হইলেও যত আলোক পাইবার সম্ভাবনা, তত আলোকও পাওয়া যায় না। বৃহস্পতিমণ্ডলের অধিকাংশ শুভ্র নহে। বার্হস্পত্য আলোকের কিয়দংশ তাহার স্বকীয় আলোক।

বৃহস্পতিমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত, তজ্জন্য তথা হইতে প্রভূত আলোক আসিবে এমত কোন কারণ নাই। বৃহস্পতিমণ্ডল প্রদীপ্ত শুক্লাগ্নিবৎ হইলেও সম্পূর্ণ মেঘাবৃত থাকিতে পারে এবং আমরা একটু আলোক না পাইতেও পারি অথবা তদীয় মণ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত লোহ-লোহিত হইলে প্রচুর তাপ প্রদান করিতে পারে কিন্তু আলোকের ভাগ যৎসামান্য হইতে পারে।

বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল যে অত্যন্ত উত্তপ্ত তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ দেখান যাইতেছে। বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়কে সাধারণ দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে সে চারিটি আলোক বিন্দুবৎ দেখায়, কিন্তু সে বিন্দুগুলির ব্যাস ২০০০ মাইলেরও অধিক তদীয় মেঘমেখলার লক্ষণ দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তাহার গভীরতা ২০০০ মাইলের কম হইবে না; না হয় ধর যে উক্ত ব্যাসের বিংশতি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১০০ মাইলের কম হইবে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্ববর্ণিত মেঘরাশি সকল সুগভীর বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হইতে থাকে।

বৃহস্পতি বিম্বের দৃশ্য, দৃশ্যের পরিবর্ত্তন, উহার পিণ্ড ও সামগ্রী সূচিত ভৌতিক অবস্থা, ইহার উপগ্রহের গতির গণিতাগত ফল, উপগ্রহগণের সমাগম ও ভেদযোগের পূর্ব্বে বৃহস্পতি মণ্ডলে প্রবেশ করিবার সময় অনন্যসদৃশ চেষ্টিত, তাহাদিগের ছায়ার ভঙ্গি, এবং ছায়ায় প্রবেশের পর মধ্যে মধ্যে দর্শন, এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে সূর্য্য মণ্ডলের মত বাস্তব বৃহস্পতিমণ্ডল পরিদৃশ্যমান ও পরিমিয়মান বৃহস্পতিমণ্ডলের বহুদূর অভ্যন্তরে আছে। ভূলোক অপেক্ষা জীবলোকের গ্রহজীবনের তরুণাবস্থা; এবং ইহাকে অত্যন্ত তাপ বিশিষ্ট দেখিয়া সূর্য্যসদৃশ জ্ঞান হয়।

বার্হস্পত্য উপগ্রহ চতুষ্টয়ের গ্রহণ।



বার্হস্পত্য উপগ্রহগণ তদীয় ছায়ায় পতিত হইয়া অদৃষ্ট হয়। পরিলেখে বৃবৃ´ বৃহস্পতি; কখ বৃ´বৃ বৃহস্পতির ছায়া; সূসূ´ সূর্য্য; পৃপৃ´ পৃথিবী, বৃহস্পতি হইতে পাদান্তরে অর্থাৎ ৯০° অন্তরে স্থিত। মনে কর ক খ ঙ ঝ অন্যতম উপগ্রহের কক্ষা এবং ধর, এই কক্ষার ক্ষেত্র ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রের সহিত একীভূত। পৃবৃ ও পৃবৃ´ রেখা দুইটী উপগ্রহের কক্ষাকে জ ঝ গ ঘ বিন্দুতে কাটুক; ক খ ছায়ার প্রান্তদ্বয়। ভূচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য নিরূপনের বিধি অনুসারে গণিত করিলে বৃহস্পতির ছায়া ৫ কোটি ২০ লক্ষ মাইলের অধিক লম্বা হইবে। উপগ্রহের মধ্যে অত্যন্ত দূরবর্ত্তিটিরও অন্তর যখন ১০ লক্ষ মাইলের কিঞ্চিদধিক তখন প্রতি ভ্রমেই তাহাদের সকলকেই ছায়ায় পতিত হইতে হয়, কেবল ৪র্থ উপগ্রহের কক্ষার অবনতিপ্রযুক্ত কখন কখন ছায়া এড়াইয়া যায়।

গ্রহণ, ভেদযোগ সমাগম ইত্যাদি। বৃহস্পতি পরিতঃ উপগ্রহের ভ্রমণকালে চতুর্বিধ ব্যাপার লক্ষিত হয়।

১মতঃ উপগ্রহ মূলগ্রহের ছায়ায় পতিত হইলে উপগ্রহের গ্রহণ হইল বলা যায়। কএতে ছায়ায় উপগ্রহের প্রবেশকে তাহার নিমীলন বলে। আর খএতে ছায়া হইতে বহির্গত হওয়াকে উন্মীলন কহে।

২য়তঃ উপগ্রহগণ যখন সূবৃ সূ´বৃ´ রেখার মধ্যগত চ ছ স্থানে থাকে তখন তাহাদের ছায়া কাল তিলকের ন্যায় গ্রহবিম্বে পতিত হয়, যেমন সূর্য্য গ্রহণকালে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পতিত হয়; এই ব্যাপারকে ছায়া সংক্রম বলে।

৩য়তঃ উপগ্রহ যখন গ্রহের পশ্চাৎভাগে পৃবৃ গ ও পৃ´বৃ´ ঘ এর মধ্যে থাকে তখন গ্রহদ্বারা উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয়। উপগ্রহ গ্রহের এক দিকে অস্তমিত এবং অপরদিকে উদিত হয়, এরূপ ঘটনাকে আচ্ছাদন বলে।

৪র্থতঃ উপগ্রহ যখন বৃহস্পতি ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পৃবৃ রেখা হইতে পৃবৃ´ রেখায় যায় তখন উহার বিম্ব শুক্লবিম্ব দিয়া যায় অর্থাৎ বোধ হয় যেন উপগ্রহটি বার্হস্পত্য মণ্ডল দিয়া চলিতেছে। গ্রহবিম্ব যদি শুক্ল মেখলা দিয়া চলে তবে উহাকে শুক্লতর দেখায় আর

শ্যাম মেখলা দিয়া চলিলে শ্যামতর দেখায়। গ্রহবিম্বে মেখলার পরিবর্ত্তনের প্রকৃত বহির্গমনকে নিষ্ক্রম বলে। এই ব্যাপারের নাম ভেদযোগ।

বৃহস্পতি যখন পাদান্তরে থাকেন তখন উপগ্রহগণের পরিভ্রমণে উক্তরূপ ব্যাপার সকল অবলোকিত হয়। বৃহস্পতি পাদান্তরের সন্নিহিত হইলে ৩য় ও ৪র্থ উপগ্রহের কএ ও খএ নিমীলন ও উন্মীলন উভয়বিধ ব্যাপার বৃহস্পতির এক দিকেই দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু ১মএর ও ২য়এর কেবল নিমীলন দেখা যায়। উন্মীলন কালে গ্রহবিম্ব দ্বারা উপগ্রহ আচ্ছাদিত হয় এবং গ্রহের পশ্চাৎভাগ অতিক্রম না করিলে পুনরুদিত হয় না।

উপগ্রহগণের গ্রহণ দেখিয়া দেশান্তর নিরূপণ। বার্হস্পত্য উপগ্রহের আবিষ্কারের অবিলম্বে প্রতিভাসম্পন্ন গালিলিও বুঝিয়াছিলেন যে এই উপগ্রহগণের গ্রহণ দেশান্তর নিরূপণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাঁহার আশা ছিল যে এই উপায় অবলম্বন করিলে নাবিকদিগের পক্ষে দেশান্তর নিরূপণ অতি সহজ হইবে। কিন্তু জাহাজের উপর থাকিয়া গ্রহণে স্পর্শাদি কাল অবধারিত করার পক্ষে যে অনেক ব্যাঘাত তিনি তাহা ভাবেন নাই। সত্য বটে যে, যে সকল দেশের ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধে গ্রহণ হয় তত্তৎ দেশের লোকেরা তাৎকালিক ব্যাপাররূপ সেই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঘড়ীর কালান্তর প্রাপ্তি সুতরাং দেশান্তর লাভ হয়। যেমন উজ্জয়িনীর গণিত গ্রহণ কলিকাতায় দেখিলে, উজ্জয়িনীর গণিতকাল ও কলিকাতার বেধলব্ধকাল উভয়ের অন্তর পাওয়া যায় সুতরাং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতা কত মাইল পূর্ব্বে তাহা জানা যায়। কিন্তু গ্রহণ কাল নিরূপণ জন্য পর্য্যবেক্ষণে যতদূর সূক্ষ্মতা প্রয়োজন তাহা ভূমিতেই যখন দুর্লভ তখন সে সূক্ষ্মতা সাগরের উপর কিরূপে সুলভ হইবে? ছায়াতে প্রবেশকালে উপগ্রহের আলোক ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং ছায়া হইতে বিনির্গমনকালে বাড়িতে থাকে সুতরাং উপগ্রহের স্পর্শের ও মোক্ষের বেধলব্ধকাল দূরবীক্ষণের তেজস্বিতার উপর নির্ভর করে। অতএব এ উপায় দ্বারা আশার অনুরূপ ফল লাভ হইতে পারে না স্থূল পরিমাণ পাওয়া যায়।

উপগ্রহগণের বিন্যাস। বৃহস্পতির উপগ্রহ চারিটির অবস্থান অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয়তো চারিটি উপগ্রহই বৃহস্পতির এক দিকে দেখা যায়; প্রায়ই দুই বা তিনটির অধিক দেখা যায় না; কখন বা কেবল একটিমাত্র নয়ন গোচর হয়; লেখা আছে যে এক এক সময়ে ক্ষণকালের জন্য চারিটিই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ১৮৬৭ অব্দে ২১ অগষ্ট তারিখে প্রায় পৌণে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃহস্পতিকে অনুচর বিরহিত দেখা গিয়াছিল।

প্রথম তিনটি উপগ্রহের মধ্যম গতির অপূর্ব্ব সম্বন্ধ।

১মএর গতি + দ্বিগুণিত ৩য়এর গতি = ত্রিগুণিত ২য়এর গতি; অর্থাৎ ১মএর ভোগ × ২ (৩য় এর ভোগ) — ৩ (২য় এর ভোগ) = ধ্রুবাঙ্ক। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে এই ধ্রুবাঙ্ক ১৮০°।

...লিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

উপগ্রহ	দি	ঘ	মি	সে	নক্ষত্র মানে ভগণ কাল সেকণ্ড	প্রতি সেকণ্ডে গতি ,,
১ম	১	১৮	২৭·	৩৩·৫০৫	১,৫২,৮৫৩·৫০৫	৮·৪৭৮৭০৬
২য়	৩	১৩	১৩	৪২·০৪০	৩,০৬,৮২২.০৪০	৪·২২৩৯৪৭
৩য়	৭	৩	৪২	৩৩·৩৬০	৬,১৮,১৫৩·৩৬০	২·০৯৬৫৬৭
৪র্থ	১৬	১৬	৩২	১১·২৭১	১৪,৩১,৯৩১.২৭১	০·০৯৮৭৯০

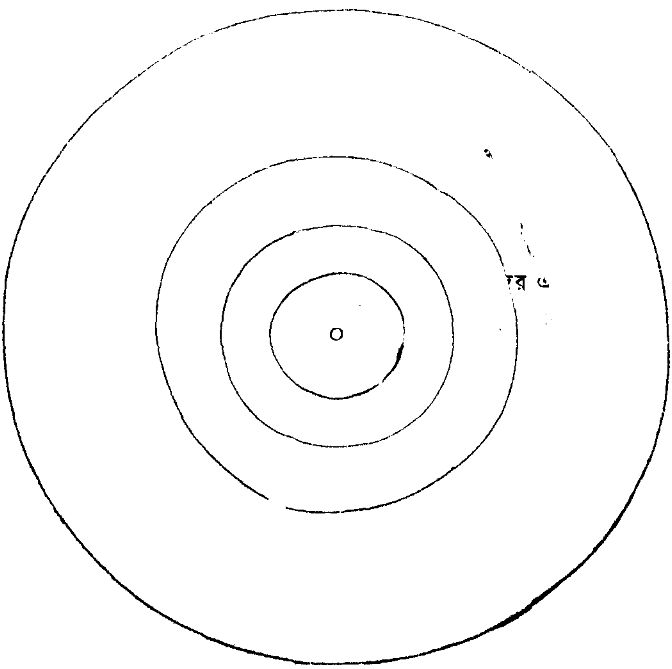
সুতরাং ১ম এর ৮.৪৭৮৭০৬ × ১ = ৮·৪৭৮৭০৬,

২য় এর ৪·২২৩৯৪৭ × ৩ = ১২·৬০১৮৪১,

৩য় এর ২·০৯৬৫৬৭ × ২ = ৪·১৯৩১৩৪,

প্রথম ও তৃতীয় রাশির যোগে ১২·৬৭১৮৪০ প্রায় ঠিক দ্বিতীয় রাশির সমান।

এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে প্রথম তিন উপগ্রহের যুগপৎ গ্রহণ হইতে পারে না; আর যখন দুইটির গ্রহণ একেবারে হয় তখন তৃতীয়টি পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যে আসে; এ অবস্থায় উপগ্রহ সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট হয়, তবে অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণে দেখা যায়।



বার্হস্পত্য জগতের পরিলেখ।

কক্ষা চতুষ্টয় যথা পরিমাণ অঙ্কিত হইয়াছে।

৬

বারজেনটিনের সিদ্ধান্ত। ইনি বার্হস্পত্য চন্দ্রের গতি পরীক্ষায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বকৃত সারণী অনুসারে হিসাব করিয়াছেন যে, তিন চাঁদের গ্রহণ যদি এককালে হয় তবে তাহা ১৩,১৭,৯০০ বৎসরের পূর্ব্বে নহে। আর ২য় এর বার্ষিক গতি যদি কোনরূপে ০·৩৩" পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তবে তিন চাঁদের যুগপৎ গ্রহণ কোনকালে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু চন্দ্র চতুষ্টয়ের গতির পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ ১৭৬৭ অব্দের ধূমকেতু বার্হস্পত্য জগতের মধ্যদিয়া গিয়াছিল তাহাতেও উক্ত উপগ্রহগণের মধ্যম গতির কিছুমাত্র ন্যূনাধিক্য ঘটে নাই।

৬´ আরবেক্টের সিদ্ধান্ত। কতিপয় ঘণ্টার তফাৎ যদি না ধরা যায় তবে উপগ্রহ চতুষ্টয়ের ভগণে সাপবর্ত্ততা প্রাপ্তি হয়।

উপগ্রহ	দিন।	দিন।
১ম	১·৭৭ × ৫১৮৭ =	৯১৮০·২৭
২য়	৩·৫৫ × ২৫৮৩ =	৯১৮০·২৩
৩য়	৭·১৫ × ১২৮১ =	৯১৮০.১৪
৪র্থ	১৬·৬৯ × ৫৪৮ =	৯১৮০·৯৫

অর্থাৎ ৯১৮০ দিনে বা ২৫ বৎসর ৪৯ দিনের পর ১ম এর ৫১৮৭ পরিভ্রমণ হয়।
২য় এর ২৫৮৩ পরিভ্রমণ, ৩য় এর ১২৮১ এবং ৪র্থ এর ৫৪৮ ভভ্রম হয়।
৩য় ও ৪র্থ উপগ্রহের ভভ্রমে অপেক্ষাকৃত স্থূল সাপবর্ত্ততা দেখা যায়।
৩য় এর ৭ পরিভ্রমণ = ৫০ দি. ১ ঘ. ৫৭ মি· ৫৩৫২০ সে,
৪র্থ এর ৩ পরিভ্রমণ = ৫০ দি ১ ঘ. ৩৬ মি. ৩৩·৮১৩ সে,
অন্তর ২১ মি. ১৯·৭ সে মা।

আলোকের গতি। দূরবীক্ষণের সৃষ্টির কিছুদিন পরেই দেনমার্ক দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ রোমর বার্হস্পত্য চন্দ্রগ্রহণের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ঐ তালিকায় এক বৎসরে যত গ্রহণ হয় তাহা গণিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে গণিতের সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করিবার জন্য পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের প্রারম্ভে পৃথিবী পৃ'তে বৃহস্পতির সন্নিকৃষ্ট ছিলেন। পৃথিবী যত পৃ''দিকে যাইতে লাগিলেন গ্রহণের গণিত কাল বেধলব্ধ কালাপেক্ষা তত একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। এবং পৃথিবী যত প''' দিকে চলিলেন বেধলব্ধ কাল গণিত কালাপেক্ষা ততই অধিক হইতে লাগিল; পরিণামে প''' তে ১৬ মিনিট বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে আবার যখন প'এর দিকে আসিতে লাগিলেন তখন গণিত কালাপেক্ষা দৃষ্টকাল অল্প হইতে লাগিল এবং অবশেষে প' আসায় দৃক্ ও গণিত একতা প্রাপ্ত হইল।

এই দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল যে, গণিত কালাপেক্ষা গ্রহণ বিলম্বে ঘটিবার কারণ কেবল বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীর দূরত্বের আধিক্য। পৃথিবী যখন পৃ'''এ তখন প' এ গ্রহণের গণিত

কালাপেক্ষা ১৬ মিনিট অধিক হইল। ভূব্যাস সাড়ে উনিশ কোটি মাইল অতএব প্রতি ২ লক্ষ মাইল অন্তরে গণিতকাল এক সেকণ্ড করিয়া বাড়ে। এখন দেখা যাইতেছে যে, উপগ্রহ যেমন বৃহস্পতির ছায়া স্পর্শ করিল অমনই গ্রহণ লাগিল তবে দৃষ্টকাল গণিত কালাপেক্ষা অধিক হয় কেন? ইহার কারণ এই যে উপগ্রহের নিমীলনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে আলোক পৃথিবীতে আসিতে আরম্ভ করিল সে আলোক তৎক্ষণাৎ আসিতে পারিল না, উহা দর্শকের চক্ষে প[ৌছি]তে ১৬ মিনিট বিলম্ব হইল।

অপেক্ষাকৃত সূ[ক্ষ্ম]রূপে গণিত করিয়া অবধারিত হইয়াছে যে ভূব্যাস অতিক্রম করিতে আলোকের ১৭ মি/২৭ সে ·৯২১ লাগে অর্থাৎ প্রতি সেকণ্ডে আলোক ১,৮৭,৬১৬ মাইল গমন করে।

—বার্হস্পত্য লোকে জীবের বাস। বোধ হয় বার্হস্পত্য জগতের [illegible] কার্য্য অদ্যাপি সমাহিত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে (সহস্র সহস্র শতাব্দ পূর্ব্বে [illegible] [illegible]রি, পাঁচ বা ততধিক চন্দ্রাত্মক জগতের সবিতার স্বরূপ ছিলেন বহুবিধ উপগ্রহে [illegible] এই জীবমণ্ডল যদিও অদ্যাপি জীবের বাসোপযোগী না হইয়া থাকে তথাপি তদীয় উপ[গ্রহ]গণে প্রাণীপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। উপগ্রহবাসীদিগের নয়নে গ্রহবর কি মহান্ কি চমৎকার কি বিচিত্র দেখান। প্রথম উপগ্রহ হইতে দেখিলে বৃহস্পতির চাপাত্মক ২০° পরিমিত বিশাল বিম্ব চৌদ্দশত পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষাও বৃহত্তর দেখায়। কি অপূর্ব্ব কলেবর! কি সুন্দর ছবি! কত আয়ত রঞ্জিত মেখলাবলী! নানাবর্ণময় উজ্জ্বল কামরূপ মেঘমালার অনুপম সঞ্চার! নিশীথিনীর দিনমণি! মণ্ডল বোধ হয় এখনও উষ্ণ। অপিচ উপগ্রহ পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া কি অপূর্ব্ব নেত্রানন্দ উপভোগ করে। এরূপ দৃশ্য ভৌমী রজনীর কল্পনাতীত।

বার্হস্পত্য লোকের বর্ত্তমান বা ভাবী জীবগণ সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোন কথা বলিবার অধিকার জন্মে নাই। পার্থিব জীবনের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যে জ্ঞানলাভ হইয়াছে তৎসহকারে ভিন্নলোকের জীবগণের বাহ্য বা অন্তঃ প্রকৃতির কল্পনা করা অবিধেয়। কেবল ভগবতী প্রকৃতিই জানেন যে দেশ, কাল বিচার পূর্ব্বক কিরূপে জীব সৃষ্টি করিতে হয়।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অতিক্রমণ, Pass.
অতিপার্থিব, Beyond orbit of Earth.
অনুহৈলিক, Perihelion.
অপহৈলিক, Aphelion.
অন্তঃপার্থিব, Within Earth's orbit.
অযুগ্মপাদ, Odd Quadrant.
অবনতি, Inclination.
অক্ষব্যাস, Polar diameter.
আচ্ছাদন, Occultation.
পরিলেখ, Projection, Illustration.
পৃষ্ঠ, Surface.
ফ্রেইরা, Freia.
বাবাজী, Pope.
ভগণকাল, Time of revolution.
ভেদযোগ, Transit.
মন্দপরিধি, Epicycle.
মন্দফল, Equation of Centre.
মন্দোচ্চ, Aphelion.

আবর্ত্তন অক্ষ, Axis of Rotation.
উৎকেন্দ্রত্ব, Eccentricity.
উন্মীলন, Emersion.
কক্ষা, Orbit.
কণা, Particle,
কেন্দ্রসংস্কার, Equation of C..atre.
কেপ্লরীয়, Of Kepler.
ক্লাবিঅস্, Clavius.
ক্ষুদ্রগ্রহ, Aster..id, Minor Planet.
ক্ষেত্র, Plain.
খাড়া, Perpendicular.
গালিলেও Galileo.
গোলা.. ..lleplicity.
গ্রহব.. ..f asteroids.
চাপা..
জীব.. ..n system.
দ' .. Arrest.
নিম.., Immersion.
নিরক্ষবৃত্তীয়, Equattorial.
পরমার্থতঃ, Really.
..মার্গী, Direct.
মীন, Pices.
মেখলা, Belt.
যুগ্মপাদ, Even quadrant.
রেঙ্গেল, Wrangel.
রেবতী, Zeta Piciun.
রোমর, Romer.
বক্রী, Retrograde.
বিক্ষেপ, Latitude.
বিক্ষোভ, Disturbance.
বিলোমানুপাত, Indirect ratio.
ষড়ভান্তর, Six sines distant.
সপাটত্ব, Flatness.
সমাগম, Conjuction.
সাইবিরিয়া, Siberia.
সান্দ্রত্ব, Density.
সামগ্রী, Mass.
হেঁকাতে, Slant.
হ্রস্বমিত অনুরূপ, Mimature.

অলঙ্কারের দোকান।

আমি কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছি। যখন মাইকেল, হেমবাবু প্রভৃতি দিগ্‌গজ কবির কাব্যগুলির ভাল কাট্‌তি নাই তখন আমার কবি হওয়া ধৃষ্টতামাত্র। এখন আমি অলঙ্কারের দোকান খুলিয়াছি। মহাজনো গতঃ স পন্থাঃ। এ পথে আমি প্রথম পথিক নহি। সাহিত্য ছাড়িয়া অলঙ্কারের দোকান আরও দুই এক জন মহাত্মা খুলিয়াছেন। যথা ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বাবু। মহাকবি Shelly যথার্থই বলিয়াছেন :—

"Most men are cradled into the—the—the goldsmith's craft by wrong."

আমার স্মরণশক্তিটা স্বভাবতঃ কিছু দুর্ব্বল। Quotationটা ঠিক হইল কি না বলিতে পারি না। একদিন আমি এই স্মরণশক্তির দোষে মহাবিপদেই পড়িয়াছিলাম। সে বহুদিনের কথা; আমি তখন প্রেসিডেন্সি কালেজে 4th Yearএ পাঠ করি। Professor Tawney সমবেত ছাত্রমণ্ডলিকে বলিলেন "Wordsworthএর Rainbow শীর্ষক কবিতাটির যিটি oft-quoted line তাহার উপর তোমরা একটা essay লেখ।" আমি The man is the father of the child এই heading দিয়া একটা লম্বা চৌড়া প্রবন্ধ লিখি-

লাম। টনি সাহেব স্বভাবতঃ কিছু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি পর্য্যন্ত সে দিন হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

পরন্তু মহাশয়রা আমাকে এ কাজে নেহাৎ amateur ঠাওরাইবেন না। আমি আমার এই দোকান খুলিবার আগে ভাল ভাল কারিগরের নিকটে কাজ রীতিমত শিখিয়া লইয়াছি। অলঙ্কারের নামগুলিও তাহাদিগের দেওয়া। এমন সুন্দর, হৃদয়-গ্রাহী, নারীকর্ণরঞ্জন নাম এ জগতে নাই। যথা সরমা-সিঁতি, প্রমীলা-চিক। এই দুটি ফ্যাশেনের অলঙ্কারের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুনিতে পাই—এই সরমা-সিঁতি অশোকবনে জনক দুহিতা দশরথ-পুত্রবধূ সীতাদেবী মাথায় পরিতেন। ললাটে অশোক-সিন্দুর ও এই অনুপম সরমা-সিঁতি। মরি! মরি! বনলক্ষ্মীর কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত। আর প্রমীলা-চিক্ লঙ্কার Prince of Wales মেঘনাদ কণ্ঠে ধারণ করিতেন। সেকালে পুরুষদিগেরও অলঙ্কার পরার রীতি ছিল। হনুমান, অঙ্গদ, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি এই প্রমীলা-চিক্ গলায় দিতে গিয়াছিল। বানরের জাত্ কত আর ভাল হইবে। এই ঘটনা হইতেই "বানরের গলায় মুক্তার মালা" প্রবাদের সৃষ্টি। গলায় দিয়া বানরগুলা যায় আর কি! শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু উল্টাইয়া গেল। তখন স্বয়ং ভক্তবৎসল রামচন্দ্র আসিয়া গলার ফাঁশ ছাড়াইয়া দিলেন। এ কাহিনীটি আমার স্বকপোল-কল্পিত নহে। মেঘনাদবধ নামক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

কপাল-কুণ্ডলা-শাঁখা আর সূর্য্যমুখী-চূড় এ দুটি অপূর্ব্ব fashion এর গহনা। ইহার আবিষ্কর্ত্তা বঙ্কিমচন্দ্র।

কপাল-কুণ্ডলা-শাঁখা! আমার রাঙাদিদি ত' হাসিয়াই খুন্! রাঙাদিদি সুবাদে আমার ঠাক্‌রুণদিদি হন্। তিনি নাকে একটি নাতিবৃহৎ নথ পরেন। আমার রাঙাদিদি Junction Station স্বরূপ। তিনি Loop line রূপিণী প্রাচীনাদিগের ও Chord line রূপিণী নবীনাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী Kanoo-Junction অথবা লক্ষ্মীসরাই। তাঁহার ক্ষুদ্র নথটিও একটি copula বিশেষ—প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ! তিনি নাকের নথটি নাড়িয়া বলিলেন :—

"অবাক আর কি! সোণার শাঁখা, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, সোণার পাথর-বাটী!"

আমি বলিলাম :—

"নাম মাত্র শাঁখা কিন্তু জিনিস্‌টা খাঁটি সোণা। তোমার নাকের নতের চেয়ে ভাল। কারিগরটা কে তা জান?" নাম শুনিয়া রাঙাদিদি একবার হাতে পরিলেন ও বলিলেন "বাহ! বেশ তো, সাঁকার মত গড়নটা কিন্তু কেমন ঝক্‌মক্ করছে। শহুরে মেয়েদের ঠ্যাকায় দেখে বাঁচিনে। এমন গহনাকেও হতশ্রদ্ধা করে গা!"

আমি বলিলাম "হাঁ দিদি, তোমাদের দৌরাত্ম্যেই তো পাড়াগাঁয়ে, জঙ্গলে, পালিয়ে গিয়ে, শেষটা গঙ্গাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে out of fashion হয়ে পড়েছিল। Bankim Babu revive—পুনরায় আবিষ্কার করেছেন।

সূর্য্য-মুখী-চুড় একেবারে নূতন ফ্যাশনের। মূল্য কিছু বেশি। বড়মানুষের ঘরের গৃহিনীর উপযুক্ত। দেখাদেখি দুই একজন পৈচি সোণার বেণে নকল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সে কদর্য্যগড়ন, ফঙ্গবেনে গহনা; কেবল কন্যাভারগ্রস্ত পিতার ক্রয় করিবার যোগ্য।

ইন্দুবালা-প্রজাপতি ও ঐন্দ্রিলা-পইরি এই দুই গহনার ওরিজিনাল মেকার হেমবাবু।

ইন্দুবালা-প্রজাপতি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, দেখিলে আসল প্রজাপতি বলিয়া ভ্রম হয়। ঝক্ মক্, ঝল্ মল্! পক্ষ নক্ষত্র-খচিত। যখন সুন্দরীর খোঁপায় উঠে তখন বোধ হয় যেন মাতৃ-স্তন্যপায়ী-অতিক্ষুদ্র মনুষ্য-শিশুবৎ একটা জীবন্ত প্রজাপতি নির্ব্বাক নিঃশব্দে করবির ঝাড়ে বসিয়া আছে। এমনি শীরিষ-পুষ্প-সুকুমার অঙ্গ যে ছুঁইতে ভয় হয়। সুন্দরীরা সাবধান; তাহাদের ক্রোড়স্থ শিশু দুষ্ট ভে[illegible] যা ঘাঁটে! সে যে রগ্‌ড়ায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

"[illegible] প্রজাপতি, কে চায় রে ভ্রমরী?"

ঐন্দ্রিলা পইরি! ওমা প[illegible]ক! আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ আপনারা এ নামশুনেন নাই। পইরি একপ্রকার পা[illegible]হনা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোয়ালিনীরা পায়ে দেয়। যে দিন পায়ে দে[illegible]র চীৎকার-শব্দে ববিরের বধিরতা সারিয়া যায় এবং যন্ত্র শ্রবণ-মাত্রেন বিশল্য[illegible]বেৎ। আর ত্যাগ করে সেই মহাপ্রস্থানের দিন। অথবা সে নিজে ছাড়ে না; পইরি তাহাকে ছাড়ে। শুনিতে পাই এ গহনা বৃত্রাসুর নামক জনৈক দৈত্য পায়ে দিয়াছিল; গহনা দৈত্যরাজকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই। অবশ্য এ গহনা বঙ্গ-সীমন্তিনীদিগের [illegible]গ্য নহে। কিন্তু যে দেশে উল্কির আধিপত্য ছিল, যে দেশে চন্দ্রহার, বাঁকমল অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হয়, নথধারিণী রাঙাদিদির প্রভাব অদ্যাপি যেখানে অপ্রতিহত, সেখানে আমারও আশা ফলবতী হইতে পারে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া ভারতী পত্রিকায় ইহারও বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল। ভরসা করি সুন্দরী পাঠিকারা (আর সুন্দর পাঠকরাও বটে) অপরাধ মাফ্ করিবেন।

সুভদ্রা-কণ্ঠমালা ও সত্যভামা-নথ—এ দুটির ওরিজিনাল মেকার নবীন বাবু। লোকটার এ ধরণের গহনা গড়ায় সিদ্ধহাত।

সত্যভামা-নথ এখনও obsolete হয় নাই। রৈবতক নামক Webster's Dictionary তে পাওয়া যায়। খদ্দের যথেষ্ট। সে দিন রাঙাদিদি মুচকে হাসিয়া, ঠুংরি তালে গ্রথিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন "আমার সত্য-ভামা নথ চাই। অগ্রিম বাণী দেড় টাকা নাও।" আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "নথ! নথ! সেকি গো, সে গহনা যে বেফ্যাশান।" অমনি আমার পীঠে গুম্ করিয়া একটা কিল্ পড়িল। আমি আহত পৃষ্ঠ আমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলাম "হে বিপত্তৌ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! সত্যভামা-নথের মাহাত্ম্য তুমি বুঝিয়াছিলে, বুঝিয়াছেন আমার রাঙাদিদি, আর হাতে কলমে বুঝিয়াছি আমি।"

সুভদ্রা-কণ্ঠমালা সে কালে রৈবতক-পর্ব্বতে যাদবীরা কণ্ঠে ধারণ করিত। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—এমন অপূর্ব্ব-শোভাময় অলঙ্কার আপনারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। আমি যে দোকানি—আমারও (তা, আপনারা গ্রাহক, আপনাদিগের কাছে বলিতে লজ্জা কি ?)—আমারও কণ্ঠে ধারণ করিতে ইচ্ছা যায়।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনদেব লাবণ্যময় গহনার মূর্ত্তি দেখিয়া লোভসম্বরণ করিতে পারেন নাই। লোকটা বিলক্ষণ ফুলবাবু। Gay Lothario গোছের প্রকৃতি, কিন্তু দেখান "আমি ভারি সাদাসিদে।" দ্রুপদ রাজা বিবাহের সময়ে ঘড়ি ও ঘড়ির চেন্ দিয়াছিলেন। তা পরিলেন না। বলিলেন আমার ভ্রাতারা পরিবে।" অহো! কি ভ্রাতৃ-প্রেম! শেষটা এই কীর্ত্তি; গহনা চুরি! বলভদ্রদাদা নেশায় চুর্ ছিলেন; এই চুরির সংবাদ শুনিয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া, বলিলেন "শ্বশুর কা শির লও।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "করেন কি দাদা ? ওযে ভগ্নীপতি হয়।" মহাবীর অর্জ্জুন কণ্ঠমালা কণ্ঠে দিয়া Young Lochinvarএর মত চম্পট দিলেন। *হতাশ্বাস হইয়া বলাই দাদা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন আর ভৃত্যদিগকে হুকুম দিলেন "Never* mind. Punch তৈয়ার কর।"

সুমিত্রা-বীরবৌলি ও নলিনী-সূর্য্যহার—এই দুইটি গহনার ওরিজিনাল মেকার রবীন্দ্র বাবু। বীরবৌলি বীরপুরুষের কর্ণ-ভূষণ। বাঙালির ঘরে এ কেন ? পুরুষরা চেন আর আংটি নিয়াই ব্যস্ত। এ কেন ? কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—ইহাও fashionable হইয়া পড়িবে। যেমন Tagore's cap fashionable হইয়া পড়িয়াছে, যেমন রবীন্দ্রবাবুর "শিশির" দেখিয়া, তেমনি নাচুনে ছন্দে চারু মতি সকলেই "রুধির" "আবির" "পনির"এর উপর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে—তেমনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সুমিত্রা-বীরবৌলীও fashionable হইয়া পড়িবে।

নলিনী-সূর্য্যহার; নলিনী-সূর্য্যহার। অনেক সুন্দরীরা হয় 'ত "চন্দ্রহার, গোট্, বেট্" বলিয়া নাক সিট্‌কাইয়া উঠিবেন! কিন্তু নমুনাটা দেখুন্, তারপর নামঞ্জুর করিবেন। এক ছড়া সূর্যহার ইংলণ্ডের রাজ্ঞী, Essex, Raleigh প্রভৃতির সখী, শ্রীমতী এলিজেবেথ্ সুন্দরীর সমীপে পাঠাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তার পর (শ্রীবিষ্ণু) স্মরণ হইল Queen Elizabeth এ পৃথিবীতে নাই। একছড়া সূর্য্যহার রাঙাদিদির কাছে পাঠাইলে হয় না? (অবশ্য নমুনা-স্বরূপ)—আপনারা কি বলেন ?

নবান্ন।

বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে নবান্ন অগ্রহায়ণের একটি আনন্দকর আবশ্যকীয় পার্ব্বণ। পল্লী-বাসীদিগের মধ্যে হিন্দুমাত্রেই পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদিগকে নূতন চাউল উৎসর্গ না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করে না, বরং সেরূপ করিলে তাহাতে প্রত্যবায় আছে বলিয়া মনে করে; এমন কি অনেক প্রবাসী এই সময় স্বগৃহে সমাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত সমা-রোহ পূর্ব্বক নবান্ন করিয়া কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করে। পূর্ব্বে পল্লী অঞ্চলে এই দৃশ্য তেমন বিরল ছিল না, কিন্তু আজকাল রেল ও ষ্টীমারের অত্যন্ত প্রচলনে এক দেশের লোক বহু-দূরবর্ত্তী প্রবাসে গমন করায় এবং অনেক অতিরিক্ত খরচ পড়িয়া যায় এই কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মধুর স্মৃতিমণ্ডিত পল্লীগ্রামের উৎসবভবনে উপস্থিত হইয়া নবান্নে যোগ দিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী শিক্ষাও আমাদের এই ভাবটিকে অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। নবান্ন না করিলে কোন প্রত্যবায় আছে কি না জানি না, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে হর্ষ-কোলাহলমুখর, বালকবালিকার সুকোমল পদধ্বনিতে সদাচঞ্চল স্নেহপূর্ণ গৃহে পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী এবং পুত্র কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া অচিরোৎপন্ন নূতন চাউলের অন্নগ্রহণের মধ্যে একটা মাধুর্য্য, একটি প্রীতিকর ভাব আছে যাহা বিরহ-বিষাদ-প্লাবিত নিত্য প্রবাসীর একক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর, এবং এই পুণ্যস্মৃতিটুকুকে পথের সম্বল করিয়া বিরহী পথিক তাঁহার সম্বৎসরের দীর্ঘ বিরহযাত্রাকে মধুময় করিতে পারে।

আমাদের ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রামে যে সকল গৃহস্থের বাস, তাহাদিগের অধিকাংশেরই উপজীবিকা চাষ; যাহারা জমীদারের বাড়ীতে কি নীলকুঠীতে চাকরী করে, তাহাদিগেরও দুই দশ বিঘা জমী কি একখান লাঙ্গল আছে, তাহা হইতে তাহাদের সম্বৎসরের চিড়ামুড়ীর এবং ডাল ও তৈলের সংস্থান হয়, পাঁচজন লোকও হাতে থাকে। এদিকে কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়াতে চাষে প্রায় প্রতি বৎসরই লোকশান হইতেছে কিন্তু তথাপি কেহ চাষ ছাড়িতে চাহে না, ইহাকে তাহারা দিনপাতের একটা উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করে; চাষবাস একেবারে উঠিয়া গেলে পল্লী অঞ্চলে মারামারি, নিন্দা কুৎসা দলাদলীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া উঠিত; জমীদারের বাড়ীতে বা নীলকুঠীতে কাজ শেষ করিয়া যে দুইদণ্ড সময় পাওয়া যায়, লোকে তাহা রাখাল কৃষাণ লইয়া জমীর কথা, গরু ও লাঙ্গলের কথা, ফসলের কথা লইয়াই কাটাইয়া দেয়। চাষ উঠিয়া গেলে আর এ সকল উৎপাত থাকিত না, সুতরাং কোন নিরীহ ভদ্রলোকের জাতি মারিবার জন্য কিম্বা কোন নিরাশ্রয়া বিধবার অরক্ষিতা কন্যার বিবাহে বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সকালে ও সন্ধ্যাকালে নিমাই হালদারের দোকানে, না হয় বিশ্বনাথ সরকারের চণ্ডীমণ্ডপে ঘটা করিয়া বৈঠক বসা-ইয়া শুধু তামাকের শ্রাদ্ধ করিত। অতএব চাষে যতই লোকশান হউক, ইহা যেন পল্লী অঞ্চল হইতে উঠিয়া না যায়, পল্লীবাসীর কার্য্যহীন চিত্তকে সংযত রাখিবার ইহা একটি মহৌষধ।

মজুমদারেরা গোবিন্দপুরের একঘর প্রধান গৃহস্থ; শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বকালে তাঁহাদের জমীদারীও ছিল; ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর কি তাহারও পূর্ব্বে তাঁহাদের জমীদারী বাঁকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, পদ্মাপারে ইহাদিগের জমীদারী ছিল, মজুমদারদের পূর্ব্বপুরুষ গুরুগোবিন্দ মজুমদারের মোক্তার জয়রাম গাঙ্গুলী তাঁহার নিকট হইতে কালেক্টরীর খাজনার টাকা লইয়া জেলায় যাইতেছিল, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মোক্তার একখান ভিজে গামছা পরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া মজুমদার বৃদ্ধের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুগোবিন্দ জানিতে পারিলেন তাঁহারই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, গঙ্গাগর্ভে খাজনার টাকা শুদ্ধ মোক্তারের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, এক কপর্দ্দকও উদ্ধার হয় নাই, মা গঙ্গা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুগোবিন্দ নিজের অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিলেন কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই তাঁহার বৃহৎ জমীদারী লাটে উঠিবে, শত শত ব্যক্তিকে যিনি নিত্য অন্নদানে প্রতিপালন করিতেছেন তাঁহাকেই সপরিবারে অন্নকষ্টে মারা পড়িতে হইবে, কিন্তু নিরুপায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সুদূর সদরে পাঠান সেকালের রেলওয়ে টেলিগ্রাফহীন সময়ে অসম্ভব ছিল। মোক্তার ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহাকে অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু টাকা ডুবির কথাটাও তিনি তেমন বিশ্বাস করিলেন না, শুধু ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন "মা গঙ্গা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন কিন্তু তোমার লজ্জাটুকু নিবারিত হইয়াছে ত? সকলই গিয়াছে, তোমার গামছাখানি যায় নাই দেখিতেছি, আচ্ছা যাও, তোমার দায়িত্ব হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।"

মজুমদারদের টাকাতেই তাঁহাদের সম্পত্তি খরিদ হইয়া গেল, মোক্তার জমীদার হইল, কিন্তু সেই হইতেই মজুমদারেরা চাষী গৃহস্থ :—

"বাণিজ্যেবসতে লক্ষ্মী,
তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।"

এ প্রবাদটা মজুমদার-পরিবারে বেশ ফলিয়া গিয়াছিল; দৈব বিড়ম্বনায় তাঁহারা লক্ষ্মীকে বিদায় দিলেন বটে কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী সেই সরলহৃদয় উদার বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। সমস্ত বিষয় নষ্ট হইলেও এই চাষ হইতেই গুরুগোবিন্দ মজুমদারের সোনার টাট বজায় ছিল; তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার এই চাষের টাকা হইতেই সাতগেছের চৌধুরী জমীদারদের কাছে চক শ্যামনগর মহালখানি কিনিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন গ্রামের বাহিরে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটো প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামের দক্ষিণদিকে যে পুকুরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম গোপালদিঘী। পাশে গ্রাম্যদেবতা গোপালদেবের উচ্চ সুন্দর মন্দির, বিগ্রহের নাম অনুসারে এই পুষ্করিণীর নাম গোপালদিঘী হইয়াছে; গোপালদিঘীর পূর্ব্ব পশ্চিম দুইদিকে দুইটি সানবাধান প্রকাণ্ড

ঘাট, উপরে সুন্দর চাঁদনী। পূর্ব্ব ঘাটটিতে স্ত্রীলোকেরা এবং পশ্চিমটিতে পুরুষেরা স্নান করেন। মন্দিরের অনতিদূরে মজুমদারদের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী—ধান, গোধূম, অরহর, মশিনা, বুট প্রভৃতি শস্যে বার চোদ্দটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা বোঝাই হইয়া থাকিত। মছিরদ্দীন বিশ্বাস এই গোলাবাড়ীর গোমস্তা; মছিরদ্দীন অনেক দিনের পুরাতন চাকর, প্রভুর অত্যন্ত বিশ্বাসী; ধান বাড়ী দেওয়া, আসামীদিগের কাছে ধান ও অন্যান্য শস্য আদায় করা, গোলাবাড়ীর জিনিষপত্র খরিদ বিক্রয় করা, সমস্ত তাহারই কাজ।

এখান হইতে মজুমদারবাড়ী বেশী দূরে নহে; মজুমদারদের পূজার চণ্ডীমণ্ডপখানি অত্যন্ত বৃহৎ, বাহির বাড়ীতে শুধু সেই ঘরখানিই কাঁচা, আর সমস্ত পাকা ইমারত। বাড়ীর পাশেই গোয়ালবাড়ী, গোয়ালবাড়ীতে খুব বড় বড় দুখানা গোয়াল ঘর, চাষী গৃহস্থ বলিয়া ইঁহাদের বিশ বাইশটে বলদ আছে, গাই গরুর সংখ্যাও দশ বারোটা। গোয়ালের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে সারি সারি 'নাদা' পাতা, সেগুলি মাটি দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধান, একপাশে ঘরের মত উঁচু বিচালির গাদা এবং একটি অনতিদীর্ঘ ভুষির ঘরে বাঁশের মাচার উপর ঘরের চাল সমান ভুষি। মধ্যাহ্ন কালে যখন গোরুগুলি গোয়াল ছাড়িয়া মাঠে চরিতে বা ভুঁই চষিতে যায়, তখন গোয়াল বাড়ীটা শূন্য 'হা হা' করে, কিন্তু অপরাহ্ন কালে গোয়ালের আর এক শ্রী বাহির হয়। কৃষাণেরা ক্ষেত হইতে ফিরিয়া আসিয়া লাঙ্গলগুলি ঘরের ভিতে কাৎ করিয়া রাখে, দুই জন চাকর বাঁকের দুই দিকে টিনের ক্যানেস্তারা ঝুলাইয়া পুকুর হইতে জল আনিয়া জাবনার জন্য নাদাগুলি পরিপূর্ণ করিতে থাকে, একজন রাখাল বড় বিচালী-কাটা বঁটিতে বিচালী চুরাইতে থাকে; শেষে বিচালী চুরান হইলে জাবনা মাখিয়া বলদ-গুলাকে নাদার কাছে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহারা নাক চুবড়াইয়া 'সানি' খাইতে আরম্ভ করে, এক একবার মুখ তুলিয়া ব্যস্তভাবে চর্ব্বন করিতে থাকে অথবা পরস্পরের শিঙ্গে শিঙ্গ বাধাইয়া মারামারি করে; কৃষকেরা গোয়ালের চালে পানাইগুলি গুঁজিয়া রাখিয়া বাঁশের চোঙ্গাতে করিয়া গৃহকর্ত্রীর কাছে তেল লইয়া সর্ব্ব শরীর তৈলে উত্তমরূপে অভিষিক্ত করে—তাহার পর পুকুরে স্নান করিতে যায়। রাখালেরা সন্ধ্যার সময় গরু চরাইয়া আসিয়া গোরুগুলিকে গোয়ালঘরে তুলিয়া রাখে, তাহার পর দুই একটি দুগ্ধবতী গাভীকে রান্নাবাড়ী লইয়া গিয়া সঞ্চিত ফেনজল খাওয়াইয়া আনে এবং বাছুরগুলিকে একটা ছোট কুঠুরীর মধ্যে আটকাইয়া রাখে। ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া আসে, গোয়ালঘরে সাঁজাল জ্বালান হয়, প্রচুর ধূম উঠিতে থাকে, রাখালেরা সাঁজালের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া অগ্নিতে হাত পা সেঁকিতে সেঁকিতে আপনাদিগের সুখদুঃখের গল্প বলিতে থাকে। কৃষাণেরা চণ্ডীমণ্ডপে একটা কম্বলের উপর বসিয়া মজুমদারদের ছোটকর্ত্তার অপেক্ষা করে; অবশেষে ছোট কর্ত্তা রামধন বাবু যখন আফিস হইতে ফিরিয়া তাঁহার চিরসঙ্গী সাদা ইজের, কালো চাপকান এবং একখান ধোপদস্ত ভাঁজ করা সাদা সরু চাদরের সহিত ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে পদক্ষেপ করেন, তখন সকলে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করে, তিনিও তাহাদিগকে

প্রত্যভিবাদন জানাইয়া এবং সহাস্যে তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

ক্রমে বহির্বাটীতে একটি অনুচ্চ তৈলাক্তলিপ্ত কাঠের দীপগাছার উপর একটা ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। রামধন বাবু কোঁচার টেরে শরীরটি আবৃত করিয়া একটি হুকা টানিতে টানিতে খড়ম পায়ে দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দর্শন দেন। তখন প্রভু ও ভৃত্যবর্গের মধ্যে নানাকথা চলিতে থাকে— কোন্ জমীতে কেমন চাস হইতেছে, লাঙ্গের জমীর অবস্থা কেমন, এবারকার চাষে লোকশান হইবে কি খরচটা পুষাইয়া যাইতে পারে, মরিচের আবাদে কিরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা এবং এ বৎসর তিল ভাল হইবে না, প্রায় সকলের ক্ষেতেই আচা লাগিয়াছে ইত্যাদি অসংখ্য রকমের কথার আলোচনা চলিতে থাকে ; সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি এবং হিসাব মত অসঙ্কুচিতভাবে স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যায়, এবং প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে যে কিছু রূঢ়তা, পদগত পার্থক্য কিম্বা ভেদাভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিতান্ত আত্মীয়, প্রিয়তম সুহৃদ বলিয়া মনে করে। কোন কোন কৃষাণ অন্যান্য লোকের ফসল অপেক্ষা তাহার প্রভুর ফসলের অবস্থা যে উৎকৃষ্ট তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার নজীর প্রয়োগ করে এবং প্রভুর মন কিছু প্রফুল্ল আছে বুঝিলেই তাহারা শীতবস্ত্র, নূতন পানাই কিম্বা কন্যার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে কিছু 'আগাম মাহিনা' পাইবার আরজ করে। ছোটকর্ত্তা সকলকেই অল্প বিস্তর সন্তুষ্ট করিয়া রাত্রি গভীর হইলে বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

ধরিতে গেলে রামধন মজুমদারই এখন বাড়ীরকর্ত্তা। গ্রামে এক মুনসেফী চৌকী আছে, তিনি সেখানে মুহুরীগিরি করেন, বাড়ীর চাষবাসের তত্ত্বাবধান করাও চলে। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণধন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানীর হাট লক্ষীপুরের নীলকুঠীর দেওয়ান এবং মধ্যম হারাধন স্বরূপপুরের জমীদার নীলকমল বাবুর সদর আমিন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকেন, পূজার সময় কিম্বা বৎসরের অন্য কোন উৎসব উপলক্ষে বড় কর্ত্তা ও মেজ কর্ত্তা বাড়ী আসিবার সময় নৌকা বোঝাই করিয়া কত রকম দ্রব্য সামগ্রী বাড়ী লইয়া আসেন। নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিবা মাত্র চারিদিকে টিটি পড়িয়া যায়, গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই জিনিষ দেখিতে নদীতীরে ছুটিয়া যায়। ইঁহাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি আছে ; কিন্তু বধূদিগের মধ্যে সেই স্নেহবন্ধনের সম্যক অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কৃষ্ণধনের পত্নী দামিনী ঠাকুরাণী কিছু পরুষভাষিণী, তাঁহার স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া যখন তখনই তাঁহার মুখে উচ্চ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে নানাপ্রকার কাল্পনিক ত্রুটির ছলনা করিয়া কনিষ্ঠ দেবর রামধনের প্রতি সময়ে সময়ে তিনি নানাপ্রকার কটুকাটব্যও বর্ষণ করিয়া থাকেন ; রামধন মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্থতা অনুভব করেন এবং তিনি সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন বলিয়াই মুখরা বড় বধূ যে তাঁহাকে অপরাধী মনে করিতেছেন ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ

করেন, কিন্তু পাছে কোন কথা প্রকাশ করিলে বড় দাদা মনে বেদনা পান এই ভয়ে নিজের মনোকষ্ট আত্মহৃদয়েই সংগুপ্ত রাখেন ; অবশেষে একবার পূজার সময় তিন ভাই একত্র হইলে রামধন কৃষ্ণধনকে বলিলেন "দাদা, আমি আর এ সংসারে কর্তৃত্ব করিতে পারি না, বড়ই দুরূহ ভার, আপনি এ ভার বড় বৌ কি অন্য কাহারো হাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে ছুটি দেন।"—বুদ্ধিমান কৃষ্ণধন ভ্রাতার মনোকষ্টের কারণ অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণপূর্ব্বক স্নেহমধুরস্বরে বলিলেন 'ভাই, নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকে না বুঝিয়া কত সময় কত অন্যায় কথা বলে, আমরা যদি তাহা সহ্য না করিব, আমরা যদি তাহাতে বিচলিত হইব তাহা হইলে সংসার টিকিবে কি করিয়া? আমাদের সেই ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া দেখ দেখি আমরা তিন ভাই মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছি, বাবার হৃদয়-বৃন্তে আমরা তিনটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম, মা বাবা আজ দুজনেই স্বর্গে গিয়াছেন, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি এস কাছাকাছি থাকি, পিতামাতার সেই স্বর্গীয় স্নেহের মধ্যে আর অভিশাপ আনিব না, ইহাতে শুধু আমাদের ক্ষতি নাই, বাড়ীর ছোট ছেলেগুলির মন হইতেও প্রীতির মূল শিথিল হইয়া পড়িবে। বৌরা ত পরস্পর বিবাদ করিবেই, তারা ত আর আমাদের মত আজন্মের স্নেহবন্ধনের মধ্যে বাড়িয়া উঠে নাই, আমাদের পরস্পরের ব্যথা তাহারা কিরূপে বুঝিবে?"—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথায় কনিষ্ঠের সমস্ত মনোবেদনা দূর হইয়া গেল। ইঁহাদের বিধবা ভগিনী কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী ; শ্বশুরকুলে কেহ নাই, সেই সংযতহৃদয়া পবিত্রচরিত্রা বিধবা ভ্রাতৃগণের সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দতা বিতরণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন ; সাংসারিক কর্ত্তব্য বড় গুরুতর তাই তাহা পালন করিতে তাঁহাকেও ভ্রাতৃজায়াগণের নিকট অনেক সময় রুক্ষবচন শুনিতে হয়, কিন্তু ভাইদের মুখ চাহিয়া পাছে তিনি অশ্রু মুছিলে তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে সকল সহ্য করেন, মনে অত্যন্ত কষ্ট হইলে মনে মনে বলেন "হে হরি, হে জগন্নাথ, ইহাদের সকলকে সুখী কর, আর আমাকে তোমার শ্রীচরণে টানিয়া লও।" কাত্যায়নী তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া অমঙ্গল ও অশান্তি হইতে সংসারটি ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন। বাড়ীর দাস দাসীরা তাঁহাকে যেমন ভয় করে তেমনি ভালবাসে ; পাছে তিনি মুখ ভার করেন এই ভয়ে গোয়ালকাড়ুনী সকালে সকালে আসিয়া গোয়ালঘর পরিষ্কার করিয়া যায়, ঝিরা অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ছড়া ঝাঁট দিয়া আঙ্গিনাখানি আয়নার মত তক্‌তকে করিয়া রাখে। তাহার পর বাড়ীতে যে কয়টা ধানের গোলা আছে তাহাদের ও তুলসী মন্দিরের সম্মুখভাগ গোল করিয়া নিকাইয়া দেয়। রৌদ্র উঠিলে কেহ আস্তাকুড়ে বসিয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করে, কেহ রান্নাঘর নিকাইতে বসে। কাত্যায়নী দেবী রাত্রি প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বে উঠিয়া বস্ত্রাদি ছাড়িয়া একখানি কুশাসনে বসিয়া মালা জপিতে আরম্ভ করেন, শেষে প্রভাত হইবামাত্র ফুলবাগান হইতে কতকগুলি পুষ্পচয়ন করিয়া কলাপাতে মুড়িয়া তাহার কতকগুলি গ্রাম্যবিগ্রহকে উপহার পাঠাইয়া

দেন, এবং নিজে পূজা করিবেন বলিয়া কতকগুলি একখানি পরিষ্কার পিতলের রেকাবীতে করিয়া একটি ভাল জায়গায় রাখিয়া দেন।

আজ অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচই তারিখ, গ্রামের প্রধান পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় পাঁজি দেখিয়া বলিয়াছেন আজ নবান্নের অতি প্রশস্ত দিন; তাই গোবিন্দপুরে ঘরে ঘরে আজ নবান্ন হইতেছে, সেই জন্য গ্রামের মধ্যে ভারি একটা আনন্দ কলরব পড়িয়া গিয়াছে। আজ পাঠশালা বন্ধ, গুরুমহাশয় আজ ভিন্নগ্রামে যজমানবাড়ীতে নবান্ন করাইতে যাইবেন, তাই পাঠশালের পোড়োরা আজ মনের আনন্দ চাপা দিতে না পারিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে চঞ্চলভাবে বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকল বাড়ীতেই নবান্নের উদ্যোগ চলিতেছে কিন্তু মজুমদারবাড়ীর আয়োজনই কিছু অতিরিক্ত, নবান্ন করিবার জন্য বড় কর্ত্তা ও মেজ কর্ত্তা চাকরা স্থান হইতে বাড়া আসিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা তিন ভায়ে বালাপোষ গায়ে দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন; রাখাল কৃষাণরা আসিয়া প্রাঙ্গনস্থিত কাঠের গুড়ির উপর বসিয়া রোদ পোহাইতে লাগিল, পাড়ার দুই পাঁচজন আত্মীয় প্রতিবেশী আসিয়া কর্ত্তাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিতে লাগিল। প্রভাতের রৌদ্র বকুলগাছের নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া মজুমদারদের চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িয়াছে, নবমুকুলিত শজিনাগাছের একটা উচু ডালে বসিয়া একটা চিল রৌদ্র পোহাইতেছে, কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা ভদ্রলোক মোটা চাদর গায়ে দিয়া সতরঞ্চির উপর বসিয়া সশব্দে তামাক টানিতেছে, সেকালের নবান্নের গল্প চলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতি উথলিয়া উঠিতেছে। এ প্রভাতে যেন কাহারো কোনকর্ম্ম নাই, শুধু কয়েকখানি খালি গরুরগাড়ী হট্‌হট্ শব্দ করিতে করিতে সম্মুখের পাকা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর পাঁচ সাতজন মেঠে মজুর কোদাল লইয়া ঝুড়ি ঘাড়ে করিয়া গল্প করিতে করিতে কাহার বাড়ীতে মাটীর প্রাচীর গাঁথিতে যাইতেছে।

আজ আর রাখাল কৃষাণদের মাঠে যাইতে হইল না, তাহারা মনিব বাড়ীতে নবান্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইল। বাড়ীর বাগানটা বড় জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে, পূজার পর আর সে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় নাই বলিয়া তিন ভায়ে কয়েকজন কৃষাণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাগানে প্রবেশ করিলেন। শাণিত দাউলীর আঘাতে বহুসংখ্যক আগাছার ধ্বংস হইল। গোবিন্দপুরে মজুমদারদের কলাবাগান বিশেষ প্রসিদ্ধ; প্রকাণ্ড দুই কাঁদি মর্ত্তমান কলা পুষ্ট হইয়া পাকিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, কলার ভারে গাছ দুটি হেলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগের গায়ে বাঁশের ঠেকো লাগাইয়া তাহাদিগকে সোজা করিয়া রাখা হইয়াছে। কলা কাঁদির উপর রাত্রে বাদুড় পড়িয়া সর্ব্বোচ্চ ছড়ার পাঁচ সাতটা কলা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে, অতএব তাহা আর গাছে রাখা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া কলা দুই কাঁদি কাটিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। কাঁদিদ্বয় অঙ্গন মধ্যে নীত হইলে তাহারা অবিলম্বে রজ্জুবদ্ধ হইয়া বৈঠকখানার কড়িকাঠের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, পাকিলে তাহা নামাইয়া পরিবার

বর্গের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। কলাগাছ দুটির মধ্যে একটিকে কাটিয়া তাহার বাসনা ও পেটকো ছাড়াইয়া একজন কৃষাণ থোড়গুলি রান্নাঘরে দিয়া আসিল, একটি গাছ আস্ত রাখা হইল, এই থোড় নিঃশেষিত হইলে সে গাছটি কাটা হইবে।

আজ নবান্নের দিনে পাথরী গাইয়ের নূতন দোহাপাতা আরম্ভ হইবে। পাথরী বড় দুষ্ট গাই, তাহার মা ভাঁড়ভাঙ্গী দুই বেলা ছয় সের দুধ দিত, পাথরী সবে একুশ দিন মাত্র বিয়াইয়াছে, সে কেমন দুধ দেয় তাহা দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে। দোহাল হরি ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে গোয়ালবাড়ীতে আসিলেন। হরি ঘোষ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া শুনিল গরু দুহিবার ভাঁড়টা কালরাত্রে উননের মুখে তাতাইতে দেওয়া হয় নাই, সে ভাঁড়ে করিয়া গরু দুহিলে পাছে দুধ নঠাইয়া যায় এই আশঙ্কায় পিসিমার পরামর্শে সে একটা পরিষ্কার পিতলের ঘটি লইয়া গরু দুহিতে গেল। বাছুর বাঁধিয়া সে দুইতে প্রবৃত্ত হইবে কিন্তু পাথরী কিছুতে তাহাকে কাছে ভিড়িতে দিল না, বাঁটে হাত দিতে না দিতে কখন সে লম্ফ ঝম্ফ করে, কখন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে ছাঁদন দিয়া তাহার পা বাঁধিয়া দেওয়া হইল, এই ছাঁদন দড়ীর তৈয়েরী নহে, গোরুর গোফালি (লেজের চুল) কাটিয়া কাটিয়া রাখাল কৃষাণেরা তাহা পাকাইয়া এই ছাঁদন দড়ী প্রস্তুত করে। পা ছাঁদা হইলে পাথরী আর অস্থিরতা প্রকাশ করিতে পারিল না, নতমুখে বাছুরের গা চাটিতে লাগিল। পাথরীকে দুহিতেছে শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা অনেকে কৌতুকভরে দরজার ফাঁক দিয়া গোয়ালবাড়ীর দিকে উঁকি মারিতে লাগিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া গোয়ালের অনতিদূরে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রামধন বাবুর ছোট ছেলে অজয়কুমার তাহার জেঠা মহাশয়দের কাছে ভদ্রভাবে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায়ে নীলাম্বরী কাপড়খানি পরিয়া লইবার উমেদারীতে তাহার দিদির কাছে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কৃতকার্য্য না হইয়া কাপড়খানি কক্ষে লইয়া সেও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। নবজাত শুভ্র বাছুরটিকে গরুর সম্মুখের পায়ের সঙ্গে বাঁধা দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল, তাহার শিশুনেত্রের চঞ্চল দৃষ্টি পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া দুই শূন্য হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল, কাপড়খানি মাটিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া আধ আধ স্বরে বলিল "বাবা হরে পাকলিকে দুচ্ছে, চ্যাঁ চূ গবল গুঁ, আমি বাচুল নোব।" বাবা বলিলেন "এখন বাছুর নেয়না, এখন নিলে পাথরী মারবে।" বালক কাল্পনিক ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, দুই ক্ষুদ্র হস্তে বাপকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "গয়ু মালবে. কোয়ে কল," বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতা তাহাকে কোলে লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন "না মারবে না, দুধ দেবে, দুধ খাবে না ?" দুধ খাওয়ার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না "দুদ কুকা কাবে" বলিয়া সে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অত্যন্ত নির্ভয়ে গোদোহন দেখিতে লাগিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার কাপড়ের কথা মনে পড়িল, দেখিল তাহা দিদি শুভা কাপড়খানি কুড়াইয়া

লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—অমনি সুর ধরিল "আমি কাপল পলবো।" পিতা তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া কাপড় পরাইতে লাগিলেন।

এমন সময় তাহার জ্যেঠতুতো বোন লীলা আসিয়া ডাকিল "অজা-ভাই, ক্ষেতা নার়-কোল পাড়চে, নিবি আয়।" আর কোঁচা গুঁজিবার অবসর হইল না, সকলে মহাকলরব করিতে করিতে বাড়ীর প্রান্তবর্ত্তী নারিকেলবাগানের দিকে ছুটিয়া চলিল। ক্ষেতা ডাব গাছে উঠিতে ভারি ওস্তাদ, দশ মিনিটের মধ্যে একরাশি নারিকেল পাড়িয়া ফেলিল, ছেলে মেয়েরা সকলেই এক একটা হাতে লইয়া মায়ের কাছে চলিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরে ভাঙ্গা ছাতি মাথায় দিয়া একজোড়া শততালিবিশিষ্ট ছেঁড়া চটিতে ধূলিধূসরিত ফাটা বিশ্রী চরণযুগলের সম্মান কথঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া পেয়ারী আচার্য্য মজুমদারবাড়ীতে প্রবেশ করিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পুরুষ, মাথার সম্মুখভাগটা যত্নপূর্ব্বক কামানো, হস্তস্থিত ছাতার দামাটে একখানি গামছা বাঁধা, স্নানের সময় সেখানি গামছা, বাজার করিবার সময় সেখানি মাছ তরকারী বাঁধিবার নেকড়া। পেয়ারী আচার্য্যকে গোবিন্দ পুরে কে না জানে?—হরিনাম কীর্ত্তন না করিলেও পেয়ারী সর্ব্বদাই "তৃণাদপিসুনীচ" এবং "তরোরিব সহিষ্ণু"; কপালে দীর্ঘ তিলক কাটা, গলায় কাঠের মোটা তিনকণ্ঠি মালা, দাড়ী গোঁপ কামান; সর্ব্বদা হাস্য-চ্ছটা-লাঞ্ছিত উদ্‌ঘাটিত দন্ত-শ্রেণী-শোভিত মুখখানিতে কোন প্রকার রাগ এবং অভিমানের ভাব সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। গোবিন্দপুরের সমস্ত লোকের ঠিকুজি কুষ্ঠি পেয়ারি স্বহস্তে প্রস্তুত করে; ঠিকুজি কুষ্ঠিতে ছবি কাটিতে, তুলটের কাগজের রঙ্গটি ঘোরাল করিতে, মোটা মোটা করিয়া মুক্তার মত লিখিতে পেয়ারীর ন্যায় কাহারো অভিজ্ঞতা নাই। পেয়ারী যাহারই ঠিকুজি কিম্বা কুষ্ঠি প্রস্তুত করুক না কেন, ছেলে মেয়ে যে লগ্নেই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার গণনার কৌশল এমনই আশ্চর্য্য যে সকল বালক বালি-কার ভবিষ্যৎই সে অসম্ভব উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করে। তাহার দৈববাণীতে কাহাকেও মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইতে হয় না। নূতন ঠিকুজি কুষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল শুনাইবার সময় তাহার স্বরচিত সংস্কৃতে সুর করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়া যায় "এই শিশু মহা ধার্ম্মিক পরম বিষ্ণু-পরায়ণ, অত্যন্ত দাতা হইবে, এবং শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিবে; এই সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হইতে পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল এবং বংশ ধন্য হইবে, ইত্যাদি।" তাহার পর ধান দূর্ব্বা সহযোগে কুষ্ঠিখানি বন্ধ করিয়া রাখে; ঠিকুজি কুষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া পেয়ারীর প্রাপ্তি নিতান্ত মন্দ হয় না; এতদ্ভিন্ন কোন বাড়ীতে অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অথবা শ্রাদ্ধ যাহাই উপস্থিত হউক, পেয়ারী সকলের আগে সেখানে হাজির হয় এবং কলার পেটকো কাটিয়া ষোড়শ মাতৃকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বসে। আজ নবান্ন উপলক্ষে এক আধটা ভালরকম সিধে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ মজুমদারবাড়ীর বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তা নবান্ন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছেন, টাকাটা সিকেটা কিছু প্রাপ্তি হওয়াও অসম্ভব নহে ভাবিয়া পেয়ারী যথাসময়ে মজুমদার বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দিল, এবং বড়কর্ত্তা ও মেজকর্ত্তাকে দেখিয়া সস্মিত মুখে

বলিল "প্রণাম হই দাদা, কবে বাড়ী আসা হ'লো, প্রাণগতিক সব মঙ্গলতো, বৈষয়িক সংবাদও অবশ্য ভাল। আর দাদা, আপনারাই এ প্রদেশের প্রধান বেক্তি, আপনারা যদি মধ্যে মধ্যে বাড়ী না আস্‌বেন ত দেশের গুমোর থাকে কিসে?" এইরূপ আলাপ আপ্যায়িত শেষ হইলে আচার্য্য ঠাকুর একখান ছুরী ও একটা কলাগাছ লইয়া বসিল। তাহার পর কাজ শেষ হইলে বলিল 'দাদা, আজ নবান্ন আছে একবার বাজারটা ঘুরে আসি, আর সিধেটা যেন যাবার সময় পাই, আপনাদের আশ্রয়েই বাস কচ্ছি, ইত্যাদি।"

আজ কিছু সকালেই বাজার বসিয়াছে; নবান্ন উপলক্ষে আজ বাজারে আখ, সাঁক-আলু, লাল সাঁকারকুণ্ড আলু প্রভৃতি নানারকম ফলফুলারি আমদানী হইয়াছে। ক্ষেতা চাকর বাজার হইতে ধামা বোঝাই করিয়া ফলফুলারি ও তরকারী লইয়া আসিল। কাত্যায়নী ঠাকুরাণী সকালে সকালে স্নান করিয়া আসিয়া প্রথমে নূতন গরুর দুধ প্রায় একপোয়া গঙ্গাকে দিবার জন্য ঘটিতে করিয়া নদীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর আর আধসের দুধ, কতকগুলি ফুল, ফল, নূতন আতপ চাউল, চিনি, কাঁচাগোল্লা প্রভৃতি জিনিষ গ্রাম্যবিগ্রহ গোপালজীর মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে নিজের বাড়ীর নবান্নের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। আচার্য্যকর্ত্তিত কলার পেটকোতে তিনি নবান্নের জন্য নূতন প্রস্তুত আতপ চাউল মুষ্টি পরিমাণে স্থাপন করিয়া একটা বড় পাত্রে কতকগুলি ফলমূল, আখ, আলু, কলা, মূলো, নারিকেল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখিলেন, এবং একটা বড় পাথরের খোরায় একখোরা কাঁচা দুধ, একটা ক্ষেত্তুরে বাটীতে একবাটী নূতন খেজুরে গুড়, ও বড় পিতলের রেকাবে বাতাশা, কাঁচাগোল্লা, গুড়ে মণ্ডা প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া দিলেন; ছেলে মেয়েরা অদূরে বসিয়া সদ্যস্নাতা, সিক্তকেশা, শুভ্রবেশিনী পিসিমার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

নবান্নের যোগাড় করিয়া কাত্যায়নী কৃষ্ণধনকে বলিলেন 'দাদা সকালে স্নান করে এস, উদ্যোগত সকলই হয়েছে এখন পুরুত খুড়ো এলেই হয়, এত খানি বেলা হয়েছে ছেলে মেয়েরা মুখে জলটুকু দিতে পায় নি, বাছাদের নাড়ী পিতিয়ে গেল।" কৃষ্ণধন ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তৈলসিক্ত বালকবালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নদীতে চলিলেন, কতকগুলি শুকনো কাপড় লইয়া ক্ষেতা খানসামা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

স্নান করিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন পুরোহিত চূড়ামণি ঠাকুর হাত পা ধুইয়া ভিজে গামছা কাঁধে কুশাসনের উপর বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি একখানি পট্টবস্ত্র পড়িয়া দোবজাতে সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া কৃষ্ণধন নবান্ন করিতে বসিলেন। প্রথমে দেবগণ ও স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণকে সেই নূতন আতপান্ন ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়া অবশেষে তিনি চাউল, দুধ, গুড়, ফলমূল সমস্ত সেই প্রকাণ্ড পাথরের খোরাটাতে ঢালিয়া মাখিয়া লইলেন।

তখন ছেলেরা কলাপাতে একটু একটু নবান্ন লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিল, কেহ ছাদের উপর কাক শালিখ প্রভৃতি পাখীর জন্য তাহা রাখিয়া আসিল, কেহ ঢেঁকির ঘরে ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে দিতে গেল, মাছেদের নবান্ন খাওয়াইতে একটি ছেলে নদীতে চলিল,

একজন গোরু বাছুরের জন্য খানিকটে গোয়ালঘরে লইয়া গেল, কেহ শৃগালের জন্য চাট্টি চাউল ও খান দুই-আখ এবং আলু লইয়া বাঁশঝাড়ে আশ্‌শ্যাওড়া জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া আসিল। সকল জন্তুকে দেওয়া হইলে পর সকলে মহাসমারোহে দুগ্ধ গুড় মিশ্রিত চাউল খাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর বৌ ঝিরা এক এক বাটী চাউল লইয়া রান্না ঘরের বারান্দায় উননের ধোঁয়ার মধ্যে, ভিজে চুলে, পা মেলিয়া বসিয়া সিক্ত নবতণ্ডুলরাশি নত মুখে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। রাখাল কৃষাণ সকলেরই নবান্ন হইয়া গেল, এমন কি দুই চারিজন ভিখারীও আজিকার এই উৎসবান্নের অংশ হইতে বঞ্চিত হইল না। যে সকল ছেলেপিলে জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছে, এবং দুধ ও বার্লি ভিন্ন ডাক্তার যাহাদের অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করে নাই তাহারা পর্য্যন্ত দুটি চাউল মুখে দিয়া নিয়ম রক্ষা করিল।

গ্রাম্যদেবতা গোপালের বাড়ীতে আজ নবান্নের ভারি আয়োজন। যে সকল গরীব দুঃখী লোক ঘরে নবান্নের যোগাড় করিতে পারে নাই কিম্বা যাহাদের পরিবারে অশৌচ হওয়াতে নবান্ন হইল না, তাহারা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আনাইয়া সপরিবারে তাহাই মুখে দিল।

আজ সকল বাড়ীতেই ধূমধামের সঙ্গে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হইয়াছে, পাঁচ তরকারী ভাত, ভাজা, বড়া, গুড়অম্বল পায়েশ, আজ কিছুই বাদ যাইবার যো নাই। গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা আহারাদির পর হুকা টানিতে টানিতে দাবা ও পাশা খেলিতে বসিয়া গিয়াছেন, গড় গড় করিয়া হুকা ডাকিতেছে, কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে, 'কিস্তী,' 'কচে বার' প্রভৃতি শব্দের বিরাম নাই, যুবকেরা সশব্দে তাস পিটিতেছে। ছেলেরা সমস্ত দুপুরটা বাড়ীতে বাড়ীতে, চিলে কোটার ছাদে, অন্দরের বাগানে, গোয়ালঘরের অন্তরালে লুকোচুরী খেলা শেষ করিয়া বৈকালে দত্তবাগানে দলে দলে আসিয়া জুটিল। একদল 'চামচু' খেলিতে লাগিল, একজন বুড়ী হইয়া বসিল, আর একজন তাহার মাথা ধরিয়া তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল, বিপক্ষ দলের একটি ছেলে একদমে 'চু' করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সকলকে তাড়া করিয়া ঘুরিতে লাগিল, যে ছেলেটি মাথা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মরিবার ভয়ে সেও একদিকে পালাইয়া গেল, বুড়ী ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল নিকটে তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই, উঠিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের 'কোটে' পলাইয়া গেল, আর তাহার দলস্থ সকলে বিজয়োল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল।

একদল দাণ্ডাগুলি লইয়া মাতামাতি আরম্ভ করিয়াছে, 'গুবা'র গুলিতে দাণ্ডার আঘাত পড়িতেছে, আহতগুলি বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া চলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠিতেছে "নেই আনকাট্টা নেই হ্যাং"। দৈবাৎ গুলি গিয়া আমগাছের পাতার মধ্যে বাধিতেছে আর দাণ্ডা-হস্ত ক্রীড়ামগ্ন বালক হাঁকিতেছে "নেই ঝোড়োল," অর্থাৎ ঝোড়ে বাধিয়াছে, সেগুলি ধরিলে কোন ফল নাই।

অপেক্ষাকৃত বড় বড় একদল ছেলে "হাডুডুডু" খেলার আয়োজন করিতে লাগিল,

একটু তফাতে ঘাসের উপর দুই 'মূল খেঁড়ু' বসিয়া গিয়াছে, দুইজন করিয়া ছেলে একটু দূরে যাইয়া কল্পিত নাম পাতাইয়া আসিতেছে এবং সহাস্যে মূল খেঁড়ুদের জিজ্ঞাসা করিতেছে "কে নেবেরে হীরেমন কে নেবেরে ময়না।" অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া এবং উভয়ের কৌতুকোদ্দীপ্ত চক্ষু ও হাস্য-তরঙ্গায়িত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া 'মূলখেঁড়ু' ডাকিতেছে "আয়রে আমার হীরেমন।" যাহাকে সে চায়, দৈবক্রমে সে "হীরেমন" হইলে খেলোয়াড়দের মধ্যে তুমুল হাস্যধ্বনি উচ্ছলিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে হর্ষ-কলরব এবং উৎসাহের সীমা নাই। নদীতীরবর্ত্তী ষষ্ঠীতলায় খোলামাঠে রাখাল কৃষাণ ও মজুরেরা সমবেত হইয়াছে, আজ তাহাদের বিশ্রামবার, বৎসরকার দিন বলিয়া কেহ কাজে যায় নাই; তাহাদের মধ্যে কোন দুইজন নালামো করিতেছে, কেহ কেহ লাঠি খেলিতেছে, তিন চারিজনে বাজি রাখিয়া একটা লক্ষ্য স্থানে আগে পৌঁছিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছে; আজ ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর গ্রাম আনন্দে পরিপূর্ণ।

ক্রমে যখন সায়ংসূর্য্য নদীর পশ্চিমে বহুদূরবর্ত্তী আম কাঁঠালের বাগানের অন্তরালে অস্ত গেল, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ এবং বনে বনে খদ্যোতের ক্ষীণ আলো জ্বলিয়া উঠিল, এবং পল্লীরমণীগণ নদীতে গা ধুইয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া হেলিয়া দুলিয়া গল্প করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কৌতুক হাস্যে সন্ধ্যান্ধকারবেষ্টিত ঝিল্লিধ্বনিমুখর বনপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া গৃহে ফিরিল, বায়সের দল তীব্রস্বরে 'কা' 'কা' করিয়া ডাকিয়া দ্রুতপক্ষে নীড়লক্ষ্যে ফিরিতে লাগিল, বাদুড়েরা দিবসের আশ্রয় নিবিড়পত্র তেঁতুলশাখা কিম্বা বাঁশঝাড় ছাড়িয়া আহার অন্বেষণে নিঃশব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া চলিল ও নেশাখোর বাউলের দল বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরের পাশে একটা গাঁজার আড্ডায় বসিয়া ডুগী বাজাইয়া "বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে" অন্তিম কালের এই গান জুড়িয়া ঐহিক জীবনের নশ্বরতার কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল তখন সকলে ক্ষীণদেহে ধীরে ধীরে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আক্ষেপ।

কেন তুমি হয়েছিলে, প্রিয়া,
অতুলনা সুন্দরী এমন ?
কেন তুমি পরিয়া এসেছ
স্বভাবের শত আভরণ ?
আমি যে তোমারে ভালবাসি,
তাহা, তুমি সুন্দরী বলিয়া—
অবিচারে এ কথা কেহ ত
নাহি বলে অপবাদ দিয়া ?
আহা, তুমি হইতে গো যদি
রূপহীন, ব্যাধিত, বিকল,—
আর, আমি বাদশাহ-বলে
শাসিতাম সর্ব্ব ধরাতল,
তবুও তোমারে সখি আমি
একমাত্র করিতাম সার ;
রাখিতাম হৃদয়ে করিয়া
ফেলে দিয়ে কোহিনূর ছার !
আমার কবিতা-মন্দাকিনী
শত লক্ষ অযুত ধারায়
রাত্রিদিন বহিয়া বহিয়া
তব নামে প্লাবিত ধরায়।
প্রহেলিকা ভাবিত মানুষে
দেখিয়া আমার আচরণ ;
জগতের রূপসীগণের
মুখচন্দ্রে লাগিত গ্রহণ।

পুর্শী জাতি।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে পুর্শী নামে এক প্রাচীন অসভ্য জাতি আছে। ইহাদের ইতিবৃত্ত অতীব কৌতুককর। ইহারা যে ভারতের আদিম অনার্য্য জাতিদিগের অন্যতম শাখা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের ধর্ম্মটা কি তাহা সহজে বুঝা যায় না কিন্তু ইহারা এক্ষণে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। গোমাংস ভিন্ন ইহারা সকল প্রকার মাংসই ভক্ষণ করে; সর্প, শূকর, বৃশ্চিক, ভেক, মূষিক, মুর্গী ইত্যাদি অম্লানবদনে ইহারা আহার করিয়া থাকে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত, এখন মাংস পাক করিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা বনে ও পাহাড়ে লুকাইয়া থাকিত, এখন গ্রামে ও নগরে আসিয়া বাস করিতেছে। পুর্শীরা দেখিতে পুষ্ট, সবল, দীর্ঘাকার, উন্নতললাট এবং সুশ্রী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী; এক একটা যুবতী স্ত্রীলোকের এমন রূপ যে, অনেক ইংরাজ এবং য়িহুদী রমনী লজ্জায় অবনতবদনা হইয়া যায়। পুর্শীরা সাঁওতালদিগের ন্যায় সত্যবাদী, তীর ধনু ব্যবহার করিতে খুব পটু, শিকারে ক্ষিপ্রহস্ত, ঘোড়ায় চড়িতে বা দৌড়িতে বিশেষ দক্ষ এবং প্রতিহিংসা লইতে বোধ হয় পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রগণ্য। পঞ্চবিংশ বৎসরের পুরাতন ক্রোধটিও তাহারা সহজে ভুলিতে পারে না; শত্রুকে যখনই যে অবস্থায় প্রাপ্ত হয়, তদ্দণ্ডেই বিনাশ করে। গোধূম অপেক্ষা চাউলে ইহারা বড় সন্তুষ্ট থাকে এবং নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণে বড়ই প্রিয়। সহজে ইহারা কাহারও সহিত কলহ করে না, সহজে ক্রোধান্ধ হয় না কিন্তু রাগিলে আর রক্ষা নাই, ক্রোধসম্বরণ করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে, এই জন্য সাবধানে ইহাদের সহিত মিলিতে হয়! ইহারা কৃষিকার্য্য করে না, কৃষিকার্য্য করা ইহাদের সামাজিক নিয়মবিরুদ্ধ। মৎস্য ধরিয়া তাহা বিক্রয় করে অথবা বনের কাষ্ঠ বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুর্শীরা বনের নানাপ্রকার তরুলতার গুণ জানে, অনেক দুঃসাধ্য রোগের ঔষধ তাহারা বন হইতে আনিয়া দেয়। কোনও কোনও সময়ে অরণ্য হইতে নানাপ্রকারের ফুল আনিয়া তাহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিয়া লয়, কখনও বা গহন কানন হইতে সুস্বাদু মধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের জন্য প্রসিদ্ধ, ইহাদের স্ত্রীসমাজে ব্যভিচার বা ব্যভিচারিণী নাই। কোনও পুর্শী স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে শুনিলে ইহারা তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে অথবা তরবারী আঘাতে মারিয়া ফেলে কিম্বা প্রাণহত্যার সুবিধা না পাইলে চাঁদা তুলিয়া তাহার সাহায্য করে কিন্তু বেশ্যা হইতে দেয় না। আমাদের দেশের অনেক সমাজসংস্কারক ও সুনীতিপ্রচারক মহাশয়দিগের পক্ষে পুর্শী স্ত্রীচরিত্র একটা সুদৃষ্টান্ত বলিয়া পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমি একবার একটা পুর্শীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তোমাদের মধ্যে বেশ্যা আছে কি?" লোকটা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "আমরা কি লেখাপড়া জানি যে, আমাদের স্ত্রীসমাজে বেশ্যা পাওয়া যাইবে?" কথাটা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলাম। বাস্তবিকই

পুর্শীরা লেখা পড়া জানে না, শিক্ষার বিস্তার এখনও ইহাদের মধ্যে হয় নাই। খৃষ্টীয় পাদ্রীরা কতকগুলি পুর্শী স্ত্রী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দী লেখা পড়া শিখাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের সমাজে লেখা পড়ার চর্চ্চা বিন্দুবিসর্গও নাই। পুর্শীদিগের স্মরণশক্তি অতি প্রখর এবং বংশী বাজাইতে ইহারা বিশেষ পটু।

এইবারে ইহাদের অত্যদ্ভুত বিবাহের কথা বলা যাইতেছে। বলা বাহুল্য পুর্শীদিগের সংখ্যা এখন খুব কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অপরাপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়, কিন্তু অতি পুরাতন জাতি বলিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটে অতীব প্রয়োজনীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রভৃতি অষ্টপ্রকারের বিবাহবিধি লিখিয়াছেন। পুর্শীদিগের বিবাহ এই আটপ্রকার শাস্ত্রীয় বিবাহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাদের কন্যার অভিভাবক এবং পুত্রের অভিভাবকের মধ্যে বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেলে, একমাস পূর্ব্বে পরস্পরের মধ্যে পশু যৌতুক অথবা পক্ষী যৌতুক প্রেরিত হয়, অর্থাৎ ছাগ, মেষ, মহিষ, মুর্গী প্রভৃতি উপহার দেওয়া হইয়া থাকে। বিবাহের এক সপ্তাহ কাল পূর্ব্ব হইতে মদিরা সংগৃহীত হয় এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা মাংস সহকারে মদিরা পান করিয়া নৃত্য করে। বিবাহের দুই দিন অগ্রে পুত্র পক্ষের লোকেরা কন্যা পক্ষের লোকের সহিত যোগ দেয় এবং তাহাদের বাটীতে আসিয়া অবস্থান করে। একদিন পূর্ব্বে কন্যাটি একটি সুরঙ্গ (মৃত্তিকার নীচে গুহা) মধ্যে বাস করে, গুহার মুখটি কদলী পত্র ও নানাপ্রকার পুষ্পমালা দ্বারা আবৃত হয়। সমস্ত দিন ও রাত্রি কন্যাকে কেহ দেখিতে পায় না। ঐ দিবস পুত্রটি (বর) কোনও উচ্চস্থানে বা গৃহের ছাদে একাকী অবস্থান করে। বিবাহ রাত্রে হয় না, মধ্যাহ্নে হইয়া থাকে। বিবাহের দিনে কন্যাকে গুহা হইতে এবং পাত্রকে ছাদ হইতে নামাইয়া আনা হয় এবং বরকে স্ত্রীলোকের বেশে ও কন্যাকে পুরুষের বেশে সজ্জিতা করান হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের কার্য্য শেষ হইলে, অগ্নি জ্বালান হয়, ঐ অগ্নির দক্ষিণ দিকে পাত্র এবং বামদিকে পাত্রী বসে। তদনন্তর সূর্য্য পূজা হয়, উহার মন্ত্র এইরূপ—"হো দোবা লাকোড়্ কৌছি ইদোলা থোড়ী মগারে স্থয়া।" ইত্যাদি। সূর্য্যপূজার পরে, পুর্শী ভিন্ন কেহ সে স্থানে আসিতে বা থাকিতে পারে না। গোপনে কি তাহারা করে তাহা জানা যায় না। সন্ধ্যার সময়ে বলিয়া বেড়ায়, বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে নৃত্য গীত হয় এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ে হাত ধরিয়া নাচে। তদনন্তর কন্যাটিকে লইয়া তাহার পিতা চলিয়া যায়, কন্যা এক বৎসর পর্য্যন্ত শ্বশুরালয় যাইতে পারে না। এই এক বৎসরের খরচা কন্যার শ্বশুর কন্যাকে অথবা তাহার পিতা বা অভিভাবককে পাঠাইয়া দেয়। যদি কোনও মাসে খরচার টাকা না আইসে তাহা হইলে কন্যা ভিক্ষা করিয়া খাইবে কিন্তু পিতার অন্ন খাইবে না। পুর্শীদের কন্যাদের গড়ে ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, পুত্রদের গড়ে ১৯ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। তাহারা বিবাহকে 'পুনী' বলে। যে কোনও মাসে বা যে কোনও তারিখে বিবাহ হউক না,

শুক্রবারে বিবাহ হওয়া চাই। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি বা দলের প্রধান কর্ত্তা পুরোহিতের কার্য্য করে। পুর্শীরা হিন্দুমন্দিরে যাইয়া দেবতাদিও দর্শন করিয়া থাকে এবং কালী দুর্গা প্রভৃতিকে দেখিলে মস্তক অবনত করে। পুর্শী স্ত্রীলোক মরিলে তাহার মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়, বালক মরিলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দেয়, বয়স্ক পুরুষ মরিলে মৃতদেহ দাহ করে। পুর্শী পুরুষদিগের নাম, সাধারণতঃ এইরূপ হয়ঃ—নারানা, কিপ্পা, হদ্দু, গোজ্লা, বুটিয়া, সরিকা, ভট্টু, মোহোলু, পোৎরী, পর্ম্মা, বগ্গা, টীয়াবু, ইত্যাদি।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিলে পুর্শীরা উত্তম সিপাহী হইতে পারে এবং যুদ্ধ সময়ে রাজ্যের অনেক হিতকর কর্ম্ম করিতে পারে। পুর্শীরা খুব পরিশ্রমীও বটে, সাহস কম নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও বেশ আছে। দোষের মধ্যে ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসভ্য প্রথাগুলি সহজে ছাড়িতে চায় না। পুর্শীর সঙ্গে মিত্রতা করিতে হইলে খুব সাবধানী হইতে হয়, ইহাদের প্রকৃতি খুব চঞ্চল। ইহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে পরম মিত্র হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধুর গলদেশে তরবারী লাগাইয়া দেয়। কবিবর বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"কানুর পিরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ॥"

পুর্শীর স্বভাব এবং পুর্শীর মিত্রতা ঠিক তাহাই। আমার পুর্শী ভৃত্য বলিত "সাপকে বিশ্বাস হয়, পুর্শীকে বিশ্বাস হয় না।"

A NARROW ESCAPE.

অথবা

দগ্ধ কচু।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন রাঙ্গাদিদির ও শালিগণের ও শালাজগণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে আমি তিন ঘণ্টার জন্য অব্যাহতি পাইলাম, তখন আমি সটান্ অন্দরমহল ত্যাগ করিয়া, একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও আমার শ্যালকগণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। টেবিলের উপর ল্যাম্প জ্বালিয়া, চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া, আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শালিপতি ভাই শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু নিবিষ্টচিত্তে আইনের পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিয়া shake hand করিলেন ও সাগ্রহে বলিলেন "Hallo, Meghnad Babu যে! কেমন আছ? কখন এলে? Well met।"

আমি যথোচিত অভিবাদন করিয়া বলিলাম "Thank you, ভাল আছি। এসেছি অনেকক্ষণ হ'ল। বৈঠকে কেউ ছিল না ব'লে আমি ভেতরে রাঙ্গাদিদির মহলে সময় কাটাচ্ছিলাম।"

হরনাথ বাবু সহাস্যে বলিলেন "ওঃ বোঝা গেছে! Labyrinth of Beautiesএ সেঁদিয়ে বাইরে আস্‌বার পথ খুঁজে পাচ্ছিলে না! কোথায় লাগে এর কাছে লক্ষ্ণৌর মচ্ছিভবনের গোলকধাঁধা!"

আমি বলিলাম "ঠিক্ বলেছেন দাদা; আপনার উপমাটি খুব্ মানানসই হয়েছে। কিন্তু এই গোলোকধাঁধার মধ্যে স্থানে স্থানে মৌমাছির চাক্ আছে। শুধু মধু ও গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ শব্দ থাক্‌লে ক্ষতি ছিল না কিন্তু এরা যে কখন কখন দংশন ও করে থাকে।"

হরনাথ বাবু সরোষে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "বল কি হে মেঘনাদ? মধু? ভ্রমর? গুণ্ গুণ্? Nonsense! No such thing! These girls have built a veritable nest of hornets! বোল্‌তার চাক্!—বোল্‌তার চাক!"

আমি হরনাথ বাবুর সক্রোধ মুখভঙ্গি দেখিয়া ও রোষব্যঞ্জক বাক্যগুলি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার দশমহাবিদ্যারা ইঁহাকে যার পর নাই উৎপীড়িত করিয়াছে। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে দাদা? কি হয়েছে? কাণ্ডকারখানাটা কি? এত রাগ কেন?"

হরনাথ দাদা বলিলেন "অনেকে সেক্সপীয়রের নিন্দা করে থাকে যে তাঁর পক্ষে Taming of the Shrew লেখা অন্যায় হয়েছে—এ নাটকটি কবির সহৃদয়তার অনুপযুক্ত। আমিও পূর্ব্বে এই মনে কর্‌তাম! কিন্তু সংসারে ঠেকে শিখে আমি মত পরিবর্ত্তন কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। কি বল্‌ব মেঘনাদ বাবু? আমরা এ বাড়ির জামাই। যদি এ বাড়ির কোনো বাবু হ'তাম তা হ'লে স্বহস্তে Taming of the Shrew কর্‌তাম!"

আমি বলিলাম "দাদা, দশমহাবিদ্যার মধ্যে কেউই ত' shrew নয়। সকলেই সুশীল ও নম্রপ্রকৃতি। আমার ছোটশালিটিও আপনার খুব্ বাধ্য। আর রাঙ্গাদিদি ত' Pink of perfection বল্‌লেই হয়। এরা সকলেই রূপে গুণে আলো করা। আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি চমৎকার অমায়িক প্রকৃতির লোক—দেবতা বল্‌লেই হয়। আর আমাদের শালা বাবুরা perfect types of gentlemanliness। সত্য কথা বল্‌তে কি, হরনাথ দাদা, আমাদের পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যে এমন সৎ বংশে বিবাহ হয়েছে।"

হরনাথ দাদা একটু নরম হইয়া বলিলেন "ভায়া মেঘনাদ, শালিশালাজেরা দেখ্‌ছি তোমাকে একেবারে mesmerize করে ফেলেছে। হিন্দু ভুগোলবেত্তারা যে বলেন—কামাখ্যাপ্রদেশটা বঙ্গভূমির উত্তরপূর্ব্বে সে কথাটা ডাহা ভুল—কামাখ্যা-প্রদেশ বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত এই ব—গ্রামে। বলি, ভায়া,—Shelly

ও Byron ও কালিদাস এখনও কি তোমার favourite authors? Keatsএর সেই line গুলি কি হে?

"A thing of beauty is a joy for ever.
"Whence that completed form of all completeness?
Whence come that high perfection of all sweetness?"

আর Byronএর সেই অদ্ভুত কবিতা—

"The smile which answers to mine
I do not believe it beguiling"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি সহাস্যে বলিলাম "দাদা আজকাল আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, ভগবদ্গীতা, Denssen ও Schopenhaur পাঠ করি। বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, এ সংসারে সকলি ভোজবাজি ও মায়ার খেলা। ক্রমাগত philosophy পড়ে পড়ে মাথাটা গরম হয়ে উঠল; মনে করলাম একবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শরীর ও মনটা তাজা ক'রে আসি। অনেক দিনের পরে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, বিশ্রামটাও হবে। ফিকিরটা কি মন্দ হয়েছে?"

হরনাথ বাবু বলিলেন "See-saw! see-saw! The world moves in a cycle! তুমি পাঠ ত্যাগ করবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে এসেছ আর আমি পাঠ করবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। মনে করলাম B. L. পরীক্ষার আর বেশি বিলম্ব নেই—দুই মাস মাত্র বাকি আছে। চুঁচ্‌ড়োর বাড়িতে সেই হট্টগোলের মধ্যিখানে তো পাঠ করবার জো নেই। বিবেচনা করলাম শ্বশুরালয়ে গিয়ে একান্তে নিরিবিলিতে study করব। ও মা! এখানে এসে একি! From the frying pan into the fire, এ যে regular confusion of Babel"

হরনাথ দাদার কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভারি amused হইলাম। আমি মনে করিলাম "শ্বশুরবাড়িতে অধ্যয়নের জন্য আসা ideaটা নূতন ও মৌলিক বটে।" কিন্তু আমি জানিতাম হরনাথ দাদা কিছু eccentric প্রকৃতির লোক; এই জন্য আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। প্রকাশ্যে বলিলাম "দাদা, এরা দেখ্‌চি আপনাকে যার পর নাই জ্বালাতন করেছে। কি হয়েছে দাদা, সব কথা খুলে বলুন্। দুই জনে মিলে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে।"

হরনাথ দাদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "জ্বালাতন? শুধু জ্বালাতন? উস্তোম্ ফুস্তোম; ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত! এমনও গোলযোগে মানুষে পড়ে হে? দুই দিন

না যেতে যেতে রাঙ্গাদিদি ও তাঁর দশ শিষ্যেরা আমাকে "গান গাও—গল্প কর" বলে গ্রেফ্‌তার করলে। আমি তাঁদের খাতিরে একদিন অনেকগুলি বাঙ্গলা গান গাইলাম। তার পর দিন আবার পাক্‌ড়াও! আমি সাফ্ জবাব দিলাম "দুই মাস পরে আবার গাইব।" রাঙ্গাদিদি সানুনয়ে বল্‌লেন "লক্ষ্মী নাতজামাইটি। কথায় বলে অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে; আমরা এত সাধ্যসাধনা করচি—রোজ এক আধটা গান গাইলে আর ভারত অশুদ্ধ হবে না। আর শ্বশুরবাড়িতে এসে রোজ এক আধ্‌টা গান না গাইলে লোকেই বা কি বল্‌বে?"

আমি বল্‌লাম "আমি শ্বশুরবাড়িতে গান গাইতে আসিনি; বই পড়্‌তে এসেছি" বড় শালিটি বল্‌লেন "কথা শোন! শ্বশুরবাড়িতে বই পড়্‌তে কে কবে গিয়ে থাকে গা! অনেক দিন বাদে এসেছ; দুটো রসের কথা কও; দুটো আমোদের কথা পাড়; না কেবল চক্ষে ঠুলি দিয়ে আইন্ আর কানুন্, কানুন্ আর আইন্। শ্বশুরবাড়িতে এসে এমন বেয়াইনি কাণ্ড কে কবে করে থাকে গা?"

বড় শালাজ বড় বড় চক্ষু ঘুরিয়ে বল্‌লেন "তা ভাই, পড়্‌তে এসেছ বেশ্ করেচ। শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় পোড়ো—প্রভা ঠাকুরঝি গুরুমশায়গিরি ভাল করে করবে। সে কাণ্ মল্‌তে বেশ্ শিখেচে।"

দ্বিতীয় শালিটি বল্‌লেন "রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! এতক্ষণ ধ'রে আমাদ্দের সঙ্গে ঝুটোপুটি কোঁদল করচো, তাতে সময় নষ্ট হ'ল না, তাতে পড়ার ক্ষতি হ'ল না—আর একটা গান গাইলেই যত পড়ার ক্ষতি! এত ন্যাকামিও জান গা!"

দ্বিতীয় শালাজ্‌টি (যাকে তুমি "পণ্ডিত মশায়" ব'লে ডাক—In order of meritএ এঁর উল্লেখ প্রথম হওয়া উচিত ছিল—কেমন মেঘনাদ বাবু ঠিক্ নয়?) বল্‌লেন "ঠাকুর জামাই—তুমি অসঙ্কোচে পাঠ হ'তে বিরত হ'তে পারো—পরীক্ষার দিন, পরীক্ষার স্থলে, প্রভা ঠাকুরঝি তোমার প্রতিভূ হয়ে যাবে।"

আমি কৃত্রিম মূর্খতা প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম "সে আবার কি!—হা হতোঽস্মি!" পণ্ডিত মহাশয় রেগে বল্‌লেন "ঠাট্টা না কি!—প্রতিভূ—প্রতিভূ শব্দ বুঝি বাঙ্গলা ভাষায় নেই—অনঙ্গ, অনঙ্গ—কর্ত্তার মহল থেকে শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় তো"—

তখন অনঙ্গ ছুঁড়িটে (I beg your pardon, Meghnad Babu) যথা নির্দ্দিষ্ট, ছুটে শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করলে। পণ্ডিত মহাশয় ক্ষিপ্রহস্তে "প"য়ের কোটায় হাত দিয়ে প্রতিভূ শব্দ বার করলেন ও বিজয়-প্রদীপ্ত-নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—

"ঠাকুরজামাই, আমার সঙ্গে ঠাট্টা—এই দেখ "প্রতিভূ"!—প্রতিভূ অর্থে "লগ্নক, জামিন্‌দার, ঋণশোধে স্বীকারক।" চাণক্যশ্লোকের সেই শ্লোকটা (মাগি কি pedant!) ঠাকুরজামাই, সেই শ্লোকটা মনে আছে তো? "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে!"

আমি হেসে বল্লাম "বউঠাকরুণ, বেয়াদবি মাফ করতে আজ্ঞা হোক—ব্যাকরণ অশুদ্ধ হোলো—বিদুষী সর্ব্বত্র পূজ্যাতে হওয়া উচিত ছিল।"

আমাদের কবিতাপ্রিয় তৃতীয় শালিটি অর্দ্ধ ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠল—

"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া—
মূর্খে কি বুঝিবে—থাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় সুপ্রসন্ন হয়ে বল্লেন "মন্দ বলনি ঠাকুরজামাই—এবারে চাণক্য শ্লোকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এ ভ্রম সংশোধন করে দিও।"

আমি বল্লাম "যে আজ্ঞা—তাই হবে এখন আমি বাইরে চল্লাম—আপনি আমার প্রতিভূ হয়ে এই সভামণ্ডপের সমক্ষে দুই একটি গান গাইবেন।" এই বলেই আমি উত্তরের প্রতীক্ষা না করে তাড়াতাড়ি জুতা পায়ে দিয়ে সে স্থান হতে প্রস্থান কর্‌লাম। কেমন মেঘনাদ বাবু, ভাল করিনি? সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌চি এমন সময়ে রাঙ্গাদিদি উপর হতে খানিকটে Lavender water আমার মাথায় ঢেলে দিলেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার নাকালের ইতিহাসটা শুনিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম "দাদা, এতেই এত রাগ? আপনার কাজটা ভারি ungallantlike হয়েচে দেখ্‌চি। Xantippeর প্রতি Socrates এর সম্বোধনের মত আপনারও বলা উচিত ছিল—After such thunders, there must needs be a shower of rain"

হরনাথ দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন (শরৎ কালের মেঘ ও রৌদ্রের মত হরনাথ দাদার বিরক্তি ও সন্তোষ আমাদের কাছে এক প্রকার প্রহেলিকা ছিল) "ওহে মেঘনাদ—আমি এত thinskinned নই যে এই গোলাপি সম্ভাষণে এত চটে যাই। এটাতো কেবল কথা কাটাকাটি, theoretical অংশ গেল—এখনও হাতাহাতি, practical অংশটা বাকি আছে। শুন্‌লে তোমারও ক্রোধ হবে। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে যাচ্চে। সাধুচরণ—সাধুচরণ—তামাক দিয়ে যাওতো—হা দেখ, এদ্দের আক্কেলটা! শালা বাবুরা এখনো ফির্‌লেন না—By the way; মেঘনাদ তামাক ধর। Try this cigar. Eh? No? This is prudery indeed! I am afraid মেঘনাদ, তুমি এই নির্দ্দোষ ব্যোমযান, বেলুন যন্ত্রকে অবহেলা ক'রে, কোন্‌দিন জলপথে ষ্টীমারে আরোহণ না কর। আমাদের ব্লু ষ্টকিংস্ শালাজটিকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি বল্‌বেন "সে যাত্রা অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। সে প্রদেশে ভীম নক্র বাস করে।"

ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিল। হরনাথ দাদা তামাক টানিতে টানিতে বলিতে

লাগিলেন "আমার নাকালের practical অংশটা বল্‌চি শোন। শ্রোতার পক্ষে edifying, বক্তার পক্ষে mortifying,

সেই দিন রাত্রিকালে আহারান্তে শয়ন-কক্ষে দিব্য আরামে পালঙ্কে শুয়ে Penal Code এর definition গুলি revise করচি—পালঙ্কের এক পার্শ্বে শশীকলার মত প্রভা সুন্দরী শোভা পাচ্চেন, এমন সময়ে Brigadier-General রাঙ্গাদিদি সদলবলে আমার সমীপে হাজির"—

আমার ত' দেখেই চক্ষুস্থির! জান ত' মেঘনাদ, ছেলে বেলা হ'তে কশরৎ ও জিম্‌ন্যাস্‌টিক্ ক'রে আমার দেহে অসাধারণ শক্তি হয়েচে—মাংসপেশী গুলি দেখেচো!—কেমন developed! Worthy of a gladiator! সুরেন্ বাঁড়ুয্যের ভাই জিতেন বাঁড়ুয্যের অপেক্ষা বাহুবলে আমি কোন মতেই হীন নহি। আর আমার height জান। 6 feet 6 inches। সে দিন সেই গোঁয়ার গোরাটাকে ঠেঙ্গিয়ে চুঁচুড়ায় আমার নাম জাহির হয়ে গিয়েচে। কিন্তু এ হেন বঙ্গবীর আমি শ্রীমান হরনাথ বসু, সেই মধ্যাহ্ন রজনীতে শ্রীমতী রাঙ্গাদিদির রণচণ্ডী-মূর্ত্তি দেখে ঈষৎ কম্পান্বিত-কলেবর হলাম! আমি মানস চক্ষে মাইকেল মধুসূদন-বর্ণিত প্রমীলার লঙ্কাপুরী-প্রবেশ দেখতে লাগলাম।

অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণপ্রভা সম বিভা খেলিছে কিরীটে;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, গৌর-অংশরাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি!

* * *

যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে
অগ্নিময় দশদিশ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভারাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়দড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী!
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত আভা;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন "আমি সহাস্যে বল্‌লাম—এত রাত্রে, এ আবার কি রঙ্গ, রাঙ্গাদিদি ?"

রাঙ্গাদিদি ও তাঁর সহচরীরা বিনা বাক্যব্যয়ে dumb pantomime show এর মত আমার সুপ্রশস্ত double পালঙ্কের চারি পার্শ্বে—যে, যে স্থানে ইচ্ছা করলে—বসে পড়ল। বেগতিক দেখে আমার আকুল অর্দ্ধাঙ্গীটি কক্ষ হতে শশব্যস্তে নিষ্ক্রান্ত হল। আমি সসম্ভ্রমে Penal Code খানি বন্ধ করে উঠে বস্‌লাম। তখন রাঙ্গাদিদি ও তাঁর ministerial officersরা ঐকতানিক স্বরে বলে উঠল "গান গাও, গান গাও, গান গাও—গান না গাইলে নিস্তার নেই—গান না গাইলে তোমাকে ঘুমোতে দেব না। আর তোমার আইনের বই দাও"—এই বলে একটি সুন্দরী harpy (অনঙ্গ ছুঁড়িটা কি কম দুষ্ট!—I again beg your pardon, Brother Meghnad) আমার হতভাগ্য Penal Code খানিকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে।

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিবেচনা করলাম "এখন্ সন্ধিস্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ।" প্রকাশ্যে বল্‌লাম "Treaty of Utrecht এর মশওদা প্রস্তুত হয়েচে কি ?"

আমার চতুর্থী শালিটি বল্‌লে "ও সব আইন্ কানুন্ রেখে দাও। এখন্ একটা ভাল দেখে গান গাও। গাও

"যুবক যুবতী জাগ যামিনী যে যায় রে
মদন শাসনে কেবা নিশীথে ঘুমায় রে
আজি যে প্রভাত-ফুল"—

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম "আপনারা'ত আমার বাঙ্গলা গান অনেক শুনেচেন ; যদি অনুমতি করেন তা হ'লে আজ গোটা কতক ইংরিজি গান গাই।"

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন "না, না,—তা হবে না—সংস্কৃত গান হোক্ ; গাও

যাহি মাধব, যাহি কেশব, মা বদ কৈতববাদম্
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্।

গাও

স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লব মুদারম্"—

আমার বড় শালি বল্‌লেন "না বউ—ও বড় কটমটে—আজ ইংরিজি গানই হোক্—সংস্কৃত গান আর এক দিন হবে"

পণ্ডিত মহাশয় ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বল্‌লেন "বল কি ঠাকুর ঝি? ও বুঝি তোমার কটমটে গান হোলো? জয়দেব গোস্বামীর সুললিত পদ ভুবনে বিখ্যাত। কথায় বলে—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্"—

তখন সকলের vote নেওয়া হল। পণ্ডিত মহাশয় outvoted হয়ে গেলেন। সকলেরি মত হল "আজ ইংরাজি গানই হউক্।" আমি সেই নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ তাল মান লয়ে গাইতে লাগলাম। আমিও কতকটা আমোদ অনুভব করতে লাগলাম। আমি গাইলাম—

I.

Love not, love not, ye hapless sons of clay,
Hope's gayest reeds are made of earthly flowers,
Things that are made to fade and fall away,
Ere they have blosommed for a few short hours!
　　　　Love not, love not

II.

Love not, love not, the thing you love may die,
May perish from the gay or gladsome earth,
The silent stars, the blue and smiling sky,
Beam on its grave as once upon its birth!
　　　　Love not, love not.

III.

Love not, love not, the thing you love may change,
The rosy lips may cease to smile on you,
The kindly beaming eye grow cold and strange,
The heart still warmly beat, yet not be true.
　　　　Love not, love not.

IV.

Love not, love not, O warning vainly said!
In present hours as in years gone by,

Love flings a halo round the dear one's head,
Faultless, immortal, till they change or die!
Love not, love not.

মেঘনাদ ভায়া, আমার অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে যে আমার গলাটা নেহাৎ মন্দ নয়। আমি নিজের গানে নিজেই মোহিত হলাম।

রাঙ্গাদিদি বল্‌লেন "বলিহারি তোমার গলা, নাৎজামাই। বিধাতা তোমাকে নারী না করো পুরুষ করলেন কেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বল্‌লেন "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"

আমার প্রথম শালি বল্‌লেন "লভ্ নট্—লভ্ নট্, এর অর্থ কি হরনাথ বাবু?"

আমার প্রথম শালাজ সহাস্যে বল্‌লেন "তা বুঝি জানিস্ নে ঠাকুরঝি। লভ্ মানে ভালবাসার সামিগ্রি। আমার ইনি আমাকে যখন তখন আদর করো বলেন—মাই ডিয়ার লভ্।"

রাঙ্গাদিদি প্রাগুক্ত সুন্দরীর পৃষ্ঠে সস্নেহে মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে বল্‌লেন—"মাই ডিয়ার তোমার মাথা মুণ্ডু। একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েচিস্। নাৎজামাই, নাৎজামাই, তুমি কিছু মনে কোরো না—এরা নেহাৎ বিলিতি গোরা।" আমি সবিনয়ে বল্‌লাম "না ঠান্‌দিদি, মনে আবার কোরবো কি? তোমাদের সাত খুন্ মাফ্—তোমরা যে Non regulation Provinces-এর অধিবাসী!"

দশম পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয় বল্‌লেন "ঠাকুরজামাই। এই ম্লেচ্ছ শ্লোকগুলিকে আর্য্যভাষায় অনুবাদ করো আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর।"

আমাদের কবিতাপ্রিয় তৃতীয় শালিটি বল্‌লেন "গদ্যে বল্‌লে হবে না, পদ্যে বল।"

আমি সহাস্যে বল্‌লাম "সে কি বল বোন্? আমি কি কল্পতরু?"

রাঙ্গাদিদি হেসে বল্‌লেন "না নাৎজামাই—তুমি কামধেনু!"

যা হোক, মনে কিছুক্ষণ ভেবে একটা চলন-সই বাঙ্গলা কবিতা তৈয়ার করে বল্‌লাম "ইংরাজি গানটার ভাবার্থ এই—

১

বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্বুদ-প্রায়
চকিতে মিলায়ে যায়; ভুল না রে ভুল না!
কারে ভাল বেস না রে বেস না!

২

জতুর কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে
দপ্ করি জ্বলি উঠে অনলের শিখা রে
মালা সহ শরীরেতে নর-বক্ষ-উপরেতে
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায় ; ভুল না রে ভুল না !
　　কারে ভাল বেস না রে বেস না !

৩

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় রে
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে
ওই পুনঃ আঁখি ঠেরে নিরখিয়ে বিজয়েরে
প্রণয় বিষম খেলা ; ভুল না রে ভুল না !
　　কারে ভাল বেস না রে বেস না !

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে ;
কাচ হেরি হীরা ভ্রমে ভুল না রে ভুল না !
　　কারে ভাল বেস না রে বেস না।

৫

না ছুঁইতে ঝরে যায় প্রজাপতি-পাখা রে
আগমনী না ফুরাতে বিজয়ার দেখা রে
অভিনয় না ফুরাতে রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে
সূর্য্যরশ্মি দেখা যায় ; ভুল না রে ভুল না—
　　কারে ভাল বেস না রে বেস না !

আমার কবিতাটি সমাপ্ত হলে আমার প্রথম শালাজ বল্লেন "ঠাকুর জামাই, এ কোন্ বদ রসিকের গান ? এ গান আমাদের নামঞ্জুর। যদি জগতে ভালই না বাস্‌লাম তা হ'লে আমাদের বেঁচে সুখ কি ?"

আমাদের কবিতাপ্রিয় শালিটি বল্লেন—

যে যাহারে ভাল বাসে
সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে ?"

প্রথম শালি বল্লেন "হরনাথ বাবু, একটা ভাল রং তামাসার গান গাও—আমরা প্রাণ ভোরে বুকপুরে হেসে নি।"

৬

আমি বল্‌লাম "দিদি, আমার বড় ঘুম পাচ্চে। রং তামাসার মধ্যে চক্ষে কেবল চিড়িতন্ ইস্কাপন্ দেখ্‌চি—হরথন রুইথন আদপে দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

রাঙাদিদি বল্‌লেন "ছি, নাত্‌জামাই,—আমরা বুঝি চিড়িতন্ ইস্কাপন্?—প্রভাকে ডাক্‌ব?"

চতুর্থী শালি বল্‌লেন "মরে যাই আর কি! কি রং তা জানেন না!—আমরা উঠে যাই আর উনি প্রভাকে নিয়ে বিন্‌তি খেল্‌তে বসুন। সিটি হচ্চে না—একটা ভাল দেখে মজার গান গাও—আমরা হাস্‌তে চাই।"

আমি দেখ্‌লাম "বড়ই বেগতিক। এই সিংহবাহিনীদের পাল্লায় পড়ে আঁমার রাত্রিটাই মাটি।" আমি কাজেই শঠে শাঠ্যম্ আরম্ভ করা শ্রেয়ঃ মনে কর্‌লাম। মনে কর্‌লাম Law books এর definition গুলি যেগুলি এত করে কণ্ঠস্থ করেছি—সুর করে আওড়ে যাই, তবু অনেকটা revision এর কাজ হবে। এই মনে করে বললাম "তবে একটা ইংরিজিতে মজার গান গাই শোন।" তার পর, রাগরাগিণীর স্বরে Evidence Act খানা যা আগাগোড়া মুখস্থ করেছিলাম—বিকট মুখভঙ্গিতে আওড়াতে লাগলাম। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি "কেমন? কেমন লাগচে?" কোন সুন্দরী হাস্‌তে হাসতে বল্‌লেন, "বেশ, খাসা" কোন সুন্দরী সহাস্যে বল্‌লেন "কি মধুর! কি মজা।" পণ্ডিত মহাশয় অনুনাসিক ঠা[illegible] বল্‌লেন "রাঁগ কোরো না ঠাঁকুরজামাই—গানটা বড়ই দীর্ঘ ও কিছু শ্রুঁতিকঠোর।" রাঙ্গাদিদি রাগ করে বল্‌লেন "কঠোর! যা ছুঁড়ি যা—তোর ভাল না লাগে তুই উঠে যা। এমন মিষ্টি গান—ওঁর লাগে কি না কঠোর—নাত্‌জামাই, তুমি কিছু মনে কোরো না—খাসা।"

এইরূপে নানা সুরে Preamble হতে শেষ পর্য্যন্ত সুকবি Stphen গ্রথিত Evidence Act নামক গীতি কাব্যখানি আবৃত্তি কর্‌লাম।

যখন আবৃত্তি শেষ হল, তখন সুন্দরীরা বল্‌লেন "অতি সংক্ষেপে এর অর্থ বল।"

আমি বল্‌লাম "অবশ্য অবশ্য—অতি সংক্ষেপেই বল্‌ব—ওই শোন, ঘড়িতে টং টং টং করে তিনটে বাজলো। রাত্রিও সংক্ষেপ হয়ে পোড়্‌ল।" এই গানটি অতি মজার, অতি কৌতুকের—এর নাম "আইবুড়ার খেদ।" আপনারা মন দিয়ে শুনুন; এর ভাবার্থ এইরূপ—

আইবুড়ার খেদ।

(১)

একটি নক্ষত্র আঁধার আকাশে,
একটি পাদপ বিস্তৃত প্রান্তরে,
একমাত্র পোত সাগর উরসে,
আমি আইবুড়া জগত ভিতরে!

কত শঙ্খচিলে করিনু প্রণাম,
ঘুচিল না তবু আইবুড়া নাম।

(২)

সে দিনের কথা—হরি খুড়া মোর
রাঢ় দেশে এক জুটালে সম্বন্ধ—
কি করিবে ওঝা? কি করিবে রোজা?
দেবের গঠিত ভাগ্য যার মন্দ।
রূপে গুণে ধন্যা ছিল সে কদম,
নাকে কথা কয় এই সে বিষম!

(৩)

ছিল নৃত্যকালি, মিষ্ট যেন নিচু!
দুই বর্ষ নাহি যাইতে যাইতে
হোলো তাল গাছ, দাঁত হোলো উঁচু,
হোলো কদাকার আমার ভাগ্যেতে।
কাজেই ভাঙ্গিয়া গেল সে সম্বন্ধ;—
অদৃষ্টের ফের হইল না বন্ধ।

(৪)

ময়রাণী দিদি মোর হিতৈষিণী
জুটালে সম্বন্ধ বড়্শে বেয়ালায়,
ঠান্ দিদি কিন্তু হইয়ে বাঘিনী,
দেখালে ধবল কন্যার মাথায়
বিদ্যুৎ বরণী চারু সরোজিনী
অভাগা অদৃষ্টে ধবল-রূপিণী!

(৫)

এইবার বুঝি বিধাতা সদয়,
পাতা চাপা বুঝি আমারো কপাল—
বিধুর বাটীতে নিত্য তত্ত্ব যায়,
শুনি নিতি নিতি, শ্রবণ-রসাল,
"জামাই বাবু গো, চাঁপার সন্তাষ!
"কি ঝি, বলি আমি, মুখে মৃদুহাস!

(৬)

সেই কথা গিয়া পশিল কি হায়
উদ্বাহের দেব পদ্মযোনি কাণে ?
একটি সপ্তাহ যায় কি না যায়,
বিধুর শরীর শীতলার বাণে
হৈল ক্ষত ক্ষত ! চারিদিকে দাগ !
ঘুচিল আমার উদ্বাহের রাগ !

(৭)

জোড় ভাঙ্গা এক বিনামার মত,
বোস্‌জার হারা পাদুকার প্রায়,
সতত চঞ্চল সংসারের স্রোত
ইতস্ততঃ মোরে লইয়া বেড়ায় !
কত প্রজাপতি বধেছি শৈশবে,
সেই পাপে মোর এই দশা এবে !

(৮)

ভয়ে ভয়ে থাকি, নিরাশে, বিষাদে,
গণি কড়িকাট, গণিয়া নক্ষত্র,
সকালে বিকালে উঠি না'ক ছাদে,
প্রমাদ ঘটায় পাছে মোর নেত্র !
তবু আইবুড়া গুণের দাপটে
অভাগার নামে কত কথা রটে !

(৯)

এক হাত ভাঙ্গা চেয়ারের মত,
দুই পদ-হারা খট্টাঙ্গের প্রায়,
আমি আইবুড়া, ঘুরি ইতস্ততঃ,
মাথা নাই, মরি মাথার ব্যথায় !
কত শঙ্খচীলে করিনু প্রণাম,
ঘুচিবে না বুঝি আইবুড়া নাম !

আমার মুখভঙ্গি ও কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া সুন্দরীরা খুব উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে লাগ্‌ল। আমিও খুব হাস্‌লাম। Well, Mr. Meghnad don't you think I deserve three cheers for that night's performance ?

(ক্রমশঃ)

সিরাজদ্দৌলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ফরাসির সর্ব্বনাশ!

ফরাসিদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইল! তাঁহারা ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পথের ফকিরের মত নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিলেন না! ইংরাজেরা দুর্গাধিকার করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন না;—ফরাসিদিগকে ধনেবংশে বিনাশ করিবার জন্য পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তীরবেগে ইংরাজতরণী ছুটিয়া চলিল; ফরাসিরা অনন্যোপায় হইয়া, বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া, প্রাণ লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন! ইংরাজেরা শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জের শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিতে করিতে, গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে করিতে, হুগলী বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার বিস্তীর্ণ জনপদ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন!

মুর্শিদাবাদের লোকে ফরাসিদিগের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিল না! সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা; সুতরাং ফরাসিরা তাঁহারই শরণাগত হইল। তিনি ফরাসিদিগের কাতর-ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করিতে বাধ্য হইলেন!

বৃটিশবণিক বিজয়োন্মত্ত হৃদয়ে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। 'এত স্পর্দ্ধা! এত সাহস! তাঁহারা যাহাদিগকে ধনেবংশে বিনাশ করিবার জন্যই চন্দননগর কাড়িয়া লইলেন, সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকেই স্নেহক্রোড়ে আশ্রয়দান করিলেন? সিরাজদ্দৌলা এ দেশের রাজা, আর্ত্তত্রাণ তাঁহার পরম পবিত্র রাজধর্ম্ম,—সে কথা কেহ বিচার করিয়া দেখিলেন না। ইংরাজ মাত্রেই সিরাজদ্দৌলার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা জানিতেন যে, চন্দননগরের অল্পসংখ্যক ফরাসি-সেনা সমূলে বিনষ্ট করা খুব সহজ কথা; কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ফরাসিজাতি যখন প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইবে, তাহার গতিরোধ করা সেরূপ সহজ হইবে না! ইংরাজেরা সেই জন্যই সিরাজদ্দৌলার সহায়তায় ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যদি সিরাজদ্দৌলা সহায়তা করেন, তবে ইংরাজ বাঙ্গালীর সমবেত শক্তির নিকট ফরাসিকে অবশ্যই নতশির হইতে হইবে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ফরাসিদিগকে আশ্রয়দান করায় ইংরাজের সে আশা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা নানা উপায়ে সিরাজদ্দৌলার মতিপরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ এবং ফরাসি উভয়েই উভয়ের চিরশত্রু। তাঁহারা দুই জনেই ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য লালায়িত। সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে ফরাসিদিগকে নির্ম্মূল করিবার অবসর দান করা আর ইংরাজের নিকট আত্ম-বিক্রয় করা এক কথা। তিনি সেই জন্যই ফরাসিদিগকে রক্ষা করিতে সমুৎসুক। ইংরাজেরাও ইহা জানিতেন ;—সুতরাং তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সিরাজদ্দৌলাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য চন্দননগর ধ্বংস করিবামাত্র সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যেঃ—

"আমি যে গুরুতর কার্য্যের জন্য এখানে (চন্দননগরে) আসিয়াছি, তাহাতেই ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়াও যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই ;—তজ্জন্য ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আমাদের সৌভাগ্যবলে, আপনার সৌহার্দ্দ্য-সহায়তায় এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায়, দুইঘণ্টামাত্র যুদ্ধ করিয়াই ২৩শে মার্চ্চ তারিখে চন্দননগর অধিকার করিয়া লইয়াছি। ফরাসিরা অনেকেই বন্দী হইয়াছে, যে কয়েকজন পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবার জন্য অস্ত্রধারী নিযুক্ত করিয়াছি ;—তাহারা আর কাহারও উপর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না, সুতরাং আপনি তজ্জন্য অসন্তুষ্ট হইবেন না! আমরা যে সন্ধিপালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না, সে কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছি। আপনার শত্রু যখন আমাদিগেরও শত্রু, তখন আমাদিগের শত্রুও অবশ্যই আপনার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং ফরাসিরা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনি অবশ্যই তাহাদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আপনি লিখিয়াছেন যে ড্রেক সাহেব মহারাজ মাণিকচাঁদকে অসম্মানসূচক কথা বলিয়াছিলেন ; আমি সে কথা শুনিবামাত্র ড্রেক সাহেবকে যথোচিত লিখিয়াছি, এবং তিনিও মাণিকচাঁদের নিকট যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ভরসা করি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা কি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিতে পারি? আমাদের নিকট সেরূপ ব্যবহার পাইবেন না! *

ওয়াটসন্ যে উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না ;—সিরাজদ্দৌলা শরণাগত ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইতে সম্মত হইলেন না! ওয়াটসন্ নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া ভয় প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইবার জন্য পুনরায় পত্র লিখিলেনঃ—

"আমরা যে চন্দননগর অধিকার করিয়া অধিকাংশ ফরাসিদিগকে বন্দী করিয়াছি এবং পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছি, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি ; আবার যে সে বিষয়ে লিখিতে হইতেছে ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা! পরমেশ্বর এবং মহম্মদের পবিত্র নামে আপনি যে ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করিতেছেন না বলিয়াই আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইতেছে! কোম্পানীর যে সকল কামান আপনার অধিকারে রহিয়াছে, তাহা ওয়াটস্ সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিবেন, বন্ধুভাবে থাকিবার জন্যই যে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছেন সে কথা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না, এবং পলায়িত ফরাসিদিগকে অবিলম্বে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীতাচরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন যে সে কদাচ আপনার বন্ধু নহে। সে উপদেশে দেশের মধ্যে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিবে ;—কিন্তু আপনি সত্যভঙ্গ না করিলে আমরা কিছুতেই যুদ্ধঘোষণা করিবনা! এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে ফরাসিরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট উপনীত হইয়াছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন

* Ive's Journal.

করিয়াছে। আপনি তাহাতে সম্মত হইলে আমাদের সঙ্গে আর বন্ধুভাব থাকিবে না। আপনি সে দিনও আমাদের নিকট সেনা-সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহার পরেই লিখিয়াছেন যে আর চাহেন না; ইহাতেই বুঝিতেছি যে ফরাসির সঙ্গে মিত্রতা সংস্থাপন করাই বোধ হয় আপনার অভিমত!" *

আলিনগরের সন্ধির পরিণাম যে এরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সিরাজদ্দৌলা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। ক্রমে ইংরাজের গূঢ়নীতির মর্ম্মালোচনা করিয়া সিরাজদ্দৌলা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি আর ওয়াটসনের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল নীরবে সতর্ক দৃষ্টিতে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মহানগরীর রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময়ে সুচতুর দস্যুতস্কর হাতের উপর হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিলে পথিক যেমন চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তস্করও তদ্রূপ চোর চোর করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। সেই জন্য কে সাধু কে চোর তাহার মীমাংসা করা সহজ হয় না। সিরাজদ্দৌলার অবস্থাও সেইরূপ হইল;—আলিনগরের সন্ধিভঙ্গ হইল, কিন্তু কাহার দোষে সন্ধিভঙ্গ হইল, সে কথার মীমাংসা হইতে পারিল না!

এদিকে ইংরাজদরবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল! ওয়াটসন্ সাদর-সম্ভাষণে পত্র লিখিলেন, তাহার উত্তর আসিল না; সুর চড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর আসিল না! তখন ইংরাজেরা বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসিদিগকে আশ্রয়দান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠিলেন; ওয়াটসন্ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসিদিগকে গৃহতাড়িত না করিলে ইংরাজের কল্যাণ হইবে না। তখন নানা উপায়ে নবাব এবং ফরাসিদিগের অভিনব সৌহার্দ্দ্য ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ওয়াটসন্ স্তুতি মিনতি করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"চন্দননগরের নিকটে আমাদের কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বাঁধা রহিয়াছে, এবং হুগলীর নিকটে কয়েক পল্টন গোরা ছাউনী ফেলিয়াছে, এই জন্য আপনি নাকি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সুযোগে আমাদের শত্রুদল নাকি আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে আমরা সসৈন্যে মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবার জন্যই এই সকল আয়োজন করিতেছি! কেহ যে এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতে সাহস পাইয়াছে, ইহাই সমধিক বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনি যে এমন অলীক সংবাদও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনিও ত একজন বীরপুরুষ;—আপনি কি বুঝেন না যে আপনার রাজ্য মধ্যে একজন শত্রুসেনা লুকাইয়া থাকা পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন না করা আমার পক্ষে কতদূর মতিভ্রমের কথা? সে যাহা হউক, আপনি যদি ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দেন তাহা হইলেই ত সকল বিতর্কের অবসান হইতে পারে, এবং আমরাও সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে পারি। যতক্ষণ ইহা না করিতেছেন ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব যে আপনি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন?"†

ওয়াট্‌সন্ যে কেবল রণপণ্ডিত তাহাই নহে,—সেকালের ইংরাজদিগের মধ্যে তাঁহার মত সুচতুর রাজনীতিবিশারদ সুলেখকও অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! তিনি যখন অবলীলাক্রমে সিরাজদ্দৌলাকে লিখিতেছিলেন যে মুরশিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তাব সর্ব্বৈব মিথ্যা,

* Ive's Journal.
† Ive's Journal.